আঁধারে চেনা
আলোতে অচেনা

প্রবীররঞ্জন বসু

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪৯ সাল

প্রচ্ছদপট
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

স্নেহের টুটু, কিনু ও মিনাকে

॥ এক ॥

একটা আলোর বৃত্ত দক্ষিণ দিক থেকে যেন ভাসতে ভাসতে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারের জমাট আস্তরণ বিদীর্ণ করে আলোর বৃত্তটা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বড়ও হোচ্ছে। আলোর বৃত্তটার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। বোঝা গেল বজবজ লোকাল আসছে। বালিগঞ্জ লেকের কাছে ট্রেনটা আসতে আর বড়জোর দু'তিন মিনিট সময় নেবে। মহাবীর এতক্ষণ দক্ষিণ দিকে চোখ রেখে বসেছিল। শুধু মহাবীরের কথাই বা বলা কেন, অনেকেই বসেছিল ট্রেন লাইনের উপর এবং তাদের চোখও ছিল বজবজ লোকালের উপর। ট্রেনটা আরো কতটা নিকটবর্তী হোলে তাদের উঠে পড়া উচিত সেটা নিয়ে যে সকলে ভাবছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রীষ্মের সময় বস্তির মানুষজন এই ট্রেনলাইনের উপর দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে বসে গল্প-গুজব করে। ছোট ছোট খুপরি ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম, এই গরমে শরীর ভাজা-ভাজা হয় সমস্ত দিন। রোদ পড়ে যাওয়ার পর সস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে বস্তির বাসিন্দারা। বিকেলের জন্য অপেক্ষা করে থাকে ওরা। সূর্যাস্তের পর খুপরি ঘরগুলো থেকে ধোঁয়ার মতো গলগল করে মানুষজন বেরিয়ে ট্রেনলাইনে আশ্রয় নেয় কিছু সংখ্যক আর বাদ-বাকিদের একাংশ লেকে চলে আসে। অন্যান্যরা অর্থ উপার্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়ে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে। যারা ট্রেনলাইনে এসে বোসে, সমস্ত দিনের ভাজাভাজা শরীরটায় বাতাসের ঢেউ গায়ে লাগায় তারা কখনই নীরবতার প্রাচীর তৈরি হোতে দেয় না। বাতাসের ঢেউয়ের সঙ্গে তাদের কথার ঢেউও ভেসে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। যতক্ষণ না ট্রেনের যান্ত্রিক শব্দ তাদের কানে পেঁছিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অসংখ্য কথা বিনিময় হোতে থাকে নিজেদের মধ্যে। ঘর-সংসারের কথায়, অভাব-অনটনের কথায় এবং পরনিন্দা-পরচর্চায় ডুবে থাকার মধ্যে ওরা খুঁজে পায় সুখ। এ ব্যতীত সুখ তাদের জীবনে কোথায়! মেয়েদের ত' বছর বছর গর্ভধারণ করার যন্ত্রণা আছেই, তার উপর নুন আনতে পান্তা ফুরোয় —দুর্দশার অন্ত নেই। সন্তানদের জঠরের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য মেয়েদের কত কী-ই যে করতে হয় তা বলে শেষ করা যাবে না। সকালে অনেকে ট্রেনলাইনের হাত কয়েক দূরের একপাশে যে ঘন ছোট ছোট গাছের জঙ্গল হোয়ে আছে তার মধ্য থেকে শাকপাতা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এছাড়া পড়ন্ত বেলায় বাজার বন্ধ হওয়ার সময় বাতিল শাক-সবজি কম মূল্যে কিনে আনে। যা কিছু সংগ্রহ করতে পারে তা কোনো রকমে সেদ্ধ কিম্বা অর্ধেক সেদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দেয়। নিজেদের ভাগ্যে নিয়মিত সে খাদ্যও জোটে না। সবাইকে দে'য়ার পর যদি ভাগ্যে কখনো জুটে যায় তাহোলে সেদিন তাদের মুখে একটু খুশির ছোঁয়া লাগে। এক

এক দিন ভাগ্যদেবী তাদের দিকে একটু তির্যক দৃষ্টি হানেন আর সেদিন তাদের চোখে-মুখে দেখতে পাওয়া যায় খুশির বিস্তার। কখনো-সখনো পাঁচ-সাত টাকা, কোনো না কোনো ভাবে হাতে এসে যায় আর তখনই একটু ডাল-তেল কিনতে পারে। অবশ্য অনেকেরই এখন কিছু বাঁধা অর্থোপার্জন হয় কিন্তু সে আয়ে পরিবারের সকলের একবেলাও পুরো উদর পূর্ণ করার মতন চাল-নুনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে ক'টাকা আর রোজগার হয়! সংসারের কর্তাব্যক্তিরা কিছু না কিছু কোরে আয় অবশ্যই করে কিন্তু সে আয়ের সামান্যতম অংশ সংসারের জন্য ব্যয় হয় কিনা তা বলা দুরূহ। সম্ভবত হয় না। নেশা করতেই চলে যায় সমস্ত অর্থ। এমন কি প্রায়ই স্ত্রীর আয়ের দিকে হাত বাড়াতেও ওরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য হাত বাড়ালেই যে তা হস্তগত করা যায় তা নয়, অনেক সংঘর্ষের পর কখনো মেলে কখনো মেলে না। দশ মাস দশ দিন যারা গর্ভধারণের যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তানের জন্ম দেয়, তারা সন্তানের মুখে অন্ন না জুটিয়ে ঘরের মানুষটার নেশার সামগ্রীর জন্য তাদের আয়ের সামান্যতম অংশ দে'য়ার ব্যাপারেও অকৃপণ হোতে পারে না। আর এই কারণেই বাক্যবাণের পর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ হোতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মারপিট এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার যে তা কারো মস্তিষ্ককে বিন্দুমাত্র পীড়িত করে না। বস্তির মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনের আর্থিক আয় কিছু বেশি। তাদের অর্থোপার্জনের পথটা যে খুব পরিচ্ছন্ন নয় তা সহজেই অনুমেয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় নারীত্বের সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা উদাসীন। কেউ কেউ আবার যৌবনের সম্ভার পুরোপুরি বিলিয়ে ভালই রোজগার করে। শেষোক্ত শ্রেণীভুক্তরা সন্ধ্যে হোলেই সাজসজ্জা সেরে হয় লেকে না হয় অন্যত্র ঘুরে বেড়ায় একমাত্র উদ্দেশ্যে। এরা দেহোপজীবিনী। যারা নারীত্বের সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সচেতন নয় তারা যে সব বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে সেই সব বাড়ির মধ্যে কোনো কোনো বাড়ির কিছু কিছু লম্পটের কিম্বা অন্য কোনো পুরুষের কিছু কিছু ইচ্ছের কাছে নতিস্বীকার করে। কখনো অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এবং কখনো অন্য উদ্দেশ্যে। অন্য উদ্দেশ্যে বলতে শুধুমাত্র শারীরিক প্রয়োজনের দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে একথা ভাবা ঠিক নয়, কারণ তাদের মধ্যে আরো একটা ইচ্ছে থাকে, তারা মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাদের সমাজের প্রতিফলন দেখতে চায়। দেখতে পেলে খুশি হয়। মধ্যবিত্ত সমাজ খুবই স্পর্শকাতর। এই সমাজের নিয়মকানুন সর্বক্ষেত্রেই বেশ কঠোর। ইচ্ছে করলেই সে নিয়মকানুনের বেড়া কেউ ডিঙিয়ে যেতে পারে না। কোনো রেগ-টেগ সোসাইটির মেয়ে নিয়ে সামান্যতম স্ফূর্তি করার চেষ্টা করলে নিস্তার নেই, সমাজচ্যুত হোতে হয়। এটা ওরা ভাল-মতনই জানে। জানে বলেই হয়ত ভেতরে ভেতরে জ্বলে এমন সুশৃঙ্খলিত সমাজ ব্যবস্থা দেখে। তাদের প্রায় কাছাকাছি থেকে এমন সুশৃঙ্খলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যারা বেঁচে থাকতে চায় তাদের উপর ক্ষোভ ওদের চিরকালের। এরই জন্য যখন ওরা কোনো মানুষ খুঁজে পায় যারা মধ্যবিত্ত সমাজের নিয়মকানুনের বেড়া

গোপনে অতিক্রম করে তাদের সঙ্গ-সুখ চায় তখন ওরা খুশি না হোয়ে পারে না। কিছুটা প্রশ্রয় দেয় এবং যখন দেখে সেই সব মানুষরা আরো অধিক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশী, আরো কিছু পাওয়ার জন্য ওদের কাছে টানতে চায় তখন ওরা ভয়ংকর হোয়ে ওঠে। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে মানুষজন জড়ো করে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের নিয়ম-কানুনগুলো নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কোরে কত কী-ই যে বলে তা কোনো-ভাবেই লিপিবদ্ধ করা চলে না। ওরা জানে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের দুর্বলতাগুলো। মান-সম্মানের খোলসের ভেতর তারা কী ভাবে গুটিয়ে থাকতে চায় তা ওদের অজানা নয়। সেই খোলস ওরা ভেঙে ফেলতে চায়, বার বার আঘাত হানে তার উপর। এতো কাছ থেকে এতোটা ব্যবধান ওরা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারে না। সুযোগ পেলেই ভয়ংকর হোয়ে উঠে মধ্যবিত্তদের সমাজের বেড়াগুলো ভেঙে ফেলার প্রয়াস চালায়। নিয়মকানুন যাই থাক মধ্যবিত্তদের মধ্যে তা যে সব সময় অটুট থাকে বা থাকবে সে কথা ভাবার কোনো কারণ নেই, অনেক সময়েই অনেক অঘটন ঘটে যায় তবু তা যদি সেই সমাজের মধ্যেই ঘটে অর্থাৎ সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষজনের মধ্যে ঘটে তা হোলে তা নিয়ে সেই সমাজভুক্ত মানুষেরা কখনই খুব বেশি ভয়ংকর হোয়ে ওঠে না। অন্য সমাজের মানুষ যাতে সে ঘটনা নিয়ে খুব বেশি সোচ্চার না হয় সেদিকে তাদের দৃষ্টি থাকে খুবই জাগ্রত।

ট্রেনটা আরো একটু কাছে আসতেই প্রথমে মহাবীর ঘোষ এবং পরে প্রত্যেকেই ট্রেনলাইনের উপর থেকে নেমে এলো। ট্রেন চলে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল নীরবে। চলে যেতেই আবার ফিরে আসল লাইনের উপর। কথার ঢেউ আবার প্রবাহিত হোতে থাকল। মহাবীর ঘোষ একটা বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা পুটুকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই আজ কাজে গেলি না কেন ?

শরীর ভাল নেই।—পুটু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ওরই সমবয়সী লক্ষ্মীকে চাপা কণ্ঠে বলল, দ্যাখ-না লক্ষ্মী বুড়ো এ নিয়ে কতক্ষণ প্যানপ্যানাবে, কাজে যাও টাকা আন, না আনতে পারলেই মেজাজ খারাপ। বল গতর কী কারো বারো মাসই সমান থাকে! জানিস লক্ষ্মী কোনোদিনও মানুষটা ভাল করে জানতে চায়নি কী কাজ করি আমি, স্বার্থপর, সব স্বার্থপর। একদিন এ সংসারের কপালে লাথি মেরে চলে যাব সেদিন বুঝবে, বোসে বোসে বিড়ি ফোঁকা বেরিয়ে যাবে।

ও আরো কিছু বলত হয়ত কিন্তু তার পূর্বেই মহাবীরের কণ্ঠ আবার বেজে উঠল, কী হয়েছে ?—প্রশ্নটা করে ঘাড়টা সামান্য কাৎ করে পুটুর দিকে তাকাল।

তোকে বলতে পারব না—বলা যায় না।—পুটুর চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ, লক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুরু হোলো প্যানপ্যানানি। বিশ্বাস কর লক্ষ্মী ইন্দুটার জন্য এ সংসারে পড়ে আছি, যা কিছু করছি সবই ওর জন্য, তা না হোলে…। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ও একটা পাথর ট্রেনলাইনের কাছ থেকে তুলে সামান্য একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

লক্ষ্মী বলল, তুই কোথায় কাজ করিস রে পুটু?

পুটু প্রশ্নটা শুনে ওর চোখের উপর থেকে চোখ সরালো প্রথম, তারপর আস্তে আস্তে বলল, পেলাসটিক ফেকটারিতে।

সেটা কোথায়?

মানিকতলায়।

মানিকতলার কোন্ জায়গায়?

পুটু প্রশ্ন শুনে তেতে ওঠে, বলে, তোর এতো কথায় কী দরকার? তুই কোথায় কাজ করিস আমি কী কখনো জানতে চেয়েছি?

জানতে চাইলেই জানাতাম, না জানানোর কী আছে? হরিসাধন কুণ্ডুর বিড়ির কারখানায় কাজ করি। এছাড়া বাবু যখন যা বলে করি। আমি বাপু তোর মতো অতো চাপা নই, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অতো চাপাচাপি কেন-র‍্যা বাপু! আমার কথা তোদের বলব না-ত কী বাপ-জেঠাকে বলব!

মহাবীর হুস হুস করে বিড়ি ফুঁকছিল আর চোখের কোণ দিয়ে মাঝে মাঝে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বলছিল। কী বলছিল তা পুটু বুঝতে পারছিল না, তবে তারই উদ্দেশ্যে যে কিছু বলছিল সেটা বুঝতে ওর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বাবার দৃষ্টি বাঁচিয়ে মুখ বাঁকালো, এরপর খুব নিচু সুরে বলল, মরণ।

লক্ষ্মী ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, তোর বাপের উপর একটুও ভক্তি-ছোদ্দা নেই কেনরে পুটু?

থাকবে কী করে? গতর খুইয়ে টাকা আনব আমি আর উনি নেশা করে বেড়াবেন। আজ কাজে যাইনি বলে দেখছিস না মুখ কেমন তোলা হাঁড়ি। ঐ মানুষটার উপর ভক্তি-ছোদ্দা থাকবে! বড় বড় ছেলে-মেয়ে অথচ দ্যাখো—কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ও নীরব হোলো। ওর কথায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ ছিল।

লক্ষ্মী তা বুঝতে পেরে ওকে আরেকটু রাগিয়ে দে'য়ার কথা ভাবতে থাকল। বলল, কী বলতে গিয়ে থেমে গেলিরে পুটু? বল না আমাকে, বলতে তোর এতো এ্য কেনরে, তোদের কাছে কোনো কিছু লুকিয়েছি কখনো?

পুটু বিরক্ত সহকারে বলল, বলব আবার কী? আমরা বড় হোয়ে গেছি অথচ দ্যাখো এখনো বছর বছর আমাদের ভাই-বোন বাড়ছে, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলতো! ইন্দ্রটার মুখ চেয়ে আমাকে পড়ে থাকতে হবে আরো কিছুদিন তা না হোলে কবে···

তুই একবার ছিদিম পিসির কাছে যা-না।—মহাবীর মেয়ের উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিল। শেষের কথাগুলো খুব স্পষ্ট উচ্চারিত হোলো না। ঝড়ের মত হঠাৎ কাঁশি শুরু হোলো। বেশ কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে যেন কাঁশির ঝড় বয়ে গেল। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকল।

সুলুক সাঁতরা গলা চড়িয়ে পুটুকে বলল, কী মেয়ে র‍্যা তুই, বাপটা কেঁশে

কেঁশে মরছে আর তুই বসে বসে লক্ষ্মীর সঙ্গে গপ্পো করে যাচ্ছিস! যা-না উঠে গিয়ে ধর-না।

তোমার যদি এতোই দরদ—যাও-না তুমি গিয়ে ধর-না।—বলে পুটু লক্ষ্মীকে বলল, জ্যেঠার দরদ কত দ্যাখ এই মানুষই দু'দিন আগে বাপের গলায় গামছা দিতে বাকি রাখেনি, এসব আদিক্ষে দেখলে শরীরে আগুন জ্বলতে থাকে।

কী কথা ছুড়ির ছেঃ!—সুলুক সাঁতরা এ পর্যন্ত বোলে গলার স্বর খাদে নামিয়ে আরো কিছু বলল। কী বলল তা শুধু পুটুই নয় কারো কানেই পেঁছিল না। না পেঁছিলেও সকলেই বুঝল পুটুর উপরই বিষদ্গার করল।

সুলুক সাঁতরা আজ থেকে ঠিক পঁয়তিরিশ বছর আগে এখানে এসে আস্তানা গাড়ে। একা নয়, দশ-বারোটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়। রেললাইনের দু'পাশে রেলের অনেকটা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। এ জায়গায় বোসে গেলে কেউ তাদের উৎখাত্ করতে আসবে না বলেই মনে হয়েছিল সুলুক সাঁতরার। খুব নিরপদ্রবে থাকা যাবে। কথাটা মনে হোতেই ইন্টালি সি-আই-টি রোডে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা পাইপের মধ্য থেকে সপরিবারে বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে আরো দশ-বারোটা পরিবারকে বার করে এনেছিল কর্পোরেশনের পাইপের ভেতর থেকে। কাঠ-পাতা, ছেঁড়া চট, পিচের ড্রামের ঢাকনা এবং রাস্তায় পড়ে থাকা আরো কিছু বাতিল জিনিস কুড়িয়ে এনে গড়ে তুলেছিল মাথা গোঁজার মতো আস্তানা। এরপর আরো অনেকে এসে তাদের সঙ্গী হয়েছিল। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ততই ঝুপড়ির সংখ্যা বাড়ছিল সেই সঙ্গে জনসংখ্যাও। থিকথিকে আরশুলার মতো বিরাট জনসংখ্যা এখন। গায়ে গায়ে ঠেকে যাবার মতো জনসংখ্যা এদের, তা সত্ত্বেও তা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় এরা। ঝুপড়িগুলোও যেন জড়াজড়ি করে আছে এক জায়গায়। যেন এক আলাদা পৃথিবীর মানুষ এরা। এদের নিয়ে কেউই ভাবে না। এমনকি রাজনৈতিক নেতারা যে এদের নিয়ে খুব বেশি ভাবে এ প্রমাণ এখনো মেলেনি। এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থেকেও শমনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে কীভাবে বেঁচে আছে তা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। যে অবস্থায় এরা এসেছিল এখনো যে সে অবস্থায় আছে তা বলা সমীচীন হবে না, বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে এই তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের মধ্যে। ঘর-দোরেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং জীবন-যাত্রার মানও কিছুটা উন্নত হয়েছে। অবশ্য বিরাট কোনো পরিবর্তন আসেনি ঠিকই তবু যেটুকু এসেছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কী কী পরিবর্তন এসেছে তা সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে ধীরে ধীরে বর্ণিত হবে। এই পরিবর্তনের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান খুব কম নয় সে কথাও ব্যক্ত করা হবে উপন্যাসের পরবর্তী অংশে।

সূর্যের আলোয় যে রকম চাঁদ আলোকিত সে রকম ওরাও মধ্যবিত্ত ক্লাসের কাছ থেকে কিছুটা আলো পেয়ে আলোকিত অর্থাৎ অনেক কিছুই পেয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের কাছ থেকে। নিঃসন্দেহে মিড্ল্-ক্লাস-কনজারভেটিভনেস ভয়ংকর তবু

তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে ওরা একথা অস্বীকার করা চলে না। সে কথা আজ হয়ত ওরাও স্বীকার করবে। ট্রেনলাইনের পাশে যে ঝুপড়িগুলো আগাছার মতো গজিয়ে উঠেছে তা এক সময় পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবেছিল। পরে সি-আই-টির দৌলতে রেললাইনের কাছেই গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্তদের বাড়ি-ঘর-দোর আর তখন থেকেই ঝুপড়িগুলো আলোর স্পর্শ পেতে থাকল। এ অঞ্চলের নাম লেক গার্ডেন্স। ট্রেনলাইনের ধার ঘেঁষে যে ফাঁকা জায়গার উপর ঝুপড়িগুলো গজিয়ে উঠেছে তার পাশ দিয়ে পিচের সড়ক, সেই সড়কের অন্য পাশ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের বাস। খুব কাছাকাছি বলেই বস্তির বাসিন্দারা খুব কাছ থেকে মধ্যবিত্তদের দেখতে পাচ্ছে সেই সঙ্গে অনেক কিছুই পাচ্ছে, পাচ্ছে বলেই একটু একটু করে অনেক পরিবর্তন আসছে ওদের মধ্যে। চন্দন গাছের পাশাপাশি যে সব গাছ জন্মায় তারা যে রকম চন্দনের গন্ধ লাভ করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যেভাবে চন্দনের গন্ধ সংক্রামিত হয় সেভাবে মধ্যবিত্তদের অনেক কিছুই ওদের মধ্যেও সংক্রামিত হোচ্ছে। ওদের মধ্যে যেমন পরিবর্তন আসছে ওদের ঝুপড়িগুলোর মধ্যেও সে রকম অনেক পরিবর্তন আসছে। ঝুপড়ির ভিড়ের মধ্যে কিছু ইঁট সিমেন্টের ঘরও নির্মিত হয়েছে। কিছু কিছু বস্তির মাথার উপর কাঠ-খড়-ছেঁড়া চট ভাঙা টিনের টুকরো নারকেল পাতা আর হোগলার পরিবর্তে টালির চাল হয়েছে। পান-বিড়ি আর মুদির দোকানও হয়েছে কয়েকটা। কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে বই-খাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করছে আজকাল। মেয়েরা আগে বে-আব্রু হোয়ে লেকে স্নান করত। এখনো করে, তবে আগের মতো অতটা বে-আব্রু হোয়ে নয়। আগের তুলনায় ওরা কিছুটা সংযত হোলেও এখনো যেভাবে স্নান করে ফিরে আসে তা দেখলে ভদ্রজনের দৃষ্টি হোঁচট খায়। সিক্তবসন যেভাবে ওদের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকে তাতে শরীরের কোনো ভাঁজ দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না। আগে আরো ভয়ঙ্কর ছিল ; তখন স্বচ্ছবসনের অভ্যন্তরে যা কিছু সবই দৃষ্টির সীমানার মধ্যে নির্বিধায় প্রবেশ করত। ছেলেরাও নির্লজ্জ কম ছিল না। কম ছিল না বলছি কেন. নিঃসন্দেহে ওরা মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই নির্লজ্জ ছিল এবং এখনো একই রকম নির্লজ্জ। অশালীন ভাষাবিহীন কোনো বাক্য ওদের মুখ থেকে নির্গত হয়ই না। অধিকাংশ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও ওদের মুখে রাষ্ট্রভাষা খুব ভালভাবেই সর্বক্ষণ জাঁকিয়ে বসে থাকে। চুরি ছিনতাই অনেকেরই অর্থ রোজগারের একমাত্র উপায়। এদের সর্বাধিক আকর্ষণীয় খেলা জুয়ো। কুরুচিপূর্ণ সিনেমা এদের ভীষণভাবে আকর্ষিত করে। বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা মহিলাদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায় শয্যায় পরস্পরকে কাছে পাওয়া। এরই পরিণতি বস্তির ঘরে ঘরে নবজাতকের কান্নার শব্দ প্রতি বছরই বাতাসকে ভরিয়ে তোলে। এরা অসম্ভব ধর্মান্ধ। ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ার থেকে দেবদেবীর চরণামৃততেই বেশি আস্থা রাখে। অলৌকিক কোনো কাহিনী তা যতই অবাস্তব হোক ওরা বিশ্বাস করে। এর জন্যই প্রায় প্রত্যেকের অঙ্গেই থাকে তাবিজ কিম্বা

গাছ-গাছরার শেকড়। রোগে আক্রান্ত হোলে ছোটে ছিদিম পিসির কাছে কিম্বা শীতলার বিগ্রহের কাছে হয় মাথা ঠোকে না হয় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো অবৈধ ব্যাপার এদের গোচরে আসলে এরা প্রীত হয়। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেই ব্যাপার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। যথেষ্ট টিকা-টিপ্পনিসহ তা এক একজন এক এক ভাবে অন্যজনের কাছে পরিবেশন করে। এদের জগৎ খুবই ছোট। বিশ্ব-সংসারের খুব কম খবরই এরা রাখে। এদের মধ্যে একমাত্র সুলুক সাঁতরা অনেক খবর সংগ্রহ করে প্রতিদিন। খুব মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজের আদ্যপ্রান্ত পড়ে তারপর সেই সংবাদ এর তার কাছে পরিবেশন করে। যাদের কাছে বলা তারা যে তা মনোযোগসহকারে শোনে তা নয়, যৎসামান্য শোনে। সুলুক সাঁতরা ছাড়া আরো একজন মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ে। তার নাম ইন্দ্র ঘোষ। ইন্দ্র ঘোষ শুধু খবরের কাগজই পড়ে না অনেক কিছুই পড়ে। দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকে। এর জন্য ও আরো একটা নামে পরিচিত, ওকে অনেকে বিদ্যেসাগর বলে ডাকে। আসলে এরকম একটা ব্যতিক্রম অনেকেই ভাল চোখে দেখে না। ইন্দ্র একটু একটু করে ওদের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এটা অনেকেই সহ্য করতে পারছিল না। আরো একটা কারণে অনেকে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। ইন্দ্র শিক্ষিত হোয়ে উঠেছে। এ বছর ও স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছে। প্রথম প্রথম ওকে পড়তে দেখে অনেকেই ভেবেছিল ক'দিন আর দু'দিন বাদেই ওসব পাট উঠে যাবে। কিন্তু তাদের সে ধারণা যে ঠিক নয় তা প্রত্যেক বছরই প্রমাণ করে চলেছে ইন্দ্র। অর্থের অভাবে যাতে ওর পড়া বন্ধ না হোয়ে যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে পুটু। যে কোনো কারণেই হোক পুটুর অনেক আগে থেকেই মনে হোত ও অনেক বড় হবে। এই কারণেই পুটু ওকে প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করছে। নিজের শরীরের উপর অত্যাচার করে চলেছে অর্থ রোজগারের জন্য। এভাবে অর্থোপার্জনের একমাত্র কারণ ইন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কোনোভাবেই যাতে অর্থাভাবে ওর পড়া না বন্ধ হোয়ে যায় সেইজন্যই এতো অত্যাচার শরীবের উপর। আটজন ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রর উপর ওর অনেক আশা। ওকে নিয়ে ওর অনেক স্বপ্ন। শুধু ভেবে পায় না এতো আবর্জনার মধ্যে ইন্দ্রর মতন ছেলে এলো কীভাবে। শুধু মগজই নয় চেহারাটাও ওর অন্য রকম। গায়ের রং যা তাতে খুবই ফর্সা বললে মিথ্যে বলা হবে না, এর উপর ভীষণ ধারালো চেহারা। নিঃসন্দেহে ও অসাধারণ সুন্দর। পুটুর মনে একটা সন্দেহ আছে, হয়ত সেটা সত্যি নয় কিন্তু সত্যি যে হোতেই পারে না একথা জোর করে বলতে পারে না। মনের ভেতর সন্দেহটা আছে বলেই বাবার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এক এক সময়। কিছু একটা খুঁজে বেড়ায়। মায়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। ইন্দ্রকে ও অসম্ভব ভালবাসে ঠিক তবু ইন্দ্র ওর কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন। পুটু এক এক সময় ওকে খুব কাছে টেনে আদর করে, গালে গাল ঠেকায়, আসলে ও ইন্দ্রর শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে যেন কিছু

আবিষ্কার করতে চায়। ও যখন ইন্দ্রকে কাছে টানে তখন ওর বাইশ বছরের যৌবন ইন্দ্রর শরীরের উপর ভাঙে। ইন্দ্র লজ্জা পায় সেই সঙ্গে অস্বস্তিও হয়, দু'হাতে দিদিকে সরিয়ে দিয়ে বলে, কী করছিস—ছাড়।—পুটু হাসে, বলে, তুই আমার রাজা ভাই, তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখি জানিস! তুই অনেক লেখাপড়া শিখবি, অনেক বড় হবি, বাবুদের মতো বড় হবি—হবি ত' ভাই? বল না হবি কিনা?—ইন্দ্র বলে, চেষ্টা করব। এভাবে এক একদিন এক এক ভাবে বাক্য বিনিময় হয় ভাই-বোনের মধ্যে। পুটুর মনে অনেক প্রশ্ন, সবই ইন্দ্রকে ঘিরে। ও এই পরিবেশে কতটা এগোতে পারবে সে এক প্রশ্ন আবার লেখাপড়া শিখলে বাবুদের একজন হোয়ে উঠতে পারবে কিনা সে আরেক প্রশ্ন। কত বছর লেখাপড়া করতে পারলে বাবুদের মতো হোয়ে উঠবে তা বুঝতে পারে না। এক একদিন এক একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে চায় ইন্দ্রর কাছ থেকে। কোনো কোনোদিন প্রশ্ন করে জানতে চায় বাবুদের মতো হোতে গেলে কটা পাশ ওকে দিতে হবে, সেই সঙ্গে পড়াশোনা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা নে'য়ার উদ্দেশ্যে একের পর এক প্রশ্ন করে যায় ওকে। ইন্দ্র জানায় অনেক কিছু কিন্তু ও কতটা এগোতে পারবে তা সঠিকভাবে বলতে পারে না। বলে, পড়ার খরচ অনেক। স্কুল ফাইন্যালটা পাশ করি তারপর একটা চাকরির চেষ্টা করব, পেলে নাইটে পড়ব। শুনে পুটু রেগে যায়, বলে, তোকে বলেছি না ও ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না, টাকা আমি দেব। তুই ইঞ্জিনিয়ের পড়বি।—শুনে ইন্দ্র হাসে, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার খরচের বহরটা জানায় ওকে। শুনে পুটুর উৎসাহ অন্তর্হিত হয় ও এতোটা ব্যয়সাপেক্ষ ভাবেনি। পরে বলে, ইঞ্জিনিয়েব ছাড়া অন্য কিছু পড়লে কত টাকা লাগবেরে ইন্দ্র?—ইন্দ্র জানায়। শুনে আশ্বস্ত হয় ও, বলে, এ টাকার জন্য তোর পড়া আটকাবে না।—এভাবে দিনের পর দিন দু'জনের মধ্যে ঐ একটা ইচ্ছেকে কেন্দ্র করে অনেক কথা আদান-প্রদান হয় প্রায়ই। বস্তির অনেকের মতে এসব বাড়াবাড়ি। কেউ কেউ ত' ওদের সামনেই আজেবাজে মন্তব্য করে বসে। ঝুমরি ত' একদিন সাংঘাতিক মন্তব্যই করে বসল, বলল, তোদের ব্যাপার-সেপার দেখলে অঙ্গ জ্বলে যায়। দেখে মনে হয় মায়ের পেটের ভাই ত' নয় যেন···ছিঃ।—পুটু কথাটা শুনেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর চুল ধরে মাথাটা হিড়হিড় করে টেনে এনেছিল বুকের কাছে তারপর আঁচড়ে-খিমচে ওর মুখটা ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর বাতাসের পর্দাকে ফাটিয়ে ফেলেছিল। চিৎকার করে বলেছিল, শালা ছোটলোকের বাচ্চা ভাই-বোনের সম্পর্ক কত পবিত্র তা তোদের মতো নোংরা মেয়েছেলেরা বুঝবে কী করে! তোদের মুখ দরশন করলেও পাপ বুঝলি রাক্ষুসী। সন্ধ্যে হোলে সোনো-পাউডার গালে মাখিস, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষিস, দামী শাড়ি পরে, ছোট্ট এটটুকুন বেলাউজ পরে পেট-বুক খোলা রেখে কী করতে যাস তা কী আমি জানি না ভেবেছিস! নষ্ট মেয়েমানুষ এর থেকে তুই ভাল কথা কী বলবিরা?—ঝুমরি হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় তখন মুখ খুলতে পারেনি, পরে ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে পুটুর কাছ

থেকে নিষ্কৃতি পেল, পেয়ে বাক্যবাণে জর্জরিত করে ফেলতে চাইল ওকে, বলল, তুই কী করে বেড়াস সেটা বলছিস না কেন, পেলাসটিক ফেকটারিতে তোর মুখ দেখে এত্ত টাকা দেয়! আমার আর মুখ খোলাস না, মুখ খোলালে তোর কাপড় খুলিয়ে ছাড়ব। নিজে ছেনালী করলে দোষ নেই—না? সেদিন ঐ সময়ে লক্ষ্মী এসে না পড়লে ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পেঁছিত বলা মুশকিল। যাই হোক লক্ষ্মী আসাতে ঝগড়া আর বেশি দূর গড়াতে পারেনি ও এসেই দু'জনকে থামিয়ে দিয়েছিল। পুটু বুঝেছিল মুখ না চালালে পড়শীদের থামিয়ে রাখা যাবে না। ইন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হোলে মুখ চালিয়ে যেতেই হবে। ও খুবই নিরীহ, ওকে যদি ঐ মন্তব্য ক্রমাগত শুনতে হয় তাহোলে হয়ত পড়াই বন্ধ করে দেবে। এটা বুঝতে পারে বলে ও খুব সতর্ক হোয়ে থাকে যাতে কেউ কিছু ওকে বোলে না যেতে পারে। আজও রেললাইনের উপর বসে ইন্দ্রকে নিয়েই ভাবছিল। এর জন্য ও একটু অন্যমনস্ক ছিল। লক্ষ্মী সেটা বুঝতে পেরে বলল, কী ভাবছিস্‌রে পুটু? ফেকটারির কথা?

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় পুটু।

তোকে একটা কথা বলব রাগ করবি নাত?

রাগের কথা না হোলে রাগ করব কেন, কী বলবি? পুটু প্রশ্ন করে লক্ষ্মীর চোখের উপর চোখ রাখে।

ইন্দ্রটা যত বড় হোচ্ছে ততই সুন্দর হোচ্ছে ঠিক যেন কাত্তিকের মতো চেহারা।

পুটু কোনো উত্তর দেয় না কিন্তু ওর চোখে থাকে সন্দেহ। সন্দেহের চোখে তাকাবার কারণ আছে। মাস কয়েক আগে একদিন ইন্দ্র ওর কাছে অভিযোগ করেছিল, বলেছিল, দিদি তোর বন্ধুটা ভারী অসভ্য।—পুটু জানতে চেয়েছিল কার কথা বলছে ও। জানার পর প্রশ্ন করেছিল কী অসভ্যতা করেছে লক্ষ্মী। ইন্দ্র জানিয়েছিল ঘটনাটা। লক্ষ্মী ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। শুনে ও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। লক্ষ্মীর সঙ্গে এ নিয়ে হাতাহাতি হয় আর কী, বেশ কিছুদিন দু'জনই পরস্পরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। পরে লক্ষ্মী নিজে এসে ভাব জমিয়েছে আবার। বলেছে, পুটু তুই মিথ্যে মিথ্যে রাগ করছিস, আমি ইন্দ্রকে কী সেভাবে আদর করেছি নাকি।—ও বুঝে উঠতে পারেনি, বলেছে, সেভাবে করিসনি ত' কীভাবে করেছিস? লক্ষ্মী জানিয়েছিল পুটু যেভাবে ওকে আদর করে সেও ঐ ভাবেই আদর করেছে, ভাইকে দিদিরা যেভাবে আদর করে সেভাবে করেছে। ও বিশ্বাস করেনি, বলেছে, কেন মিথ্যে বলছিস? লক্ষ্মী ভাইয়ের মতো আদর করলে অতো বড়ছেলের ঠোঁটে কেউ চুমু খায় না। লক্ষ্মী এ কথার পৃষ্ঠে চট করে কিছু বলতে পারেনি, কী বলবে ভেবে না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছে তারপর আস্তে আস্তে বলেছে, এবার রাখী পূর্ণিমের দিন ইন্দ্রকে রাখী পরিয়ে দেবো।—এরপরই অন্য কথা পেড়েছে, প্রসঙ্গ থেকে সরে অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছে। পুটুও ঐ ব্যাপার নিয়ে আর প্রশ্ন তোলেনি কিন্তু এরপর লক্ষ্মীকে পুরোপুরি

বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ ইন্দ্রর সম্বন্ধে ওর কাছ থেকে কথাটা শুনে খুশি হোতে পারেনি। সন্দেহ আবার জাঁকিয়ে বসল ওর মনে। লক্ষ্মীর চোখে চোখ রেখে ওর মনের কথাটা বুঝে নিতে চাইল।

ও ঠিক বাবুদের মতো হোয়ে যাচ্ছে।—লক্ষ্মীই আবার কথা বলল।

ওকে আমি অনেক লেখাপড়া শেখাব তারপর ও একদিন বাবুদের একজন হোয়ে যাবে।—লক্ষ্মীর কথা সমাপ্তির পর পুটু ওর মনের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করল।

কথাটা লক্ষ্মীর বিশ্বাস হয় না তাই বলে, লেখাপড়া শিখলে বাবুদের একজন হোতে পারবে?

পারবে না কেন! বাবুদের কী চাট্টে করে হাত-পা আছে! লেখাপড়া শিখলে বড় চাকরি করতে পারবে, অনেক টাকা পাবে তখন, বাবুদের পাড়ায় বাসা ভাড়া করবে, ভাল ভাল জামাকাপড় পরবে, বাবুদের মেয়েদের কাউকে বিয়ে করবে ব্যাস তখন বাবু হোতে বাধাটা কোথায়! পুটু কথা বলতে বলতে মনে মনে একটা ছবি আঁকতে থাকে। একটা সুখ-স্বপ্নের মধ্যে ও যেন হারিয়ে যেতে থাকে।

লক্ষ্মী বলে, বাবুদের মেয়েরা ওকে বিয়ে করবে!

নিশ্চয়ই করবে। তখন কতো মেয়ে ওর সাথে পেরেম করতে চাইবে দেখবি।

আচ্ছা পুটু আমি যদি লেখাপড়া শিখে ইস্কুল-ফাইলেন পাশ দি তাহোলে আমার সঙ্গে বাবুদের ছেলেরা পেরেম করবে?

পা—গো—ল! ইস্কুল-ফাইনেল পাশ করা কী এত্তো সোজা, কত্তো মোটা মোটা বই পড়তে হয় দিনরাত তবেব গে পাশ দে'য়া যায়। ক্ষেমতা থাকা চাই বুঝলি লক্ষ্মী—তোর আমার কম্মো নয়।

লক্ষ্মী কথাটা বলেছিল বটে কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা যে সহজ নয় তা ও জানে তাই পুটুর কথা সমর্থন করে বলল, হ ও আমাদের কম্মো নয় কঠিন বটে'। আমাদের জন্মটাই বেথা, দশজনের কুকথা শোনো, হয় পরের বাড়ি কাজ কর না হয় কলকারখানায় লেবার হউ—এ একটা জীবন!

কথাটা মিথ্যে নয় লক্ষ্মী, তবু এ শরীরটার একটা দাম আছে, কত বাবুদের দেখবি আমাদের মতো মেয়েদের শরীরটা যেন গিলে খেতে চায়।

কিছুছু দাম নাই-রে পুটু, কিছুছু দাম নাই, থাকলে কেউ কেউ বিশ-তিরিশ টাকা দিয়ে আমাদের ইজ্জত কিনে নিতে চাইতে পারত না। বাবুরা মনে করে আমাদের ইজ্জতের কোনো দাম নাই।

লক্ষ্মীর কথা শেষ হওয়ার পর পুটু কিছু বলবে বলে মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার পূর্বেই একটা অঘটন ঘটে গেল। হঠাৎ মহাবীর কাঁপতে কাঁপতে ট্রেনলাইনের পাশে পড়ে গেল। যারা বসেছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দৌড়ে এসে তাকে প্রথমে তুলে ধরল তারপর কেউ ছুটল জল আনতে কেউ ছুটল ছিদিম পিসির কাছে। মহাবীরের চারপাশে ভিড় জমে গেল। ভিড়ের মধ্য থেকে নানাজনে পুটুকে উদ্দেশ্য করে নানা কথা বলতে শুরু করল। কেউ বলল, ছুড়ির দেমাক

কত। বাপটা কেঁশে কেঁশে মরছিল দেখেও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না, বসে বসে গল্প করছিল লক্ষ্মীর সঙ্গে এরকম মেয়ে থাকার থেকে না থাকা ভাল। আবার কেউ বলল, ছুঁড়ির স্বভাব-চরিত্র ভাল না। কতজন যে কত কথা বলতে থাকল তা বোলে শেষ করা যাবে না। যার সম্বন্ধে এতো কথা তার তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। এ ধরনের মন্তব্য কোনো কিছু ঘটে গেলে প্রত্যেককেই শুনতে হয়। এসব এখানে নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার। পুটু নীরবতা বজায় রেখে বাবার মুখের উপর ঝুঁকে বসে থাকল। এ ঘটনা নতুন নয়, ইতিপূর্বে একাধিকবার অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং প্রত্যেকবারই পাঁচ-সাত মিনিট পর আবার সুস্থ হোয়ে উঠেছে মহাবীর। এবারও যে একটু পরেই মানুষটা সুস্থ হোয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই পুটুর। সবাই ভাবে ছিদিম পিসির ফুঁক-মন্তরের জোরে মানুষটা সুস্থ হোয়ে ওঠে কিন্তু ও তা বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা ওসব মিথ্যে। এই ধারণা ওর এমনি হয়নি ইন্দ্র বুঝিয়েছে। ফুঁক-মন্তরের জোরে যদি মানুষ ভাল হোয়ে যেত তাহোলে হাজার হাজার টাকা খরচ করে কেউ ডাক্তারি পড়ত না, কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেউ আর ওষুধের ব্যবসা ফেঁদে বসত না। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বলেই ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না বস্তির বাসিন্দারা তাই বিকল্প হিসেবে এ ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে। ফুঁক-মন্তর শুধু দুর্বল এবং মানসিকভাবে পঙ্গু মানুষের একমাত্র উপায়। ইন্দ্র জানিয়েছে ওকে। বুঝিয়েছে মানুষ কোন অবস্থায় পড়লে এইসব ফুঁক-মন্তরে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এই যে আজ ভিড়ের মধ্য থেকে ছিদিম পিসির সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কল্পিত কাহিনী ভেসে আসছে তা শুধুমাত্র এখানকার মানুষদের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয় একথা এখন পুটুর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাদের কথা শুনে ওর কপালে জন্ম নিল কয়েকটা বিরক্তির রেখা। শেষ পর্যন্ত ও আর ধৈর্য্য রাখতে না পেরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে বলল, ও সব কথা বন্ধ কর তোমরা। ফুঁক-মন্তর দিয়ে মানুষকে ভাল করা যায় না। ছিদিম পিসিকে আমি বাপের কাছে আসতে দেব না দেখি মানুষটা ভাল হয় কিনা।—ওর কথা শুনে প্রত্যেকের অবস্থা কিরকম হোলো তা বোঝাতে হোলে বলতে হয় চোখের সামনে কোনো ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পেলে মানুষ যে রকম বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে অনেকটা অনুরূপ অবস্থা হোলো তাদের। প্রথমে মালতি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল, কী মেয়েরে তুই এই টেইমে এ কথা বল্লে কী বাপটার মরণটা ডেকে আনবি! মালতির মুখ খোলার পর অনেকেই মুখ খুলল। অনেক কথা যেন আছড়ে এসে পড়ল পুটুর উপর। যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো নিক্ষিপ্ত হোতে থাকল তার এখন আর তাতে চিত্তের অস্থিরতা বিন্দুমাত্র বাড়ল না। পুটু যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে থাকল। ইতিমধ্যে ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, লালি আর চাঁপা সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ভিড় ঠেলে এগিয়ে মহাবীরের কাছে আসতে শুরু করল। চাঁপাকে দেখতে পেয়ে সুলুক সাঁতরা বলল, যাও যাও জলদি যাও সোয়ামি ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে ওকে ঘরে নিয়ে যাও। তোমার ছেলে-

মেয়েদের বল ধরে নিয়ে যেতে। ছিদিম পিসি ঘরে নেই শুনলাম কী যে হবে এখন কে জানে! ইন্দ্র বিরক্ত হোয়ে বলল, চুপ কর জ্যেঠা, ছিদিম পিসি থাকলেও আমি তাকে বাবার ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতাম না। রাবিশ যত সব কথাবার্তা। কথাটা শুনে সুলুক সাঁতরা আহত কণ্ঠে বলল, ইন্দ্র তুই দু'পাতা ইংরিজি না হয় পড়েছিস তাই বলে বাপ-জ্যেঠাকে মান্যি করবি না, ইংরিজিতে গাল পাড়বি এটা কী উচিত হোচ্ছে তোর? ইন্দ্রর কপালে ভাঁজ আরো ঘন হোলো, বিরক্তি সহকারে বলল, ওটা গালাগালি নয়। বলে ভিড় ঠেলে খুব তাড়াতাড়ি এগোল। মহাবীরের কাছে পেঁছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কানটা নামিয়ে আনল ওর বুকের উপর। পাঁচ-দশ সেকেন্ড ঐভাবে বসে থাকার পর আস্তে আস্তে ঘাড়টা তুলল, তুলে ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলল, অ্যাকিউট ব্রোংকিও ট্রাবল। বলেই বুঝল তার কথা ওরা বোঝেনি। তাই পুনর্বার মুখ খুলল, বলল বুকে কফ জমে আছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে, এই ঠাণ্ডায় আর বাবাকে না ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে যাওয়া উচিত। চল ধরে নিয়ে আগে ঘরে ঢোকাই তারপর অন্য ব্যবস্থা। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রর থেকে বছর দুয়েকের ছোট, ছোট হোলেও ওর শারীরিক ক্ষমতা অনেক বেশি এবং এটা ও নিজেও খুব ভাল ভাবেই জানে। জানে বলেই ইন্দ্রর বক্তব্য শুনে বলল, কাউকে হাত লাগাতে হবে না আমি একাই পারব। কথাটা শেষ করেই দু'হাতে মহাবীরকে বুকের কাছে তুলে নিল ও। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহাবীরের ঘাড়টা তুলে ধরে বলল, চল। বলে পা বাড়ালো ও সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও এগোতে শুরু করল। পুটু, লালি এবং চাঁপা ওদের পাশাপাশি হেঁটে চলল। অন্যান্যরাও চলল তাদের অনুসরণ করে। ঝুপড়িতে আসার পর তিরিশ-পঁয়তিরিশ মিনিট পর মহাবীরের জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরল বটে কিন্তু তখনো তার অবস্থা আশংকাজনক। ইন্দ্র পুটুকে জানিয়েছিল ডাক্তার আনতে হবেই না আনলে মহাবীরের অবস্থার উন্নতি হবে না। জানালেও পুটুর কিছু করার ছিল না কারণ হাতে টাকা নেই। একেই ফেকট্রি থেকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে ইন্দ্রর বই কিনেছে ও তার উপর যদি আবার আরো অ্যাডভান্সের জন্য মালিকের কাছে হাত পাততে যায় তাহোলে তার কপালে কী জুটবে তা ও ভাল করেই জানে। অহেতুক তিরস্কারের জন্য মালিকের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কোনো অর্থই হয় না! এদিকে ইন্দ্র যা জানিয়েছে তাতে বাবাকে দেখানো একান্তই প্রয়োজন। কী যে করবে ভেবে পেল না। লক্ষ্মীকে জানালো ওর অবস্থার কথা। লক্ষ্মীর হাতে টাকা ছিল না তবু ও পুটুকে বলল, দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা, পারলে দিয়ে যাব। এ পর্যন্ত বলার পরই লক্ষ্মী ছিদিম পিসির কথাটা আরো একবার বলে দেখবে কিনা ভাবল; পরে মনে হোলো না তোলাই ভাল, আসলে ছিদিম পিসির কথা শুনে ইতিপুর্বে পুটু যেভাবে রেগে উঠেছিল সে দৃশ্যটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠাতে ও মুখ খুলতে সাহস পেল না। কিছুক্ষণ পুটুর সাথে কথা বলার পর লক্ষ্মী চলে গেল। রাত দশটার সময় ও আবার আসল তার কাছে। এসে কুড়িটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, একটা

কথা বলব রাগ করবি নাত ? ঝুমরি তোর সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়। ও তোকে যে কথা বলেছিল তার জন্য ও শুধু নিজের গায়ে থুথু ছেটাতেই বাকি রেখেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছে ও। এতোদিন তোর রাগ পুষে রাখা উচিত নয়। জানিসই ত' বস্তিতে থাকলে সব সময় মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোতে চায় না, ভদ্দর লোকদের মতো ভাল কিছু ভাবতেও পারি না আমরা, বলতেও পারি না, কী করে পারব কী আছে আমাদের ! আসলে কী জানিস আমরা হচ্ছি নর্দমার পোকা, নোংরা ছাড়া থাকতে পারি না।

পুটু কী করবে সঙ্গে সঙ্গে ভেবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না, লক্ষ্মীর চোখে চোখ রেখে দু'দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল, এরপর বলল, ঠিক আছে একটু ভেবে দেখি। --লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর সত্যি সত্যি ভাবল ঝুমরিকে নিয়ে। মনের মধ্যে যদিও একটু অস্থিরতা এবং অস্বস্তি ছিল তবু পরের দিন দুপুরের দিকে ওর সঙ্গে দেখা করল।

আয় পুটু।—পুটু ঝুমরিদের ঝুপড়িতে ঢুকতেই প্রথমে অভ্যর্থনা জানালো ঝুমরি তারপর পুটুর বাবার শারীরিক অবস্থার কথা সেই সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইল।

পুটু বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল, ভাল নেই, আজ নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে কী যে হবে কে জানে !—জানিয়ে ঝুপ্ করে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

কেনরে ?—প্রশ্নটা করে ঝুমরিও ওর পাশে বসে পড়ল।

ওষুধ কিনবার টাকা যোগাড় করতে পারব কিনা জানি না। ভগ্নস্তুপের মতো বসে দু'হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঝুমরির প্রশ্নের জবাব দিল পুটু।

মডেলিং করবি ? রোজ পঁচিশ-তিরিশ টাকা আয় করতে পারবি, করবি ? —প্রশ্ন করে ঝুমরি ওর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

মডেলিং সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই পুটুর। ইতিপূর্বে অবশ্যই কথাটা শুনেছে এবং ভাসাভাসা একটা ধারণা আছে কিন্তু মডেলিং-এর বিভিন্ন দিকগুলো সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি কিম্বা অসম্মতি কোনোটাই জানাতে পারল না। কাজটা কী করতে হবে জানতে চাইল।

ঝুমরি বলল, আর্টিসের কাছে তুই বসবি আর তোকে দেখে দেখে সে ছবি আঁকবে। ডাক্তারের কাছে কেউ লজ্জা পায় পুটু ?

কেন ! এ প্রশ্ন কেন করছিস ?

বলই না আগে তারপর বলব।

না, ডাক্তারের কাছে লজ্জা করলে কী চলে।

ঠিক। ডাক্তারের কাছে লজ্জা করতে নেই, আর্টিসের কাছেও লজ্জা করতে নেই।

তার মানে ! খুলে বল ঝুমরি।

তুই বিশ্বাস কর পুটু বাবুদের মেয়েরাও মডেলিং করে ওটা খারাপ নয়।

কী করতে হবে সেটা বল।—একটা অস্বস্তি পুরোপুরি পুটুকে গ্রাস করে ফেলল। ঝুমরি যেভাবে কথা বলেছে তাতে ওর বুঝতে অসুবিধা হোলো না ও এমন কিছু বলবে যা স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হোলে ওর মধ্যে এতো দ্বিধা থাকত না। নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারত।

বড় বড় আর্টিসরা ন্যুড-স্টাডি করে।—এরপর ঝুমরি ন্যুড-স্টাডি ব্যাপারটা কী তা জানাবার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে চলল, মানে কাপড়-জামা খুলে দাঁড়াতে হয় আর্টিসের সামনে ; এক এক ভাবে দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে ছবি আঁকে তারা। আর্টিসরা কিন্তু কখনই খারাপ চোখে দেখে নারে পুটু, তোর যদি বিশ্বাস না হয় ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।

কথাটা শুনেই তেতে ওঠে পুটু, ইন্দ্র আমার ভাই তাকে একথা আমি জিজ্ঞেস করব! তোর সঙ্গে দেখছি কথা বলাই ভুল হয়েছে আমার।—কথা শেষ করেই ও উঠে পড়তে যায় কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেই ঝুমরি ওর হাতটা টেনে ধরে বলে, আমি ও কথা না ভেবেই বলেছি তুই বিশ্বাস করছিলি না বোলে বলে ফেলেছি, এবারেব মতো মাপ করে দে ভাই। ঠিক আছে তুই আমার গালে চড় মেবে দে তাহোলেই ত' হবে!

পুটু কোনো উত্তর দেয় না নীরবে বোসে ভাবতে থাকে। সম্মতি জানানো সহজ নয়। একটা পুরুষমানুষের কাছে নিরাবরণ অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কিম্বা বোসে থাকা সহজ কথা নয়। মনে মনে ওরকম একটা দৃশ্যের কথা ভাবতেই ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।

ঝুমরি ওর অবস্থাটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই বলে, আমি খুব খাবাপ—নষ্ট মেয়ে, আচ্ছা পুটু নষ্ট মেয়ে হোলে কী তার মধ্যে ভাল কিছুই থাকতে পারে না? বিশ্বাস কর আমি খারাপ হোলেও কাউকে খারাপ করতে চাই না। যার কাছে তোকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি তার বয়স হয়েছে চুলে পাক ধরেছে, তাছাড়া মানুষটা খুব ভাল দেখবি, মা ছাড়া কথা বলে না। যাই হোক ভেবে দেখ রাজী থাকলে আমাকে জানাস।

অবস্থার চাপে পড়ে কাজটা হয়ত নিতে হোতে পারে ভেবে পুটু ঐ ব্যাপারটা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল ঝুমরিকে। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর ও উঠে পড়ল। কী করবে ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে আসল। এসেই শুনল স্কুল-ফাইন্যালের খবর বেরিয়েছে। ইন্দ্র গেজেট দেখতে গেছে। খবরটা শুনে ওর চিত্তে অস্থিরতা বাড়ল, ঘরময় পায়চারী করতে শুরু করল। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা এই অস্থিরতার কারণ খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। লালি আর যুধিষ্ঠির বুঝতে পারল ওর এই অস্থিরতার কারণ। যুধিষ্ঠির ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, বিদ্যেসাগরের জন্য তোর দেখছি শ্বাস পড়ছে না।

কথাটা শুনে ও দাঁড়িয়ে পড়ল, বিরক্ত সহকারে বলল, নিজের দাদার সম্বন্ধে ও ভাবে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না। নিজে ত' একটা গুণ্ডা-বদমাইশ তৈরি

হয়েছিস, ইন্দ্রটা যে পড়াশোনা শিখছে তাতেও তোর শরীর জ্বলে—ছিঃ, ও না তোর মায়ের পেটের ভাই।

গুণ্ডা-বদমাইশ বিশেষণটা যুধিষ্ঠিরের পছন্দ হোলো না তাই ও বলল, গুণ্ডা-বদমাইশটা না থাকসে তোর ইজ্জৎ এতোদিনে লোপাট হোয়ে যেত।—বলেই আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুটু আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। প্রায় আধঘণ্টা কিম্বা তারও কিছু পরে ফিরে আসল ইন্দ্র। এসে প্রথম বিভাগে পাশ করার খবরটা জানালো ওকে। পুটু এ সংবাদ শোনার জন্য কতদিন ধরে কী অধীর প্রতীক্ষা করে ছিল তা বোধহয় ও আর ইন্দ্র ব্যতীত আর কেউ জানে না। খবর শুনে ও দিশেহারা, কী করবে ভেবে পেল না প্রথমে। এক মিনিট কিম্বা তারও কিছু বেশি সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল তারপর প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরোল ; এক এক-জনকে ডেকে ইন্দ্রর পাশের খবরটা শোনাল। বস্তিবাসীরা এতোটা ভাবেনি, তারা ভেবেছিল ছেলেটা কিছুটা লেখাপড়া শিখছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে একটা পাশ দিয়ে বসবে এটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না তাদের।

সবাইকে খবরটা শুনিয়ে ও ঝুপড়িতে ফিরে এসে ইন্দ্রকে বলল, ইন্দ্র তোকে আরো অনেক পড়তে হবে, অনেক বড় হোতে হবে।

ইন্দ্র আজ আবার পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, দিদি আমাদের ঘরের ছেলেদের এই ঢের, বেশি পড়া সম্ভব নয়।

কেন নয় শুনি ?—কথাটা শুনে ও রীতিমত উত্তেজিত হোয়ে উঠল।

লেখাপড়া করতে হোলে অনেক টাকার প্রয়োজন। কলেজে ভর্তি হওয়ার খরচ, বই কেনার খরচ—খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের মতো যারা ক্ষুদকুড়ো খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের এই যথেষ্ট।

না যথেষ্ট নয়। ইন্দ্রর কথা শেষ হোতে না হোতেই পুটুর কণ্ঠস্বর যে ভাবে বেজে উঠল তাতে বলা যায় ও কথাটা যেন ছুঁড়ে দিল। এরপর নিজেকে কিছুটা সংযত করে বলল, টাকার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

ইন্দ্রর চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল, বলল, দিদি আমরা দীন-দরিদ্র ঠিকই তবু এক জায়গায় খুব সুখী। টাকার জন্য এমন কিছু করিস না যাতে সেই সুখটুকু ভোগ···

পুটু ওকে কথা শেষ করতে দেয় না, ইন্দ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই ও বলে, ছিঃ তুই ওসব ভাবলি কী করে !—এরপর হঠাৎ ও প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা ইন্দ্র মডেলিং করা খারাপ ?

না। তুই মডেলিং করবি ?

দেখি,—কথাটা বলে পুটু আর ইন্দ্রর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে না। ওর ভয় হয় ইন্দ্র যদি জানতে চায় কী ধরনের মডেলিং তা হোলে ও খুব অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়বে। ঝুমরি হয়ত ঠিকই বলেছে কাজটা খারাপ নয় তবু সে কাজের কথা

ভাইকে জানানো চলে না। ওর মনে কিছুক্ষণ পূর্বেও সংশয়ে ছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না মডেলিং-এর কাজটা করবে কিনা। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝল না করলে ইন্দ্রকে পড়ানো শক্ত হবে সে মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিল কাজটা ও গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্ত নিয়েই ছুটলো ঝুমরির কাছে। ঝুমরি বেরোবে বলে তখন সবে দরজার বাইরে পা রেখেছে। পুটুকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর চোখে প্রশ্ন?

পুটু বলল, বেরোচ্ছিস? তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল। বলতে বলতে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর ঝুমরি মুখ খোলার আগে ও ওর সিদ্ধান্তটা জানালো, আমি রাজি, তুই দ্যাখ মডেলিং-এর কাজটা পাওয়া যায় কিনা।

যাবে, তবে তোর ফিগার যদি পছন্দ হয় আর্টিসের। তোর ত' ফিগার-টিগার ভালই কিন্তু আর্টিসরা অন্য ভাবে বিচার করে। আমার ফিগার কী খারাপ? তোর কী মনে হয়?

কখ্খনো নয়, কে বলেছে খারাপ?

বলেনি কেউই কিন্তু কোনো আর্টিসই আমাকে চায় না। অথচ দ্যাখ পুরুষ-মানুষের কাছে এ শরীরের দাম অনেক। তোদের ত' জানতে বাকি নেই আমি কী কাজ করি—প্রায়ই আমাকে অনেক পয়সাওয়ালা মানুষরা হোটেলে নিয়ে যায়, শরীর যদি ভাল না হোত—নিয়ে যেত?

পুটুর কথাগুলো শুনতে ভাললাগে না। ঝুমরির অনেক কথাই ও জানে। কী ভাবে ও নেমে যাচ্ছে, কবে থেকে ওর পতন শুরু হয়েছে সবই ওর জানা। ওর এই পরিণতির জন্য হয়ত পুরোপুরি ও দায়ী নয় তবু কিছু ভুল ও করেছিল, না করলে এ জায়গায় ওকে আসতে হোত না। দুর্গা পুজোর সময় যাত্রা করবে বলে ঝণ্টু, মিঠু, বুলান এবং আরো কয়েকজন এসে ধরে ছিল পুটুকে। অভিনয় করার জন্য অনেক পেড়াপীড়ি করেছে ওকে কিন্তু ও রাজী হয়নি। কোনোদিনও এ ছেলেগুলিকে ও সহ্য করতে পারেনি। এখন ত' আরো অসহ্য মনে হয়। অসহ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনটে ছেলের স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ। লুঠতরাজ, মারপিট এবং মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ করা এদের দৈনন্দিন কাজ। এ সবের জন্যই পুটু ওদের প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর ওরা লক্ষ্মীর কাছেও গেছিল কিন্তু সেখানেও সুবিধে হয়নি। আরো কয়েকজনের কাছে ওরা প্রস্তাবটা নিয়ে গেছিল কিন্তু সর্বত্রই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অর্থাৎ ওদের প্রয়াস সফল হয়নি। অবশেষে ওরা ঝুমরির কাছে এসেছিল এবং এইখানে ওরা সফল হোলো। ঝুমরি সম্মতি জানালো। সেদিন যে ভুল ঝুমরি করেছিল তার পরিণতি এই অর্থাৎ আজ ওকে এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এখন ও নগরবধূ। যাত্রার রিহার্সেল দিতে গিয়ে ও নিজের সর্বনাশ করে বসে-ছিল। পুটু কুমকুম আর লক্ষ্মী জানতে পেরে ওকে থানায় যাবার পরামর্শ দিয়ে-ছিল। যদিও ওরা জানত গিয়ে কোনো লাভ হবে না তবু একবার চেষ্টা করে

দেখতে বলেছিল। ঝুমরি ওদের পরামর্শ মেনে গিয়েছিল থানায়। একা নয় সঙ্গে পুটু আর কুমকুম ছিল। গিয়ে সুরাহা কিছু হয়নি। ওদের সমস্যা নিয়ে থানার অফিসাররা বিন্দুমাত্র ভাবে না, গুরুত্ব দিতে চায় না। তাদের ধারণা ওদের সমস্ত ধরনের কার্যকলাপই অবৈধ। ওদের কৌমার্য বলে যে কিছু থাকতে পারে তা পুলিশ অফিসাররা বিশ্বাস করতে চায় না সম্ভবত। পুটুর ধারণা ওদের পুলিশ অফিসাররা মানুষ বলেই মনে করে না। যাই হোক থানায় এসে কোনো লাভ হোলো না, ঝুমরি বিচার পেল না। এ খবর শুনে অপরাধীদের সাহস আরো বেড়ে গেল। ওরা বুঝল পুলিশই যখন নীরব তখন ভয় আর কাকে। ঝুমরিকে আবার একদিন ধরে নিয়ে গেল ক্লাব-ঘরে। ও বুঝল নারীত্বই যখন বিসর্জন দিতে হোলো দু দু'বার তখন ঘোমটা টেনে আর লাভ নেই।

এই পুটু কী ভাবছিস র‍্যা? কাল ন'টা-দশটার মধ্যে তোকে নিয়ে যাব রেডি হোয়ে থাকিস। একটু তাড়া আছে কিছু মনে করিস না। কথাটা শেষ করে ঝুমরি এক মুহূর্তও দাঁড়াল না দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করল।

পুটু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর হেঁটে যাওয়াটা দেখল। সেই সঙ্গে ওকে দেখল। ওকে দেখল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। চিত্রশিল্পীরা ওকে কেন বাতিল করল সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে থাকল। ওর ধারণা ঝুমরির দেহের গঠন যে তার থেকেও ভাল তার কিছু প্রমাণ ও পেয়েছে। ছেলেরা ওকে দেখলে চঞ্চল হোয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আসতে থাকে তাদের কাছ থেকে। এই কারণেই পুটু ভাবতে থাকে চিত্রশিল্পী তাকে দেখে পছন্দ করবে কিনা। ওর দুশ্চিন্তা হয় তার নিজের শরীর নিয়ে। তবে শিল্পীরা ঝুমরিকে যখন বাতিল করে দিয়েছে তখন তাকে বাতিল না করার কোনো কারণ নেই। মডেলিং-এর সুযোগটা যদি না জোটে ওর কপালে তা হোলে ইন্দ্রকে কী ভাবে শিক্ষিত করে তুলবে ভেবে পায় না। ঝুমরির দিকে চোখ রেখে ভাবতে থাকে অনেক কিছু নিয়ে। ঝুমরি দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে যাওয়ার পর ও ঝুপড়ির দিকে পা বাড়ায়।

॥ দুই ॥

মন্দিরা প্রতিদিন পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে ট্রেনলাইনের পাশের ঝুপড়ি-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ে। মানুষ কীভাবে এই সব পায়রার খোপের মত ঘরগুলোতে বাস করে এটাই ওর বিস্ময়। সকালে সূর্য কিরণ পুব দিকের জানালা দিয়ে প্রবেশ করে ওর মস্তক চুম্বন করতেই ও উঠে প্রথমেই পশ্চিমের জানালাটা খুলে দেয়। খুলে দিতেই ওর চোখে পড়ে ঝুপড়িগুলো থেকে গনগন করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। প্রায় বেশির ভাগ ঝুপড়িতেই খুব ভোরে আঁচ দে'য়া হয়। ওদের মধ্যে

কারো অফিস-টপিস আছে বলে ত' মনে হয় না—সাত-সকালে কেন যে আঁচ দে'য়া হয় সেটা বোধগম্য হয় না মন্দিরার। এছাড়া ওরা এমন কিছু আহার্য প্রস্তুত করে না যার জন্য ভোর হোতে না হোতেই আঁচ দিতে হয়। ওদের জীবনযাত্রার মধ্যে ও এমন কিছু খুঁজে পায় যা তাদের মধ্যবিত্ত সমাজে একেবারেই অনুপস্থিত। নিয়ম-শৃঙ্খলা ওদের নেই এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই—আছে কিন্তু তা তাদের মতো কঠোর নয়। এক এক সময় ওরকম জীবনের স্বাদ পেতে ইচ্ছে হয় ওর। বিকেলে যখন ওরা দলবদ্ধভাবে ট্রেনলাইনের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করতে বসে তখন ওর মনে হয় ওদের সঙ্গে বসে গল্প করতে পারলে হয়ত অনাবিল আনন্দ ও উপভোগ করতে পারত। হোক না ট্রেনলাইনের উপর বোসে গল্প করা তবু এমন স্বাধীনভাবে সকলে মিলেমিশে গল্প করাকে ও খাটো করে দেখতে পারে না। বরং নিজেদের কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে। রক্ষণশীলতার খোলস থেকে বেরিয়ে ওদের মতো মন-প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ পায় না বলে মধ্যবিত্ত সমাজের উপর বেশ কিছুটা যেন বিরক্তই মন্দিরা।

আগে পশ্চিম দিকের জানালাটা ও খুলে শুত। ওর মা বন্ধ করার কথা না জানালে ও দিবারাত্রই জানালা হয়ত খুলে রাখত। ওর মা বলেছিলেন, বাড়ির সামনে ছোটলোকদের বস্তি—ওদিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখিস মন্দিরা।

কথাটা শুনে বিরক্ত হয়েছিল ও কিন্তু মায়ের নির্দেশ অমান্য করেনি। শুধু মা নয় তাদের সমাজের প্রায় সকলেই ওদের ছোটলোক বলে, কেন বলে তার সদুত্তর ও আজও খুঁজে পায়নি। অর্থনৈতিক অবস্থা ওদের ভাল নয় কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হোলেই যে ছোটলোক হোতে হয় এটা শুধু ওর মা'র কাছ থেকেই নয় তাদের সমাজের অনেক মানুষজনের কাছ থেকে শোনে। এ কথা ঠিক যে দারিদ্রসীমার নিচে যারা বাস করে তাদের মধ্যে অনেকেরই সুকুমার বৃত্তিগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। অন্নসংস্থানের জন্য নিজেদের অনেক নিচে নামাতে হয়। এ সব মন্দিরা জানে তবু ও ওদের ছোটলোক ভাবতে পারে না। যদিও প্রতিদিন রাত্রে অশ্লীল চিৎকার ভেসে আসে ঐ বস্তি থেকে তবু সকলকে ছোটলোক আখ্যা দিয়ে বসতে পারে না ও। ভাল-খারাপ সব সমাজেই আছে, হয়ত খারাপের সংখ্যাধিক্য ওদের মধ্যে বেশি কিন্তু তাই বলে সকলেই খারাপ. সকলেই ছোটলোক, একথা ভাবার যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না ও। এই ত' সেদিন মানদা বৌদির কানের একটা দুল কুড়িয়ে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল, ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারত। ঘরে এত অভাব থাকা সত্ত্বেও যারা এমন সততার পরিচয় রেখে যেতে পারে তারা কী করে ছোটলোক হয় তা ও ভেবে পায় না।

মন্দিরা অন্যান্য দিনের মতো আজও ঘুম থেকে উঠে পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিল। খুলে দিতেই চোখে পড়ল একটা ছেলে ট্রেনলাইনের অপর প্রান্তে একটা গাছের নিচে বই মুখে করে বসে আছে। এ ছেলেটাকে ইতিপূর্বে বস্তিতে আরো বার কয়েক ও দেখেছে। দেখে অনেককেই কিন্তু ওকে ও একটু বিশেষভাবে

দেখেছে এবং এখনো দেখছে। বিশেষভাবে দেখার কারণ একটাই ছেলেটার চেহারা বেশ ভাল। ওর চেহারা যে কোনো চোখকেই টানে। এমনকি ওর মা পর্যন্ত একদিন ছেলেটাকে দেকে বৌদিকে বলেছিলেন, দেখ তপতী ছেলেটা ছোটলোকের ঘরে জন্মালে কী হবে কী রূপ নিয়ে জন্মেছে ;—বোলে প্রসঙ্গকে দীর্ঘায়িত না করে অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছিলেন। ও জানে মা এই বস্তিবাসীদের মধ্যে ভাল কিছু থাকতে পারে তা বিশ্বাস করেন না, তবু ছেলেটার যা চেহারা তাতে তার মতো মানুষ পর্যন্ত কিছু না বলে থাকতে পারেননি। মন্দিরা একদিন ওকে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছিল। ও ছেলেটার হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে বসের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই সঙ্গে ও চোখের কোণ দিয়ে ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। শুধু রূপের আকর্ষণে যে ওকে দেখছিল তা নয় ওকে দেখার আরো একটা কারণ ছিল। ছেলেটার হাতে ভারী ভারী বই দেখে ও কিছুটা কৌতূহলী হোয়ে উঠেছিল। বস্তিবাসীদের প্রায় পাঁচ-ছ বছর দেখছে, বই-খাতার সঙ্গে সম্পর্ক তাদের কতটুকু তা ও ভাল করেই জানে। কিছু কিছু পরিবারের গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর হয়ত ইচ্ছে থাকে তাদের ছেলেমেয়েদের কিছুটা শিক্ষিত করে তোলার এবং এই উদ্দেশ্যে কষ্টার্জিত অর্থ থেকে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে বই-খাতা কিনেও দেয় তাদের। পাঁচ-সাত মাস কিম্বা তারও কিছু বেশি সময় সেইসব ছেলে-মেয়েদের বই-খাতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তারপর সে পাট চুকিয়ে ওরা অন্য কিছুর মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে ফেলে। ওদেরই একজনের হাতে এত বড় বড় ভারী ভারী বই দেখে ও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে ও চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখছিল। দু' মিনিট যেতে না যেতেই একটা বাস এসে থামল স্টপেজে। ছেলেটা উঠে পড়ল। মন্দিরাও উঠে পড়ার উদ্দেশ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেল। বাসের কাছে এসেই ও বুঝতে পারল এ বাসে ওর ওঠার কথা নয়। ছেলেটাকে অনুসরণ করে ও এগিয়ে এসেছিল বাসের কাছাকাছি, এসেই খেয়াল হোতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসের কণ্ডাকটর তাকে ঐ ভাবে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হোলো দিদি যাবেন না ?—ও ঘাড় নাড়ল। কণ্ডাকটরের প্রশ্ন শুনে ছেলেটা ওর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। হয়ত ওর বাস ধরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গিয়েও বাসে না ওঠাটা তাকে বিস্মিত করেছে। ওর তাই মনে হোলো। সত্যি যেভাবে ও এগিয়ে গেছিল তাতে না ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। কণ্ডাকটরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ও কিছুটা লজ্জিত হোলো। ওর উত্তর পেয়ে কণ্ডাকটর ঘণ্টা বাজালো। বাস চলে যাবার পর ওর মনে হোলো তখন বাসটাতে উঠে পড়লেই ভাল হোত, ও ঐভাবে এগিয়ে এসে না ওঠাতে বাসযাত্রীরা যথেষ্ট কৌতূহলী হয়েছে এটা বুঝতে ওর অসুবিধা হোলো না। বিশেষ করে ছেলেটাকে ও বিস্মিত ও কৌতূহলী করেছে বলে একটা অস্বস্তি অনুভব করল। যেভাবে কণ্ডাকটরের প্রশ্নটা শুনে ছেলেটা তার দিকে তাকিয়েছিল তাতে যে শুধু ওর অস্বস্তিই হচ্ছিল তা নয় সেই সঙ্গে একটু রাগও হচ্ছিল। ছেলেটার উপর

এবং নিজের উপরও। ভুল করে উঠতে যাচ্ছিল বাসটায় এটা ছেলেটার ভাবা উচিত ছিল। এ কথা যদি ভেবে থাকত তাহোলে ঐ ভাবে তার দিকে তাকাত না ও। এ জন্য ছেলেটার উপর ওর রাগ হচ্ছিল। নিজের উপর রাগ হচ্ছিল অন্য কারণে, ভুল করে বাসে উঠতে যায়নি ও, ছেলেটাকে নিয়ে এমনই কৌতূহলী হোয়ে উঠেছিল যে কী করতে যাচ্ছে সে কথা ওর মনেই আসেনি। নিজের উপর রাগের কারণ এটাই। বাসটা চলে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল সে সময় বাসটাতে উঠে পড়লে ভালই হোত। টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে নেমে অন্য কোনো বাস ধরে ওর গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারত। এতে সামান্য একটু ধকল সহ্য করতে হোত এবং কিছু বাড়তি পয়সা খরচ হোত ঠিকই তবু ওরকম এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হোত না।

পশ্চিমের জানালাটা খুলে ছেলেটাকে দেখে দাঁড়িয়ে থাকল মন্দিরা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চোখ পড়বে না ছেলেটার, ভেবে নিশ্চিন্ত হোয়ে জানালার পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে থাকল।

প্রাতঃভ্রমণে কিছু মানুষ আসে লেকে। যারা আসে তারা লেকের পাড় থেকে রাস্তা পর্যন্ত ঘাসের গালিচায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে কিম্বা পিচের রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়ায়। ট্রেনলাইনের সামান্য ব্যবধানের পর ঢাল, ঢালের পরেই সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমি লেকের পিচের রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। সচরাচর প্রত্যুষে কেউ বিশেষ এদিকটায় আসে না। বিকেলে অনেককে দেখা যায়। এই সমতল ভূমিতে যে সব গাছ আছে তারই এক একটার নিচে যুবক-যুবতীরা এসে বসে হৃদয় বিনিময় করার উদ্দেশ্যে। সকালে যেহেতু কেউ বিশেষ আসে না সেহেতু নীরবতা এ সময়ে অন্যান্য সময়ের থেকে যেন অনেক বেশি কঠিন ভাবে জমাট বেঁধে থাকে। যদিও-বা অন্যান্য দিন দু' একজনকে এই জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আজ ছেলেটাকে ছাড়া মন্দিরা আর কাউকেই দেখতে পেল না। একটা গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে ও যেভাবে বই মুখে করে বসে আছে তাতে ও বুঝে উঠতে পারছে না কী পড়ছে। পাঠ্যপুস্তক পড়ছে কিনা সেটা এতদূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। প্রথমে ওর মনে হোলো ছেলেটার হাতে যে বইটা আছে সেটা পড়ার বই নয়। এরকম মনে হওয়ার কারণ—পড়ার বই হোলে ঘর ছেড়ে মাঠ-ঘাটের নির্জনতা বেছে নিতে হোত না ওকে। যখনই এটা মনে হোলো তখন আরো একটা সন্দেহ হোলো ওর মনে, হয়ত ছেলেটা কোনো গল্প-উপন্যাস পড়ছে কিম্বা পর্ণগ্রাফির বইয়ের পাতায় চোখ ডুবিয়ে আছে। এটা মনে হওয়ার একটা কারণ আছে। ও কিছুদিন পূর্বে ওদের কয়েকজনকে দেখেছে ঐ ধরনের বইয়ের উপর ঝুঁকে বসে থাকতে। ওদের অনেক কিছুই ওর চোখে পড়ে। এমনকি বেশ কিছু ঝুপড়ির ভেতরেও ওর চোখ পেঁছে যায়। যাবে নাই বা কেন! মাত্র ত' কুড়ি ফুটের একটা রাস্তার ব্যবধান। তিনতলার উপর থেকে, জানালার পর্দার আড়াল থেকে খুব স্বচ্ছন্দে বস্তির উপর দৃষ্টি বিস্তার করে রাখা যায়। যে ভাবে ও দেখে তাতে তাকে ওদের দেখে ফেলার

সম্ভাবনা নেই। সুরক্ষিত জায়গায় আত্মগোপন করে ওদের দেখাটা ওর নেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল, যেন ওদের না দেখলে ওর পেটের ভাত হজম হবে না। লেক গার্ডেন্সের এদিকে যারা থাকে অর্থাৎ যারা ট্রেনলাইনের কাছাকাছি থাকে তারা প্রায় সকলেই ভীষণ বিরক্ত। বিরক্তির কারণ দগদগে ঘায়ের মত এ বস্তিগুলো তাদের গায়ের উপর। শহরের হৃদপিণ্ডের ওপর এরকম বস্তি বহাল তবিয়তে থাকে কী করে তা তারা বুঝে উঠতে পারে না। ভেবে পায় না এদের উচ্ছেদ করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস চালানো হোচ্ছে না কেন। মন্দিরা এভাবে ওদের দেখে না। দারিদ্রসীমার নিচে যে মানুষগুলো এখানে ভাঙাচোরা জিনিস সংগ্রহ করে কোনোরকম মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে তাদের উপর অন্যান্যদের মত নির্মম হোতে পারে না ও। বরং ও ওদের বুঝতে চায়। কিছু কিছু আচার-আচরণ ওদের মন্দিরাকে কৌতূহলী করে। ভালও লাগে। আবার কিছু কিছু কার্যকলাপ ওর বিরক্তি উৎপাদনও করে। যেমন সেদিন ও যখন দেখেছিল বেশ কিছু ছেলে দুটো ঝুপড়ির মাঝখানে একটুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা অশ্লীল বইয়ের উপর ঝুঁকে বসে আছে তখন ও বিরক্ত না হোয়ে পারেনি। ওদের মধ্যে কিছু কিছু ছেলের আচরণ যে রকম অসংযত সে রকম কিছু কিছু মেয়েদের আচরণও অসংযত। ছেলে-মেয়েদের এই অসংযত আচরণের জন্যই প্রথমে ওর সন্দেহ হয়েছিল ছেলেটার উপর, ভেবেছিল সেও হয়ত কোনো পর্ণগ্রাফির বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু সে সন্দেহ তার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরে মনে হোলো ও পাঠ্যপুস্তক নিয়েই বসেছে। এ কথা তার অকারণে মনে হয়নি, মনে হয়েছে ওকে খাতা বার করতে দেখে। ছেলেটা আড়াআড়ি ভাবে বসে আছে বলে মন্দিরা বুঝতে পারেনি এতক্ষণ হাতের বইটা বাদে ওর শরীরের আড়ালে আরো বইখাতা আছে। মন্দিরা হয়ত আরো কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ওর উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকত কিন্তু তা হোলো না ওর বৌদির জন্য।

তপতদেবী ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওর কাছে এসে বললেন, এই যে মন্দিরা মুখ-টুক ধোয়া হয়েছে? নাকি ঘুম থেকে উঠেই রূপকুমারকে দেখছ?

মন্দিরা বুঝল ধূমায়িত চায়ের কাপটা তারই উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সুতরাং ও বৌদির হাত থেকে প্রথমে চায়ের কাপটা নিল তারপর প্রশ্নের উত্তর দিল, কে বলল তোমাকে যে তুমি যার কথা বললে তাকে দেখছিলাম!

তপতীদেবী ঠোঁটের প্রান্ত চেপে হাসলেন, বললেন আমি বলছি তুমি দেখছিলে, ওকে দেখে কী হবে ভাই ও আমাদের সমাজের ছেলে নয় সুতরাং···

তুমি থামবে? দেখ বৌদি এখনো কি রকম কুয়াশা—বেশ লাগে না? মন্দিরা তপতীদেবীকে প্রসঙ্গটা থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অন্য কথা বলল।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। আজ বলে নয় আরো কয়েকদিন আমার চোখে পড়েছে তুমি ওকে দেখ—অস্বীকার কোর না মন্দিরা আমার একটা কথা রাখবে?

বল।

কোনোরকম ভুল করে বোস না। ছেলেটা খুবই ভাল দেখতে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং ও ক্রমশই শিক্ষিত হোয়ে উঠছে। মানদার কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পেরেছি আমি। যাই হোক ওকে তোমার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজন মেনে নিতে পারবে না কখনই এটা ভুলে যেও না।—এ পর্যন্ত বলেই ঘর ছাড়ার উদ্দেশ্যে তপতীদেবী পা বাড়ালেন। পা বাড়ালেও ঘর থেকে বেরোনো সম্ভব হোলো না মন্দিরার কথা শুনে।

দাঁড়াও বৌদি যাবার আগে আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

তপতীদেবী দরজার কাছে চলে এসেছিলেন, মন্দিরার কথা শুনে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে বললেন, কী বলবে বল?

তুমি যা ভেবে কথাগুলো বললে তা আমি এখনো পর্যন্ত ভাবিনি তবু তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।—কথাটা শেষ করেই চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালো মন্দিরা।

দেরি কেন করে ফেল।

ধর যদি সত্যি ওকে আমি জীবনসঙ্গী করতে চাই তাহোলে আমার মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজন যে আমার মুখ দর্শন করবে না তা বিলক্ষণ জানা আছে, তাদের কথা থাক এবার তোমার কথাটা বল, তুমিও কী তাই করবে?

ঠিক কী করব তা এখনই বলা সম্ভব নয়, ভেবে দেখতে হবে। একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি যদি তুমি প্রেম-টেম করে বিয়ে কর তাহোলে আমার সমর্থন পাবে না সে কথা আমি বলব না, শুধু তাই নয় প্রয়োজন হোলে তোমার বাবা-মাকেও কনভিন্স করাবার চেষ্টা করব কিন্তু যে ছেলেকে তুমি বেছে নেবে সে ছেলে যদি ঐ ছেলে হয় তাহোলে তোমার হোয়ে কিছু বলার সুযোগ থাকবে না।

এরপর কী বলবে মন্দিরা ভাবতে থাকল। তপতীদেবী চলে যাচ্ছেন দেখে ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি ওর যথেষ্ট থাকে এবং ভাল চাকরি-টাকরি করে তাহোলে তোমার আপত্তি জানানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না। ও তখন ত' মধ্যবিত্ত সমাজের একজন হোয়ে যেতে পারবে বৌদি।

অসম্ভব।

কেন! অসম্ভব কেন?

মধ্যবিত্ত সমাজে উঠে আসা অত সহজ নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতাই থাক আর আর্থিক সচ্ছলতাই আসুক, ঐ সমাজের একজনও আমাদের একজন হোয়ে উঠতে পারবে না। তুমি জানো না মন্দিরা মধ্যবিত্ত সমাজটা কী অসম্ভব রকম কনজারভেটিভ—পান থেকে চুন খসার উপায় নেই।

জানি। এই অনুদার নীতি আমি সমর্থন করতে পারি না।

তপতীদেবী স্থিরদৃষ্টিতে ওকে দেখলেন কিছুক্ষণ তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তোমার কথা শুনে আমার ভয় হোচ্ছে, কী ইচ্ছে তোমার বলত?

মন্দিরা হেসে ফেলল, বলল, তুমিও যেমন এরই মধ্যে আমাকে সন্দেহ করতে

শুরু করেছ! বিশ্বাস কর বৌদি আমি ভয় পাওয়ার মত কিছু করিনি বা করব এ রকম সিদ্ধান্তও নেইনি। নিয়ম-কানুনগুলো ভাল নয় বলেই বললাম।

তপতীদেবী ওর কথার পর বললেন, যাক্ শুনে নিশ্চিন্ত হোলাম। যা ভয় পাইয়েছিলে আমায়—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ওর হাত থেকে খালি কাপটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তপতীদেবী চলে যেতেই মন্দিরা আবার পর্দা সরিয়ে চোখ নিয়ে এলো পূর্বের জায়গায়। ছেলেটা তখনো একইভাবে বই মুখে করে বসে আছে। বৌদি ওকে রূপকুমার বলে সম্বোধন করেছে এর অর্থ ওর নাম রূপকুমার হোতে পারে, নাও হোতে পারে, যদি ওর রূপের কথা ভেবে বলে থাকে কথাটা তাহোলে ওটা ওর নাম নয়। তার মনে হোলো রূপকুমার নামটা যদি ওর হয় তাহোলে নামটা যথার্থই হয়েছে। একবার মনে হোলো মানদাকে ডেকে কথায় কথায় ওর প্রসঙ্গ তুলবে। ওর নামটাও জেনে নে'য়া যেতে পারে তার কাছ থেকে, পরে মনে হোলো এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। মানদার মনে যদি ওর এই কৌতূহল নিয়ে কোনোরকম প্রশ্নের উদয় হয় তাহোলে ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পেঁছিতে পারে ভেবে ওরকম কিছু করে বসার সিদ্ধান্তটা বাতিল করল। বলা যায় না বিকেলে যখন ওরা ট্রেনলাইনে হাত-পা ছড়িয়ে নিজেদের কথা এবং বাবুদের কথা নিয়ে মশগুল হোয়ে থাকবে তখন এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে তার কৌতূহলের কথাটা হয়ত দশজনের সামনে বলে বসবে। কথাটা ভেবেই ও কেঁপে উঠল। যত যাই হোক এই রূপকুমারকে নিয়ে ও যে এতো ভাবছে তা ওর নিজের কাছেই মনে হোলো বাড়াবাড়ি। ও পর্দাটা টেনে দিয়ে সরে আসল জানালার কাছ থেকে।

বিকেলে মন্দিরা বেরিয়েছিল সন্ধ্যাদের বাড়ি যাবে বলে। লেক রোডের উপর প্রায় মুদিয়ালির কাছাকাছি সন্ধ্যাদের বাড়ি। অনেকটা পথ। ও প্রথমে ভেবেছিল বাসে যাবে পরে মত পরিবর্তন করে হাঁটতে শুরু করল। হেঁটে ওদের বাড়ি যেতে হোলে ট্রেনলাইন পেরিয়ে লেকের মাঠ আর রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়া ছাড়া সংক্ষিপ্ত পথ আর নেই। বাসে ওদের বাড়ি যেতে হোলে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয় বাস ধরার জন্য। লেক গার্ডেন্স থেকে হেঁটে প্রিন্স আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত না আসলে বাস ধরা যায় না সুতরাং পাঁচ-ছ' মিনিট যখন হাঁটতেই হবে তখন আর মাত্র দশ মিনিট বেশি হাঁটার ভয়ে বাসে চড়ার কোনো অর্থই খুঁজে পেল না ও। তাছাড়া হেঁটে যাওয়ার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। ঝুপড়ির মানুষগুলোকে আরো একটু কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে ওকে পেয়ে বসল। যদিও ও পশ্চিমের জানালার মধ্য দিয়ে কিম্বা ছাদের উপর থেকে অনেক কিছুই দেখতে পায় তবু ওর মনে হোলো আরো একটু কাছ থেকে না দেখলে ওদের জানা যাবে না। ইতিপূর্বে লেকের উপর দিয়ে দু'বার সন্ধ্যাদের বাড়ি ও গেছে কিন্তু তখন ওর ওদের জানায় আগ্রহ ছিল না। আসলে আগে ওদের নিয়ে ভাবেইনি। ইদানীং বড় বেশি ভাবছে ওদের নিয়ে এর কারণ রূপকুমার কিনা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও।

যখনই কথাটা মনে হোলো ওর তখনই কিছুটা নিজের উপর যেন বিরক্ত হোলো। ওদের ও অন্যানাদের মত ছোটলোক ভাবে না ঠিকই তবু তাদের একজনকে নিয়ে এত বেশি ভাববার কোনো অর্থই হয় না। বৌদি ঠিকই বলেছে সুন্দর চেহারাই থাক আর শিক্ষাগত যোগ্যতাই থাক ওরা কখনই তাদের একজন হোয়ে উঠতে পারবে না। তাদেরই একজনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই এ কথা ও ভাল ভাবেই জানে, তা সত্ত্বেও রূপকুমার ওর মগজে আশ্রয় নিয়ে আছে। এই যে আজ ও লেকের রাস্তা ধরে লেক রোডে আসবে বলে পা বাড়িয়েছে এর মূল কারণ রূপকুমার। মন্দিরা নিজের উপর যতই বিরক্ত হোক ঝুপড়িগুলোর উপর দৃষ্টি স্থাপন না করে এগোতে পারছিল না। এইভাবে দৃষ্টি বিস্তার করে হাঁটার কারণ ওর চোখ রূপকুমারকে খুঁজছিল। চোখ যার উদ্দেশ্যে ঝুপড়িগুলোর অভ্যন্তরে বিচরণ করছিল তাকে ও দেখতে পেল না।

সন্ধ্যাদের বাড়ি পেঁাছে সন্ধ্যার দেখা পেল না। ওর মা জানালো মন্দিরাকে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে ও। ছ'টা-সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসবে। ওর যদিও মন্দিরার জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ এক প্রয়োজনে ওকে বেরোতে হয়েছে। কথাটা শোনার পর মন্দিরা ঘড়ি দেখল—পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। ঘড়ির উপর চোখ রেখেই সন্ধ্যার মাকে বলল, মাসিমা অন্য আরেক দিন না হয় আসব আজ…

সন্ধ্যার মা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, ও কিন্তু তোমাকে আটকে রাখার কথা আমাকে বিশেষভাবে বলে গেছে—আর ত' বেশিক্ষণ নেই—এসে যাবে তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাও। বোস তোমার জন্য চা করে আনি। বলে ঘর ছাড়লেন উনি।

অগত্যা মন্দিরাকে বসতেই হোলো। বোসে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিল, যদিও একই খবরের কাগজ তাদের বাড়িতে রাখা হয় এবং সেই খবরের কাগজের আদ্যপ্রান্ত ওর পড়া হয়ে গেছে তবু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজটাই চোখের সামনে মেলে ধরল। পাঁচ-দশ লাইনের উপর চোখ বোলানো হয়েছে কী হয়নি চঞ্চল এসে ঢুকল যে ঘরে ও বসেছিল সে ঘরে। ঢুকেই ওর মুখোমুখি চেয়ারটাতে বসল। মন্দিরা ওকে দেখেছিল ঘরে ঢোকার সময়। দেখেও খবরের কাগজের উপর থেকে চোখ সরায়নি। চঞ্চল সন্ধ্যার দাদা, ইতিপূর্বে ওর সাথে পরিচয় হয়েছে। না সন্ধ্যার দৌলতে নয় চঞ্চল নিজেই আলাপ জমিয়েছে তার সাথে। এরপর বেশ কয়েকদিন কথা বিনিময় হয়েছে তাদের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যেই মন্দিরা বুঝে নিয়েছিল চঞ্চল তার সাথে ঘনিষ্ঠ হোতে চায়। ও চাইলেও মন্দিরা ওকে পছন্দ করে না। বরং বলা যায় ও কিছুটা বিরক্ত ছেলেটার উপর। ওর গায়ে-পড়া ব্যাপারটা ও মোটেও সহ্য করতে পারে না। এক একদিন ভেবেছে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবে কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত না করে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। এমনকি সন্ধ্যার কানে কথাটা তুলবে ভেবেছিল কয়েকবার

কিন্তু তুলতে গিয়েও তোলেনি, ভেবেছে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক যখন অসহ্য হোয়ে উঠবে তখন হয় নিজে দু' কথা শুনিয়ে দেবে না হয় সন্ধ্যাকে জানাবে।

মিস মিত্র আপনি কী সিনেমা খুব কম দেখেন?—চঞ্চল প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকে।

মন্দিরা প্রশ্ন শুনেও খবরের কাগজটার উপর থেকে চোখ সরায় না। চঞ্চল এ ঘরে আসার পর থেকে ও কিছুই পড়ছিল না তবু ইচ্ছে করেই চোখকে খবরের কাগজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বসেছিল। আসলে ছেলেটা যাতে ওকে খুব বেশি বিরক্ত না করতে পারে তার জন্য এ ভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইল ও। চঞ্চল ঘরে ঢোকার পর থেকে এবং ওর প্রশ্ন শোনার পরও যে ভাবে খবরের কাগজ দিয়ে নিজের মুখকে আড়াল করে বসে থাকল মন্দিরা তাতে অন্য কোনো ছেলে হোলে অপমানিত না হয়ে পারত না কিন্তু ওর এই ব্যবহারে ও বিন্দুমাত্র অপমানিত বোধ করছে বলে মনে হোলো না। ছেলেটা যে নাছোড়বান্দা এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকল না ওর। প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হোলো। অবশ্য চঞ্চলকে দেখলেই ও যথেষ্ট বিরক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ে আজকাল, এখন শুধু তা আরো ঘন হোলো। একবার ভাবল প্রশ্নের উত্তর দেবে না কিন্তু পরে মনে হোলো এখনই এতটা নির্মম হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথা ভেবে নীরব না থেকে বলল, হ্যাঁ।

ফিল্ম-ফ্যাস্টিভ্যাল দেখেছেন কখনো?

না। এবারও মন্দিরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

দেখবেন?

না।

আমার কাছে একটা একস্ট্রা টিকিট আছে বলেই বলছিলাম। আগামীকালের টিকিট—নন্দনে। চলুন-না মিস মিত্র।

সন্ধ্যাকে নিয়ে যেতে অসুবিধাটা কোথায়? ওকে যাবার জন্য বলে দেখেছেন?

বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সিনেমা দেখার আনন্দ অন্য রকম।

আমি আপনার বন্ধু নই।

হোতে পারেন।

না, পারি না।

মন্দিরার কথায় যথেষ্ট ঝাঁঝ ছিল, তা সত্ত্বেও চঞ্চল ঠোঁটদ্বয়কে যুক্ত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী যে নয় তা প্রমাণ করার জন্য কিছু একটা বলতে গেল আর ঠিক তখনই সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর ভেসে আসল অন্য ঘর থেকে। ও ওর মা'র কাছে জানতে চাইছে মন্দিরা এসেছে কিনা। উত্তর পাওয়ার পর ওখান থেকেই মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, জাস্ট এ মিনিট মন্দিরা—আই অ্যাম কামিং।

সন্ধ্যার কথা শুনে চঞ্চল দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার কণ্ঠস্বর থামতেই ও বলল, একটা

অনুরোধ করছি আশা করি রাখবেন, বন্ধুকে এসব কথা জানাবেন না। কথাটা বলেই খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্দিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে খুব ঝাপসা ভাবে বলল, থ্যাংক গড। বোলে হাতের পেপারটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে দরজার দিকে দৃষ্টি বিস্তার করে বান্ধবীর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। সন্ধ্যা আসার পর বলল, আর কিছুক্ষণ দেরি করলে আমার সঙ্গে তোর দেখা হোত কিনা সন্দেহ।

কেন? একলা ছিলি বলে খুব বোর ফিল করছিলি বোধ হয়? সন্ধ্যা মন্দিরার কথার পৃষ্ঠে কথা বলতে বলতে একটা চেয়ারকে ওর মুখোমুখী এনে বসল।

করব না! একা এভাবে বসে থাকা যায়? মাসিমার মুখ থেকে শুনলাম বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়েছিস, জানতে পারি-কী বিশেষ প্রয়োজনটা কী?

সন্ধ্যা উত্তর না দিয়ে হাসল প্রথমে, তারপর বলল, বলব তবে তার আগে তোর মুখে কিছু দে'য়ার ব্যবস্থা করি।

ও নিয়ে ব্যস্ত হোতে হবে না তোকে, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করার প্রয়োজন নেই। তোর কথা শুনে মনে হোচ্ছে বিশেষ প্রয়োজনটা সত্যিই বিশেষ—তাই ত'?

সন্ধ্যার দু'ঠোঁটের মাঝে একটা চাপা হাসি ভেসে উঠল, চোখের তারায়ও হাসির ঝিলিক। প্রথমে নীরব থেকে মাথাটা সামান্য দোলালো অর্থাৎ মন্দিরার অনুমান যে নির্ভুল এটা বোঝাল ওকে। এরপর বলল, সত্যি বিশেষ প্রয়োজনেই বেরিয়েছিলাম, সে কথা বলার আগে বলে নি আজ আসতে বলেছিলাম অকারণে নয়, তোকে খাওয়াব বলেই আসতে বলেছিলাম।

হঠাৎ খাওয়াবার ইচ্ছে হোলো কেন জানতে পারি কী?

সন্ধ্যা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিল সে সময় ওর মা প্লেট সাজিয়ে মিষ্টি নিয়ে ঢুকলেন, ঢুকে খাবারের প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি খেতে থাক আমি তোমাদের জন্য চা নিয়ে আসছি। বলেই বেরিয়ে গেলেন।

মন্দিরা প্লেটের উপর চোখ বুলিয়ে বলল, এত! ব্যাপার কীরে সন্ধ্যা? মুখ খোলার আগে একটা কাজ কর আরো একটা প্লেট নিয়ে আয়, দু' একটার বেশি আমি খেতে পারব না।

মুটিয়ে যাবার ভয়ে? ও কটা খেলে মুটিয়ে যাবি না।

রসিকতা রাখ, বিশ্বাস কর পেটে ওগুলো চালান করা সত্যিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক আছে যা পারিস খা বাকিটা আরতিকে দিয়ে দেব।

আরতি কে?

আমাদের বাড়িতে কাজ করে, তোদের ওদিক থেকেই আসে। ট্রেনলাইনের ধারে যে বস্তিগুলো আছে সেখানে থাকে।

আমার এঁঠোটা ওকে খাওয়াবি! মন্দিরার কথাটা ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা বিস্মিত হয় ওর কথা শুনে, বলে, তাতে কী হয়েছে ? ওরা পেটভরে দু'বেলা খেতেই পায় না ওদের আবার এঁঠো আর অ-এঁঠো ।

কথাটা মন্দিরার ভাল না লাগলেও তা নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, এবার বল !

কী প্রয়োজনে বেরিয়েছিলাম সে কথা ?

সে কথা ত' শুনবই তার পূর্বে প্লেট ভর্তি মিষ্টি দিয়ে মিষ্টি মুখ করাবার আয়োজন কেন সেটা শুনব ।

একটা পাজী মেয়ে আজকের তারিখে সকলকে জ্বালাবে বলে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ।

তোর আজ জন্মদিন ! জানাসনি কেন আগে ?

জানালে কী করতিস ? এ-দোকানে সে-দোকানে ছুটে বেড়াতিস ত' ? সেজন্যই ত' আগে জানাইনি ।

ঠিক আছে বিশেষ প্রয়োজনটা এবার শুনি ।

আমাকে কী তোর অন্য রকম মনে হোচ্ছে না ?

অন্য রকম ! কৈ না ।

সেকি-রে এই যে সবাই বলে···।—কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে সন্ধ্যা ঠোঁট টিপে হাসতে থাকল ।

খুলে বল তোর কথার একবর্ণও আমি বুঝে উঠতে পারছি না ।

শালা তুমি একটা জেনুইন হাঁদারাম, দেখে বুঝতে পারছিস না আমি প্রেমে পড়েছি ।—এরপরই সন্ধ্যা সবিস্তারে জানালো কার সঙ্গে কীভাবে ও প্রেমে পড়েছে ।

মন্দিরা শুনে বলল, একদিন আলাপ করাস ।—এ কথার পরই ও অন্য প্রসঙ্গে আসল, কলেজের কথা দিয়ে শুরু করেছিল কিন্তু সে প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল মন্দিরা । একের পর এক প্রসঙ্গের অবতারণা করে যাচ্ছিল ও । আসলে ওর উদ্দেশ্য রূপকুমারের কথাটা সন্ধ্যাকে জানানো । রূপকুমারের কথাটা পাড়বে পাড়বে করেও পাড়তে পারছিল না, বুঝে উঠতে পারছিল না সন্ধ্যা ওর কথার অন্য অর্থ দাঁড় করাবে কিনা । মন্দিরার মনে হয় রূপকুমার ওর একটা আবিষ্কার, সেই আবিষ্কারের কথা দু'একজনকে না বলে থাকা যায় না । আস্তাকুঁড়ের ভেতর রূপকুমার একটা ভীষণ ব্যাতিক্রম । ইতিপূর্বে কেউ কখনো ওরকম একজনকে ঐ পরিবেশে প্রত্যক্ষ করেনি বলেই ওর মনে হয় । এরই জন্য ও ভাবে রূপকুমার ওর আবিষ্কার । যদিও অনেকেই ওকে দেখেছে কিন্তু সে দেখা কখনই আবিষ্কার হোতে পারে না বলে মন্দিরার মনে হয় । ওর যা রূপ তাতে অনেকের চোখই তার উপর এসে পড়ে কিন্তু তাই বলে সে দেখাকে আবিষ্কারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না । আবিষ্কার হোচ্ছে সম্পূর্ণভাবে জানা । মন্দিরা যদিও ওর সান্নিধ্যে আসেনি তবু তার মনের চোখ দিয়ে ওকে সে দেখতে পায় । ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এক এক সময় ও

যেন ওর অনেক কাছে চলে আসতে পারে, অনেক কিছুই যেন জানতে পারে ওর। মনের দর্পণে রূপকুমারের যে প্রতিবিম্ব ও দেখতে পায় তাতে তাকে ও অন্যান্যদের সঙ্গে এক আসনে বসাতে পারে না। ওদের সমাজের যে সব ছেলে পর্ণগ্রাফির বই দেখে তাদের একজন ও নয় এবং ওর মনে হয় ও হয়ত খুবই মেধাবী ছাত্র, যদি তা নাও হোয়ে থাকে তাহোলেও খুব যে পরিশ্রম করে ভাল কিছু করার জন্য তার প্রমাণ ও পেয়েছে। এছাড়া ওর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছুই মনে হয় তার। এসব কারণের জন্যই ওর ধারণা এটা রীতিমত একটা আবিষ্কার। আবিষ্কার করার আনন্দ অপরিসীম, সেজন্যই রূপকুমারকে জানতে চায়, দেখতে চায় গভীর দৃষ্টি নিয়ে। এ জানা কিম্বা দেখার মধ্যে অন্য কিছু নেই। এ জন্যই ও ভাবছে রূপকুমারের কথাটা জানাবে সন্ধ্যাকে। একের পর এক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে করতে রূপকুমারের প্রসঙ্গে আসল, বলল, আমাদের বাড়ির কাছে ট্রেনলাইনের ধারে যে ঝুপড়িগুলো আছে দেখেছিস! জিজ্ঞেসই বা করছি কেন তুই ত' আমাদের বাড়ি গেছিসই সুতরাং না দেখার কোনো কারণ নেই। ঐ বস্তিতে একটা ছেলে আছে দারুণ দেখতে না দেখলে তুই বিশ্বাস করতে পারবি না কী অসম্ভব রকম হ্যান্ডসাম ছেলেটা।

রিয়েলি! অনেক সময়ই চোখে পড়ে বস্তির ছেলে-মেয়েদের দু'চারজন বেশ রূপ নিয়ে জন্মায়, জন্মালে কী হবে শিক্ষার আলো পায় না বলে ওদের মাকাল ফল ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দে'য়া যায় না। ওদের ঘরের ছেলে যখন তখন অশিক্ষিত হোতে বাধ্য, পরিবেশই ওদের বাধ্য করে।

নো, নট দ্যাট।

ছেলেটা একেবারে অশিক্ষিত নয় বলছিস, একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছে?

এখনো লেখাপড়া করছে। আই বেট হি ইস নট এ স্কুল-স্টুডেন্ট। কলেজে পড়ে বলেই মনে হয়, কী পড়ে বলতে পারব না।

ইস ইট! দ্যান ইট ইস অ্যা ডাম ফাউন্ডিং নিউজ। তুই কী ওর সম্বন্ধে কিছু ভাবছিস?

কী ভাবব?

আই মিন তুই কী ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা···

আর ইউ ক্রেজি?

হোয়াই?

দূর ঐ প্রশ্ন ওঠেই না কারণ আমি পড়ার পাঠ না চুকিয়ে অন্য দিকে মন দে'য়ার কথা ভাবতেই পারি না, তাছাড়া যদিও বা কখনো সেরকম অঘটন ঘটে যায় তাহোলে এটা অন্তত বিশ্বাস করতে পারিস যে সে ছেলে কখনই ঐ রূপকুমার হোতে পারে না। ইট ইস নট ক্রেডিবল্‌ দ্যাট এ ওয়াইট অফ দ্যাট রেগ-টেগ সোসাইটি উইল বি দ্যা স্পাউস অফ মন্দিরা মিত্র, আন্ডারস্ট্যান্ড বেবি?

ওর নাম বুঝি রূপকুমার?

কী জানি বৌদির কাছ থেকে ঐ নামটা জেনেছি, ওর রূপের জন্য রূপকুমার বলেছিল কিনা তা বলতে পারব না।

সন্ধ্যা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কিছু ভাবল তারপর হঠাৎ মন্দিরার মুখের উপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলল, আচ্ছা আরতি ত' ওদিকেই থাকে ও হয়ত ছেলেটাকে চিনতে পারে, ওর কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করা যেতে পাবে—ডাকব ?

রাবিশ, ওর কাছ থেকে জানার পরিণাম জানিস ?

মন্দিরা ইউ হ্যাভ মেইড মি কিউরিয়াস, ইন ফ্যাক্ট আই অ্যাম বিয়িং ইমপেসেন্ট টু সি হিম। কালই যাব তোদের বাড়ি, কিরে যাব ত' ?

আসিস জিজ্ঞেস করার কী আছে।

আমি শুভর সঙ্গে এনগেইজ হোয়ে না গেলে শিযোরলি ওর সঙ্গে একটু ঘুরে-টুরে দেখতাম। আই লাইক অ্যা লিটল্‌-বিট স্ক্যান্ডাল।

ইস ইট ! ও যদি তোদের আরতির ভাই হয় তাহোলেও কী···

ও—নো।

লিভ দিস, তোকে একটা কথা বলব সন্ধ্যা ?

তোর কথা শুনে মনে হোচ্ছে ভয়ংকর কিছু বলবি ! বল না কী বলবি।

চঞ্চলের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে ভাবল মন্দিবা। একটু আগেও ভাবেনি এখনই জানাতে হবে, ভেবেছিল আরো কিছুদিন না দেখে কিছু করবে না। ও আরো কিছুদিন সহ্য করত কিন্তু আজকের ওর ব্যবহার তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, এরজন্যই ও ঠিক করল সন্ধ্যাকে সমস্ত কিছু খুলে বলবে। ইতিপূর্বে চঞ্চল আরো একদিন ওকে সিনেমায় যাবার অনুবোধ জানিয়েছিল কিন্তু সেদিনের সেই অনুরোধের জন্য ও বিরক্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এতটা অসহ্য মনে হয়নি। সেদিন মন্দিবার সঙ্গে চঞ্চলের দেখা হয়েছিল পথে। ও সিনেমায় যাচ্ছিল, মন্দিরাকে সে কথা জানিয়ে তার সঙ্গী হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। যেহেতু ও সিনেমায় যাচ্ছিল এবং নিছক ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য এ ধরনের অনুরোধ করাটা খুব বেশি গর্হিত কাজ বোলে না ভাবাও চলতে পারে সেহেতু মন্দিরা ভদ্রভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছিল। যদিও ও জানত চঞ্চল ভদ্রতা রক্ষার জন্য সে অনুরোধ জানায়নি, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোতে চায় তবু সেদিনের সে অনুরোধের জন্য বিরক্ত হোলেও অপমানিত বোধ করেনি। সেদিনের পর ওর সঙ্গে চঞ্চলের সন্ধ্যাদের বাড়িতে আরো বার কয়েক দেখা হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই ও একটু একটু করে সাহসী হোয়ে উঠছিল। ইদানীং ও রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আজকের ওর ব্যবহারে মন্দিরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। ও যা বলেছে তাতে তখন থেকেই চিত্তের অস্থিরতা ক্রমঃশই বাড়ছিল. সে সময় থেকেই সে ভাবছিল আর নীরব থাকা চলে কিনা। অবশেষে ও ঠিক করে ফেলল কথাটা সন্ধ্যাকে জানাবে, সিদ্ধান্ত নে'য়ার পরই ও কথাটা পাড়ার চেষ্টা করল।

কী হোলো বল !—সন্ধ্যার বক্তব্যের পরও মন্দিরা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখে ও অধৈর্য্য হোয়ে উঠল।

মন্দিরা চঞ্চলের সমস্ত কথা সবিস্তারে জানালো। শুনে নীরব হোয়ে থাকল সন্ধ্যা। মন্দিরা লক্ষ্য করল ভারাক্রান্ত আকাশের মত ওর মুখ থম থম করছে। আস্তে আস্তে মন্দিরাই আবার বলল, এ ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি হৈ চৈ করিস না। মাসিমার কানে যেন কথাটা না যায় দেখিস।

সন্ধ্যার মুখ আরো কঠিন হয়ে উঠল, কন্ঠস্বর বিকৃত করে বলল, না করবে না—যতই দিন যাচ্ছে ততই অসহ্য হোয়ে উঠছে। শুধু তোর সঙ্গেই এরকম ব্যবহার করছে না ও এখন যা হোয়ে উঠেছে তাতে আমার লজ্জায় মুখ লুকোতে ইচ্ছে করছে। দাঁড়া মাকে আজ আমি সব বলব।

এটা তোর বাড়াবাড়ি।

বাড়াবাড়ি! নিজের দাদা বলতেও লজ্জা করে—যা করে বেড়াচ্ছে, তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না একমাত্র তোকেই বলা যায়—দাঁড়া। এ পর্যন্ত বলে সন্ধ্যা উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে বলল, দিন দুয়েক আগে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি আমাদের স্টাডি-রুমের দরজাটা খুলে গেল। আরতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে। আমি কয়েক পা এগোতেই দাদাকে দেখতে পেলাম জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতে। আরতি যেভাবে ছুটে বেরোলো এবং ওর চেহারার যে অবস্থা ছিল তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম অবৈধ কিছু ঘটেছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ভাবিনি কারণ তখন তা শুধুমাত্র অনুমান ছিল। আমার অন্যান্য বান্ধবীরাও দাদার উপর বিরক্ত এটা আমি বুঝি, যদিও এখনো পর্যন্ত তুই ছাড়া আর কেউ বলেনি তবু তারা যে যথেষ্ট বিরক্ত দাদার উপর তা ভালভাবেই জানি। আমার মনে হয় বন্ধুদের অনেকেই এখন আর বিশেষ আমাদের বাড়িতে আসে না শুধুমাত্র ওর জন্য। ভাবতে পারিস মন্দিরা একটা ঝিয়ের সঙ্গে—ভাবাই যায় না, আমি আজ মাকে সব জানাব।

না, আমার কথা বাদ দিয়ে যা জানাবার জানাতে পারিস। আমার মনে হয় তোকে কথাটা না জানানোই উচিত ছিল।

সন্ধ্যা মন্দিরার কথা শুনে বলল, তাহোলে বলতে গেলি কেন ? না জানালেই ত' পারতিস ! বারণ করছিস কেন ?

সে তুই বুঝবি না, ঠিক আছে এ ব্যাপার নিয়ে তোকে কিছু করতেও হবে না, কাউকে জানাতেও হবে না। সে যাক, এবার বল কাল তুই কখন যাবি আমাদের বাড়ি ?—মন্দিরা প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় দৃষ্টি ছড়ালো সন্ধ্যার মুখের উপর।

নারে কাল যাব না অন্য আরেকদিন সময় করে যাব। তুই বরং রূপকুমারের উপর এ কয়েক দিন ওয়াচ রাখ আমি পরে তোর কাছ থেকে শুনব।

মন্দিরা ওর কথা শুনে হাসল, বলল, ও আমাদের সমাজের একজন হোলে হয়ত তুই আরো একটু বেশি উৎসাহ দেখাতিস—না ?

কখখনো নয় বরং ঐ সমাজের মধ্যে এরকম একটা ছেলে থাকতে পারে তা ভাবাই যায় না, কাল আমার সময় হবে না তা না হোলে কালই গিয়ে দেখে আসতাম।

একটু আগে যে বললি কাল যাবি ?

কাল একটা অ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট আছে কথাটা মনে পড়েনি তখন।

মন্দিরার বান্ধবীদের তালিকার শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে যে ক'জন আছে তাদের একজন সন্ধ্যা। ওর সঙ্গে সন্ধ্যার চরিত্রগত কিছু বৈষম্য আছে ঠিকই তবু ওর অনেক কিছু মন্দিরার ভাললাগে। বিশেষত সন্ধ্যার মনের যে প্রশস্ততার পরিচয় ও পেয়েছে তা অন্য কোনো মেয়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত দেখতে পায়নি। মন্দিরা লক্ষ্য করেছে ও কোনো কিছুই গোপন করার চেষ্টা করে না। প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই কিছু গোপনীয়তা আছে যা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা চলে না ; মন্দিরার মনেও কিছু ভাবনা-চিন্তা আত্মগোপন করে আছে যা ও হাজার চেষ্টাতেও অন্যের কাছে মেলে ধরতে পারবে না। ও এমন এক পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে চায় যে ওর মনের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে দিতে পারবে। কোনো রাজকুমারের প্রত্যাশী ও নয় এবং কোনো সুদর্শন পুরুষকেও যে কামনা করে তাও নয়, অন্য কিছুর প্রত্যাশী ও। যে ওকে পূর্ণ করে দিতে পারবে এবং যার ব্যক্তিত্বের আবরণের কূট-প্রাকার নিশ্ছিদ্র একমাত্র সেই ওর আকাঙ্ক্ষিত মানুষ হোতে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে আরো কিছু প্রত্যাশা করে ও। যে পুরুষমানুষের ছবিটা ওর মানসপটে আঁকা হোয়ে আছে তার কথা ও অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করতে পারবে না। পারবে না এজন্য নয় যে তার কথা অন্য কাউকে বলা যায় না। আসলে না পারার কারণটা অন্য—মানুষটাকে ও শুধু মনে মনে কল্পনা করতে পারে, যেন বাতাসের মত তাকে অনুভব করতে পারে কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। সেই জনের যদি দে'য়ার মত কোনো পরিচয় না থাকে তাহোলেও মন্দিরা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন ও তুলতে চাইবে না, শুধু বলবে, তুমি আমার মনের মানুষ এই-ই ঢের, কী ছিলে কোথা থেকে এসেছ এ প্রশ্ন আমার কাছে নিরর্থক, যখন তোমাকে জানলাম তখন থেকে তুমি তুমি, তখন থেকেই শুরু তার পূর্বে তুমি অন্যজন, অপরিচিত একজন। সেই অপরিচিত একজনের কথা জানার আগ্রহ আমার নেই, যাকে আমি আগে দেখিনি তাকে জানতে চাই না। এসব কথা মন্দিরা কাউকে বলতে পারে না, পারবেও না কখনো। সন্ধ্যা তার মত নয় ও কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখতে চায় না, এত অকপট ও যে তা ওর কাছাকাছি না আসলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না এমন হওয়া যায়। অন্য কারো কাছে ও কতটা নিজেকে মেলে ধরতে পারে তা মন্দিরার সঠিক জানা নেই তবে ওর কাছে সন্ধ্যা অনেক বেশি সহজ-সরল। সন্ধ্যার জীবনে কিছু জটিলতা আছে। তার জন্য

ও বিব্রত বোধ করে, মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। একটা জঘন্য কাল্পনিক ছবি মনে ভেসে ওঠে আর তখন কোনো প্রেতাত্মা শরীরে বাসা বাঁধলে যেভাবে মানুষ অসংযত আচরণ করে সন্ধ্যাও সেরকম অসংযত হয়ে ওঠে। হাত-পা ছোঁড়ে, বালিশে মুখ ঘষে এবং আরো কিছু করে। ওরকম অবস্থায় ওর মনের ভেতর একটা কিছু ফুলে-ফেঁপে ওঠে, একটা কিছু ছাড়া বিশ্ব-সংসারের সমস্ত কিছু ও ভুলে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তখন পর মানসিক বল লুপ্ত হয়, তখন যেন ও বাজিকরের হাতের শুধুমাত্র খেলার পুতুল। সুতোয় যেভাবে টান পড়ে সেভাবে ও হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, সে এক অসহনীয় অবস্থা। দরদর করে সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে। এমন অবস্থা হয় যে জামা-কাপড় গায়ে রাখতে পারে না। নিজের হাত শরীরে ঘষে ঘষে ঘাম মুছে ফেলার প্রয়াস চালায় আর তখনই বাজিকর যেন ঘন ঘন সুতোয় টান লাগায়। সন্ধ্যার মনে হয় যে বাজিকরটা অলক্ষ্যে থেকে কলকাঠি নেড়ে ওকে নির্লজ্জ করে তোলে, তাকে ও হাতের কাছে পেলে আস্ত রাখত না। বাজিকরটা কখন কলকাঠি নাড়বে ঠিক নেই, এই ভয়েই সন্ধ্যা একা ঘরে শোয়। এসব কথা মন্দিরাকে ও জানিয়েছে। সন্ধ্যার মনে যে জটিলতা আছে তাতে মনে হোতে পারে কোনোদিন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মন্দিরা জানে সেরকম কিছু ঘটবে না, কল্পনার রাজ্যে যে যে ছবি ভেসে উঠে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তা কল্পনার রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছে নেই ওর। বাস্তবে ওরকম একটা ভূতে পাওয়ার মত ব্যাপার এখনো ওর ভয়ের কারণ। এরই জন্য ও বাজিকরের উপর রাগে ফেটে পড়তে চাইলেও মনের মধ্যে একটা দুর্বলতার জায়গা আছে তার জন্য এটা ও বুঝতে পারে। যতই বাজিকর সুতোয় টান লাগায় ততই ও হাত-পা ছোঁড়ে, কত কী যে করে তার ঠিক নেই কিন্তু বাস্তবের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায় না, বাজিকর সেভাবে তাকে উৎসাহিত করে না। যে কথা মন্দিরাকে সন্ধ্যা জানায় তা ভীষণ গোপনীয়, মানুষের মনের ভেতরের ছবি। এমন ছবি অন্যের কাছে তুলে ধরার ঔদার্য বুঝি একমাত্র সন্ধ্যারই আছে। মন্দিরা ওকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে।

মন্দিরা সন্ধ্যার কথা এবং সেই সঙ্গে নিজের কথা ভাবতে ভাবতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিল উঠে পড়বে, কিন্তু পড়বে পড়বে করেও উঠতে পারছিল না। যতবারই উঠবে বলে ভাবছিল ততবারই হয় সন্ধ্যার কথার জবাব দিতে গিয়ে না হয় কথার পিঠে যে কথা এসে যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ করতে বসে থাকতে হচ্ছিল। এবার সুযোগ পেতেই উঠে দাঁড়াল।

কীরে তুই এরই মধ্যে উঠে পড়লি! আর একটু বোস-না বাবা কতদিন পরে আসলি অথচ এরই মধ্যে বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করছিস। বলি দু দণ্ড যখন বসতেই পারবি না জানিস তখন আসলি কেন, না আসলেই ত' পারতিস।

শালা এটা দু'দণ্ড! এক ঘণ্টার উপর কাটিয়ে যাচ্ছি এরপর বাড়ির বাইরে

থাকলে কপালে কী জুটবে জানিস ?—মন্দিরা এ পর্যন্ত বলে অন্য কথা পাড়ল, বলল, তাছাড়া এখন না বেরোলে লেকের মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার উপায় থাকবে না, অন্ধকার হোলেই ওখান দিয়ে যাওয়া যায় না, বাজে লোকের ভিড় তখন, রীতিমত ভয়ের ব্যাপার। তোদের বাড়ি থেকেই ত' একবার রাত করে লেকের উপর দিয়ে যেতে গিয়ে যা হয়েছিল। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে মন্দিরা সামান্য ঘুরে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটা দেখতে থাকল।

কী হয়েছিল বল না! সন্ধ্যার দু' চোখে কৌতূহলের দীপ জ্বলে উঠল।

মন্দিরা হাতের সাহায্যে অসংযত চুলকে কিছুটা সংযত করার প্রয়াস চালাতে চালাতে বলল, আজ নয় অন্য আরেকদিন বলব এখন সেকথা বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কথাটা শেষ করে ও আর দাঁড়ালো না, দ্রুত পদক্ষেপে সন্ধ্যাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

মন্দিরা ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা নিজের মধ্যে ডুবে থেকে ফুটপাথের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকল। সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ে যে ভাবছিল ও তা নয়, অনেক কিছু নিয়ে ভাবছিল। এক সময় ওর সুশোভনের কথা মনে পড়ল। ওর কথা মনে পড়তেই মন্দিরা নিজের মনে হাসল। আসলে যে সময়ে সুশোভনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল সে সময় ও ফ্রক ছাড়েনি। ঐ সময় ও এরকম ছিল না, এরকম ধীর স্থির ছিল না। ওর মধ্যে অস্থিরতা ছিল, পুরুষ মানুষকে জানার আগ্রহ ছিল। অবশ্য জানার আগ্রহ না বলে বলা উচিত পুরুষমানুষের সান্নিধ্যে আসার বাসনা ছিল। এর জন্যই সুশোভনের দিকে ঝুঁকেছিল। পুরুষমানুষের কাছে আসার আগ্রহ ওর এতই অপ্রতিরোধ্য ছিল যে কার কাছে ও আসছে সে কথা পর্যন্ত ভাল-ভাবে জানতে চায়নি। কোনো কিছুই জানতে চায়নি, এমনকি সুশোভন যে তার থেকে কম করে দশ-এগার বছরের বড় একথা পর্যন্ত ও জানত না। আরো অনেক কিছুই জানত না। আগেকার দিন হোলে দশ-এগার বছরের ব্যবধানটা মেনে না নে'য়ার কোনো প্রশ্নই উঠত না কিন্তু এখন এতটা ব্যবধান সহজে মেনে নে'য়া যায় না। মন্দিরা ওর বয়সটা জানার পর একবার ভেবেছিল আর এগোবে না, পরে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সে সংকল্প থেকে সরে এসেছিল। বুঝেছিল সুশোভনের কাছ থেকে সরে যাওয়া সহজ কথা নয়। সরে যেতও না যদি না জানতে পারত ও একই সঙ্গে আরো একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে। জানার পর সরে এসেছিল। এরপর মন্দিরার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসল। অনেক সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তার শেকড় ওর মনে ছড়ালো। কৈশোরের শেষ সীমানার দিকে যতই এগোচ্ছিল ততই মনের গভীরতা বাড়ছিল, অনেক পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল, এমনকি ওর এই পরিবর্তন নিজের কাছেই ধরা পড়ছিল। এখন সুশোভনের কথা মনে পড়তেই ও মনে মনে না হেসে পারল না—কী ছেলেমানুষী না করেছিল তাকে নিয়ে। যেদিন জেনেছিল মানুষটা অন্য আরেকটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে আছে সে সময় ও যা করেছিল তাকে বালিকাসুলভ কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। আজ কেউ

বিশ্বাসই করতে পারবে না আজকের মন্দিরাই ওরকম কিছু করেছিল। সেদিন ওর কথা শুনে আর উগ্রমূর্তি দেখে সুশোভনের মুখ ভয়ে শুকিয়ে যেন কাঠ। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ওকে শান্ত করতে পারছিল না, যতই বোঝাতে চেষ্টা করছিল ততই মন্দিরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছিল, কত কী যে বলেছিল মানুষটাকে তা আজ আর পুরোপুরি মনে নেই তবে কিছু কিছু এখনো মনে পড়ে যেমন ও বলেছিল, আমি বিষ খাব আর তোমার ঐ পেত্নীটাকেও খাওয়াব। আর তোমার জন্য যে খেতে হোচ্ছে তা লিখে রেখে যাব তখন বুঝবে, পুলিশ কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে —ভেবেছ তুমি বাঁচবে। ছাই বাঁচবে, তোমাকে মারার ব্যবস্থা করে রেখে যাব। এরকমই অসংখ্য ছেলেমানুষী কথা বলে সুশোভনের মত সাহসী ছেলের বুকেও ভয় ধরাতে পেরেছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ওর ছেলেমানুষীর জন্যই ভয় পেয়েছিল। হঠাৎ ভয়ঙ্কর কোনো ছেলেমানুষী ও করে বসতে পারে ভেবেই সে ভয় পেয়েছিল। মন্দিরা কিছুক্ষণ তার অতীত নিয়ে ভাবল তারপর এক সময় রূপকুমারকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আসার সময় ভেবেছিল ওকে দেখতে পাবে। প্রত্যেকদিন ছেলেটাকে যে সময় ও বেরোয় সে সময় হয় ঝুপড়ির কাছে বসে থাকতে দেখে, না হয় ট্রেনলাইনের উপর বসে থাকতে দেখে কিন্তু আজ ওকে আসার সময় দেখতে পায়নি। দেখতে না পাওয়ায় নিজের কিছু ভাবান্তর হয়েছিল কিনা তা বুঝে উঠতে পারেনি তবে নিজের কাছে নিজেরই একটা প্রশ্নের জবাব যেন দিতে হয়েছিল। ওর চোখ কেন রূপকুমারকে খুঁজেছিল এটাই ছিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন নিজের মনেই বার বার বলেছে, আস্তাকুঁড়ের মধ্যে এমন একটা ছেলেকে দেখতে পেলে তার সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হওয়াটা কোনো অপরাধ হোতে পারে না। মন্দিরা রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাড়ে আসল আর তখনই ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল লেকের জলের কাছে ঘাসের উপর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঘন হয়ে বসে আছে। দেখে কিছুটা বিরক্ত হয়ে খুব চাপা স্বরে বলল, অসভ্য। বলেই খেয়াল হোলো কথাটা ও যে ভাবে বলে ফেলেছে তাতে ওর কাছাকাছি কেউ থাকলে তার না শোনার কথা নয়। কথাটা মনে হোতেই ও অর্ধ বৃত্তাকারে চোখকে একপাশ থেকে অন্য পাশে এনে দেখল কেউ তার কাছাকাছি আছে কিনা। কাউকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হোলো। আবার দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল পূর্বের জায়গায় অর্থাৎ ছেলেটা আর মেয়েটার উপর দৃষ্টি নিয়ে এলো, এনেই চমকে উঠল। যদিও ওরা জলের দিকে মুখ করে বসে আছে এবং ও ওদের শুধু পেছনের অংশ দেখতে পাচ্ছে তবু ওর মনে হোলো ছেলেটা রূপকুমার ছাড়া অন্য কেউ নয়। ও ওদের কাছাকাছি আসার জন্য তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগোতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ভাবতে থাকল একটা বস্তির ছেলের প্রণয়িনী হয় কী করে ওরকম একটা মেয়ে। কথা বলার উদ্দেশ্যে মেয়েটা দু' একবার ঘাড় সামান্য ঘুরিয়েছে আর তখনই মন্দিরা ওর মুখের কিছুটা অংশ দেখতে পেয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চেহারার জৌলুস দেখে ওর বুঝতে অসুবিধা হয়নি মেয়েটা কোনো ডিভাস্টেটেড্ পরিবারের মেয়ে নয়,

বুঝে একটু বিস্মিত হয়েছে। এরকম একটা মেয়ে কী করে যে রূপকুমারের মত একটা ছেলেকে হৃদয়ে স্থান দিল তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। রূপকুমারের সাহস দেখেও কম বিস্মিত হয়নি, ভেবে পাচ্ছে না ছেলেটারই বা এমন দুঃসাহস হয় কী করে। এ কথা ঠিক ছেলেটা শিক্ষিত হোয়ে উঠছে এবং অসামান্য সুদর্শন কিন্তু তাই বলে ওর মত একটা ছেলের ওরকম একটা মেয়ের প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। মেয়েটার উপরও যথেষ্ট বিরক্ত হোলো। মনে মনে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, রূপের আকর্ষণই বড় হোলো আর কোনো কিছুরই কী প্রয়োজন নেই! শুধু রূপের আকর্ষণে হা-ঘরের কোনো ছেলেকে ভালবাসা যায়! পরে মনে হোলো রূপকুমার হয়ত তার আসল পরিচয়টা জানায়নি মেয়েটাকে, জানালে মেয়েটা নিশ্চয়ই তার প্রেমিকা হোতে চাইত না। প্রচণ্ড একটা অস্বস্তি ওকে গ্রাস করল। মন্দিরার কপালে কয়েকটা বিরক্তির রেখা জন্ম নিল। ও আরো জোরে পা চালিয়ে ওদের কাছাকাছি চলে আসল, এসেই বুঝতে পারল যাকে এতক্ষণ রূপকুমার ভাবছিল সে রূপকুমার নয়। হঠাৎ ওর বুকের মধ্য থেকে একটা ভারী কিছু যেন সরে গেল, সেই সঙ্গে ওর মনে হোলো ছেলেটার এবং মেয়েটার অন্তরঙ্গতা ওর চোখদ্বয়কে এখন আর পীড়িত করছে না। খুব স্বচ্ছ একটা চাদরের মত অন্ধকার এখন ছড়িয়ে আছে লেকের চারপাশে। এ সময় লেকের চতুর্দিকের তৃণাচ্ছাদিত জমির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষজন বসতে শুরু করেছে। বেশির ভাগই যুবক-যুবতী—প্রেমিক-প্রেমিকা। ওর মন থেকে অস্বস্তি অন্তর্হিত হওয়ার পর ও দৃষ্টি বিস্তার করে ঘাসের গালিচার উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আসলে ও ঐ সব ঘন হোয়ে বসে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখছিল, সেই সঙ্গে ওদের নিয়ে ভাবছিল। ওদের মধ্যে সত্যি সত্যি পরস্পরকে ক'জন ভালবাসে তা ওর কাছে একটা বড় প্রশ্ন। ওর মনে হয় সুশোভনের সঙ্গে তার যে ধরনের সম্পর্ক ছিল এদের বেশির ভাগের মধ্যেই আছে সে ধরনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অনেকটা কাফ-লাভের মত। প্রেমিক-প্রেমিকার মনের মালঞ্চে যেন অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, পাপড়িতে পাপড়িতে কত রং অথচ সেই সব ফুলের গাছগুলোর কোনো শেকড় নেই। ও ভাবে এমন রংয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে যে ফুল ফুটে আছে তাদের আয়ু আর কতদিন! যে প্রেম প্রেমই নয় সে প্রেম সম্বন্ধে মরা-বাঁচার প্রশ্ন ওঠেই না। আসলে এ হচ্ছে প্রেম প্রেম খেলা। এ খেলাকে কাফ-লাভ বলেছে সাহেবরা। মন্দিরা নিজের মধ্যে ফিরল। ও এখন সত্যিকারের ভালবাসার অর্থ জানে তাই ও অনেক সংযত, অনেক বেশি হিসেবী। ও নিজের কথা ভাবতে ভাবতে লেকের সংলগ্ন তৃণাচ্ছাদিত জমির উপর দিয়ে হেঁটে ট্রেনলাইনের কাছাকাছি চলে এলো, এরপর ট্রেনলাইনের পাশের ঢাল বেয়ে লাইনের উপর উঠে আসল। উঠে এসেই রূপকুমারের দেখা পেয়ে গেল। এতক্ষণ ও খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। রূপকুমারকে দেখার পর চলার গতি মন্থর হোলো। ও যে ভাবে ট্রেনলাইন ডিঙিয়ে যাবার জন্য পা চালাচ্ছিল তাতে অন্য কেউ দেখলে ভাববে অমসৃণ পথ পেরোনোটা

ওর কাছে সহজ নয় বলেই হয়ত ও সন্তর্পণে পা ফেলছে। মন্দিরা নিজেও জানে লোকে এরকম কিছুই ভাববে, সুতরাং হঠাৎ তার চলার গতি হ্রাস পাওয়ায় অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকবে না কারো। নিশ্চিন্তভাবে চোখের কোণ দিয়ে রূপকুমারকে দেখতে দেখতে এগোতে থাকল ও। হঠাৎ একটা ট্রেনলাইনের পাথর শূন্য থেকে ভেসে আসল এবং মন্দিরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। খানিকটা কেটে কিছুটা রক্ত চুঁইয়ে আসল বুড়ো আঙুলের দিকে। প্রথমে কী ভাবে পাথরটা শূন্য থেকে ভেসে আসল তা বোধগম্য হয়নি। পরে যখন দেখল রূপকুমার একটা বাচ্চা ছেলেব গালে চড় কষালো তখন ব্যাপারটা অনুমান করতে অসুবিধা হোলো না। ছেলেটাই যে পাথর ছুঁড়েছে তা বুঝতে বাকি থাকল না। তাকে উদ্দেশ্য করে যে পাথরটা ছোঁড়েনি এটা বুঝতে পারল মন্দিরা, বুঝতে পারল বলেই রূপকুমার চড় মারার পর ছেলেটাকে ধমকাচ্ছে দেখে ও চুপ করে থাকতে পারল না। রূপকুমারের উদ্দেশ্যে বলল, ওকে ধমকাবেন না ও আমাকে উদ্দেশ্য করে ত' ছোঁড়েনি—লেগে গেছে।

কথাটা কানে যেতেই ইন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে মন্দিরাকে দেখল তারপর ওর দৃষ্টি পায়ে এসে আশ্রয় নিল। সামান্য ইতঃস্তত করে ও মন্দিরার কাছে চলে এলো। ওর নিকটবর্তী হোয়ে বলল, আপনার পা-টা অনেকটা কেটেছে—খুব জ্বালা করছে —না?

একটু।

আমার কাছে ট্যাবলেট আছে—পেইনকিলার—দেব?

আমাদের বাড়িতে সিডেটিভ অয়েনমেণ্ট এবং ট্যাবলেট দুটোই আছে আপনি আমার পায়ের ক্ষত নিয়ে ভাববেন না। আপনাকে একটা প্রশ্ন কবব?

করুন না।

আপনাকে রোজ বই-খাতা নিয়ে বেরোতে দেখি কোথায় যান?

পড়তে।

কোথায়?

কলেজে।

কী পড়ছেন।

কমার্স।

ফার্স্ট ইয়ার?

না, ফাইন্যাল ইয়ার।

পাস-কোর্স?

অনার্স।—ইন্দ্র মন্দিরার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা উচিত নয়, ট্রেন আসছে চলুন ট্রেনলাইনটা পেরিয়ে গিয়ে-কথা বলি।

মন্দিরার চোখ ইন্দ্রর মুখের উপর থেকে সরল। বজবজ থেকে আগত ট্রেনটার দিকে চোখ এনে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে লাইনের কাছ থেকে সরে এলো। ও এবং ইন্দ্র,

ট্রেনলাইন পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো পায়ে পায়ে সৃষ্টি হওয়া সংকীর্ণ পথের মাঝে। পথের হাতখানেক ব্যবধানের পর অসংখ্য ঝুপড়ি, এই ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেশ কয়েক জোড়া চোখ ওদের ঘিরে আছে বুঝতে পারল মন্দিরা। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা খুবই অস্বস্তিকর। যাদের চোখ তাদের ঘিরে আছে তাদেরই একজনের সঙ্গে তার কথোপকথনের জন্য ওদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলেও ও বুঝল ঐভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে সহজভাবে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে বেশ কিছু দৃষ্টির বর্শার সামনে দাঁড়িয়ে বাক্যবিনিময় করা একেবারেই অসম্ভব। বুঝতে পেরে ও বলল, হাঁটতে একটু অসুবিধা হোচ্ছে আপনি কিছুটা আসতে পারবেন? যদি প্রয়োজন হয় আপনার সাহায্য নিতে হোতে পারে ভেবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইন্দ্র সম্মতি জানালো।

মন্দিরার পায়ের ক্ষতটার জন্য যন্ত্রণা একটু হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তাতে তার হাঁটতে গিয়ে কারো সাহায্য নে'য়ার প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়, আসলে ইন্দ্রর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছেটা পেয়ে বসল ওকে। কিছুক্ষণ কথার মালঞ্চে বিচরণ করার ইচ্ছে হোলো বলেই ও এরকম একটা সুযোগকে আঁকড়ে ধরল। কিছুটা পথ সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালো পিচের রাস্তার একপাশে। ইন্দ্র ওকে অনুসরণ করে আসল। পিচের রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে মন্দিরা বলল, আমরা দীর্ঘদিন খুব কাছাকাছি বাস করছি অথচ কেউ কাউকে চিনি না তাই ভাবছি আমাদের পরস্পরের মধ্যে এতটা দূরত্ব থাকা উচিত নয়। যার সঙ্গে কথা বলছি তার নাম না জেনে বলে যাওযাটা ঠিক হবে না, তাছাড়া আপনার নামটা জানতে চাইছি আরো একটা কারণে, আমার একটা স্বার্থ আছে। সে স্বার্থের কথা পরে বলছি তার আগে আপনার নামটা বলুন।

ইন্দ্র ঘোষ।

আমার নাম মন্দিরা মিত্র। আমিও কমার্সের ছাত্রী। ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হোয়ে ভালই হোলো, কখনো প্রয়োজন হোলে আপনার সাহায্য নিতে হোতে পারে—কী পাব ত'?

নিশ্চয়ই পেতে পারতেন কিন্তু আমরা যে-সমাজের মানুষ তাতে আপনাকে সাহায্য করতে যাওয়াটা আমার ধৃষ্টতা হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছি না।

হীনমন্যতায় ভুগছেন! আপনারাও মানুষ আর আমরাও মানুষ। যে ব্যবধানের কথা আপনি বোঝালেন সে ব্যবধান ত' মানুষই তৈরি করেছে। একটু চেষ্টা করলে আপনি এই ব্যবধান ঘুচিযে ফেলতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।

কেন মনে হয়?

আপনি লেখাপড়া শিখছেন সুতরাং···

না। আপনাদের সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই স্বচ্ছ, যতই শিক্ষিত হই না কেন আপনাদের একজন হোতে পারব না কখনই। এই যে আপনি আমার সঙ্গে

দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হোতে পারে। আপনার পরিচিত কারো চোখে পড়লে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, হয়ত সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আপনাকে মিথ্যের আশ্রয়ও নিতে হোতে পারে।

মন্দিরা ইন্দ্রর কথা শুনে হেসে ফেলল, বলল, আপনি আমাকে চেনেন না তাই ও কথা বলতে পারলেন, চিনলে মনে হয় পারতেন না। একটা কথা ঠিক, আপনাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই খারাপ কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা যদি জানতে চান তাহোলে বলতে পারি আমি একটু অন্যভাবে আপনাদের দেখি।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে ত'। আমার মনে হয় এরকম সহানুভূতির থেকে যারা আমাদের উপর নির্দয়, যারা আমাদের ছোটলোক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না তারা আমাদের অনেক কম আঘাত করে। কখনো কখনো শত-সহস্র চাবুকের আঘাত সহ্য করার থেকেও অন্যের করুণার পাত্র হওয়া অনেক বেশি বেদনাদায়ক।

মন্দিরা স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ইন্দ্রর মুখের উপর ওর দৃষ্টি যেন চেপে বসতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকার পর ও এক সময় বলল, অর্থনৈতিক কারণে আপনারা আজ ঐ জায়গায় এবং একই কারণে আমরা অন্য জায়গায় এবার বলুন ত' শুধু ভাগ্যলক্ষ্মীর সহায়তা পাওয়া আর না পাওয়ার জন্য একদল মানুষ অন্য আরেকদল মানুষকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে এটা ঠিক হোচ্ছে কী' ঠিক হোচ্ছে এ ধারণা মন্দিরা মিত্র পোষণ করে না। আপনি যে ভাবে ভাবছেন তা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আমি আপনাদের করুণার দৃষ্টিতে দেখি না। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমি আপনাদের সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবি। সকলে একই দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখে না ইন্দ্রবাবু।

ইন্দ্র মন্দিরার কথা শুনে কী বলবে ভাবতে থাকল। জন্ম থেকেই তাদের আর মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে কঠিন দেয়াল সে দেখে আসছে সে দেয়াল ডিঙিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা তাদের কারো পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না তাই ও বলল, আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারি আর নাই পারি শুনতে ভাল লাগছে, সত্যি বলতে কী এরকম কথা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আর একটা কথা—অর্থ শ্রেণী তৈরি করে এটা চিরসত্য—ক্রপআপ প্রবলেম নয়, দীর্ঘকালের সমস্যা। সভ্যতার পর থেকেই যে সত্য মানবজাতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাকে মেনে না নে'য়ার মানসিকতা এত যুগ পরে আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না। থাক সে কথা, আপনার পায়ের ক্ষতটা থেকে এখনো একটু একটু রক্ত বেরোচ্ছে, যন্ত্রণা কী খুব বেশি এখনো ?

খুব নয় একটু।—মন্দিরা বলল বটে একটু কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমশই বাড়ছে। বুঝল পা নিয়ে ভুগতে হবে।

উত্তর শুনে ইন্দ্র খুব বেশি আশ্বস্ত হোতে পারল না যদিও মন্দিরা বলল একটু তবু ওর মনে হোলো একটু নয় যা ক্ষত হয়েছে তাতে ব্যথা খুব কম হওয়ার কথা নয়,

আর যদি কম হয়ও যতসময় অতিবাহিত হবে ততই বাড়তে থাকবে। ওর ভয় হোলো আরো দেরি হোলে মন্দিরা হয়ত হেঁটে ওর বাড়িতে পৌঁছতে পারবে না। এরকম আশঙ্কা হোলো বলে ও চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, আর দেরি করবেন না এরপর হয়ত হেঁটে যেতেই কষ্ট হবে।

মন্দিরার মনেও সে সম্ভাবনা উঁকি মারল আর সেজন্যই ইন্দ্রর প্রস্তাব মেনে নিল ও। বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। কয়েক পা যেতে না যেতেই বুঝল সত্যি হাঁটতে অসম্ভব কষ্ট হোচ্ছে। আরো দেরি করলে কী যে হোত সে কথা ভাবতেই পারল না ও। বাড়িতে পৌঁছেই বেদনানাশক কিছু না নিলে সমস্ত রাত ঘুমুতে পারবে না বুঝতে পারল। যথা সময়ে বাড়ি ফেরার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বলে ও মনে মনে ইন্দ্রকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না। কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরল। ফিরেই ফার্স্ট-এইডের বাক্সটা খুলে বসল।

তপতীদেবী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বইয়ের তাক থেকে বই নামিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করে আবার যথাস্থানে তুলে রাখছিলেন। মন্দিরা ঘরে ঢোকার সময়ই চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখছিলেন। এরপর হাতের কাজ শেষ করে ঘুরতেই ওকে ফার্স্ট-এইডের বাক্স খুলে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার মন্দিরা, হঠাৎ ওটা নিয়ে বসলে?—প্রশ্ন করতে করতে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর চোখ রাখলেন। ফার্স্ট এইডের বাক্সটা নিয়ে বসার কারণটা তখনো তার কাছে অজ্ঞাত।

মন্দিরা বুঝল তার ক্ষতস্থানটা এখনো বৌদির চোখে পড়েনি। পা-টা তখনো টেবিলের নিচে ছিল বলে যে তার দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েনি তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। ও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা-টা টেবিলের তলা থেকে বার করে আনল।

তপতীদেবী দেখে আঁতকে উঠলেন প্রথম তারপর প্রশ্ন করলেন, পায়ের এ অবস্থা হোলো কী করে?—প্রশ্নটা করেই উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে গলা বাড়িয়ে তার শ্বশ্রূমাতাকে ডাকতে শুরু করলেন।

মন্দিরা বিরক্ত হোয়ে বলল, এমন চিৎকার করছ বৌদি যেন জন্মের মত খোঁড়া হোয়ে বাড়ি ফিরছি। ফার্স্ট-এইড বাক্সটাতে সুগারনিল ছিল না ক'টা?

ওতেই ত' ছিল ভাল করে দেখ।—কথা বলতে বলতে তপতীদেবী ওর কাছে আসলেন। এসেই পায়ের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

কী ব্যাপার বৌমা এতো হাঁক···। ঘরের বাইরে থেকে তপতীদেবীকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলতে বলতে মন্দিরার মা ঘরে ঢুকছিলেন, ঢুকেই তার কথা বন্ধ হোয়ে গেল। তার অসম্পূর্ণ কথা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। ঘরে ঢুকেই তার চোখ চলে গেল মন্দিরার পায়ের উপর। ক্ষতস্থানটি তখন তুলোর নিচে চাপা পড়ে গেছে। তবু তার বুঝতে অসুবিধা হোলো না মন্দিরা পা জখম করে বাড়ি ফিরেছে। ওর পায়ের উপর তুলোর আয়তন দেখে প্রথমে অনুমান করার চেষ্টা করলেন কতটা জখম হয়েছে তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কী করে হোলো?

মন্দিরা জানালো কী করে কেটেছে। শুনে সুদেষ্ণাদেবী ক্ষুব্ধ হোলেন, বেশ

কিছুটা ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, তোর ট্রেনলাইন পেরিয়ে আসার দরকার কী ছিল একটু ঘুরে আসা যেত না।

মন্দিরার পায়ে এখন যথেষ্ট যন্ত্রণা হোচ্ছে তবু ও তার মা'র কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করল, বলল, ঘুরে আসলেও ত' কাটতে পারত মা!

সুদেষ্ণাদেবীর মেজাজ বাড়ল, চড়া গলায় বললেন, না কাটত না, ছোটলোকদের উঠোন ডিঙিয়ে আসার কী দরকার ছিল তোর! আবর্জনার স্তূপ না ডিঙিয়ে আসলে চলে না—না!

কথা শুনে মন্দিরার ভুরু ধনুকের মত বাঁক নেয়। বিরক্ত সহকারে বলে, মা মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে পার না কেন বলত? ওরা কী মানুষ নয়?

মানুষ! হাত-পা থাকলে আর জামা-কাপড় পরলেই মানুষ হয় না। রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নোংরা গালাগালি শুনতে পাস না! এরপরও তোর মনে হয় ওরা মানুষ! সে যাক তোর কতটা কেটেছে দেখি।—সুদেষ্ণাদেবী কথা বলতে বলতে দৃষ্টি আবার ওর পায়ে নামিয়ে আনলেন।

এমন কিছু বেশি কাটেনি—দেখতে হবে না। মা আমাদের সমাজের হয়ত কেউই ওদের মত নোংরা গালাগালি দেয় না কিন্তু নোংরা গালাগালি না দিলেও অনেকেই নোংরামি করে বেড়ায় সুতরাং তারা যদি মানুষ হতে পারে তাহোলে ওরাও মানুষ, তাছাড়া ওদের সকলেই যে এক রকম এটাই বা ভাবছ কেন?

তুই থাম তোকে আর ছোটলোকদের হোয়ে ওকালতি করতে হবে না।—এ পর্যন্ত বলার পরই সুদেষ্ণাদেবী তপতীদেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সুভাষ তোমাকে কিছু বলেছে বৌমা?

কী বলুন ত' মা!

তোমাকে যখন বলেনি তখন জেনে আর কী করবে, আমি না হয় কথাটা আরেক-বার তুলব ওর কানে।—বলে আর দাঁড়ালেন না হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুদেষ্ণাদেবী বেরিয়ে যেতেই মন্দিরা তপতীদেবীকে বলল, কী ব্যাপার বল ত' বৌদি মা ও ভাবে ছুটল কেন?

বুঝতে পারলে না?

নাহ্!

গ্যাসে কিছু বসিয়ে এসেছিলেন সম্ভবত মনে পড়তেই ছুটেছেন। আচ্ছা মন্দিরা তোমাকে একটা প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর দেবে?

তোমার কী মনে হোচ্ছে দেব না? কী প্রশ্ন?

তুমি ট্রেনলাইন ডিঙিয়ে আসতে গেলে কেন?

কারণ বাস ধরে আসতে হোলে প্রিন্স আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত আসতে পারতাম এরপর হেঁটে আসতে হোত, সেই যখন হাঁটতেই হোত তখন শুধু সামান্য পরিশ্রম বাঁচাতে বাসে ওঠার কোনো মানেই হয় না।

তাহোলে সঠিক উত্তরটা পাওয়ার কোনো আশা নেই দেখছি।

মন্দিরা তীব্র দৃষ্টি ফেলল তপতীদেবীর চোখের উপর।—সঠিক উত্তরটা কী ?

বাড়ি ফেরার আগের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা কর তাহোলেই বুঝতে পারবে সঠিক উত্তরটা কী হবে।—কথাটা বলে তপতীদেবী মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।

মন্দিরা বুঝল বৌদি তাকে ইন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। কী উত্তর দেবে ভেবে নিয়ে বলল, ইন্দ্রর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখেছ এই ত'? দেখে কী ভাবলে আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি ?

না তা ভাবিনি তবে ওর দর্শন পাওয়ার আশাতেই যে তুমি ট্রেনলাইন ডিঙিয়ে সন্ধ্যাদের বাড়ি থেকে আসছিলে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না করার কারণ নেই।

মন্দিরা হাসল, বলল, কথাটা মিথ্যে নয় ও আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। ঐ পরিবেশে থেকে ও কী করে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে এটা আমি ভাবতে পারছি না বলেই ওকে আমি জানতে চাইছি। সত্যি কথা বলতে কী একটা আবিষ্কারের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, শুধু এইটুকুই এর বেশি কিছু নয় ইচ্ছে করলে বিশ্বাস করতে পার কথাটা।

ওকে নিয়ে গবেষণা চালাতে চাইছ কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কী একাজে তোমার সুনাম কতটা অক্ষুণ্ণ থাকবে! লোকনিন্দা তোমাকে স্পর্শ করবেই। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে এরকম কিছু করতে যাওয়া আমার মনে হয় তোমার ঠিক হবে না।

বৌদি লোকের কথা আমি ভাবি না তারা যা খুশি ভাবতে পারে শুধু তুমি বিশ্বাস হারিয়ে বোস না।

তুমি যে জন্যই এগোও না কেন এভাবে চললে এর শেষ পরিণতি কী হোতে পারে তা আমার অজানা নয়।

মন্দিরা কিছুক্ষণ জানালার চৌক ফ্রেমের মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ বলতে প্রায় এক-দেড় মিনিট তারপর তপতীদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে বলল, দাঁড়াও তোমার কথার পৃষ্ঠে আমার যে কথা বলা উচিত সেটা শুনে যাও।—এ পর্যন্ত বলে ও সামান্য ঘুরে তপতীদেবীর মুখোমুখী হয়ে বলল, কারো সাথে ভালবাসা হয়ে যেতে পারে ভেবে কোনো ছেলের সাথে কথাই বলতে পারব না তা কী ঠিক ? ভালবাসব বলে কারো দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না আবার ভালবাসব না বলে কারো মুখের দিকে তাকাব না তা কী হয়! আমার বিশ্বাস পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ভালবাসা যায় না। ভালবাসা জন্ম নেয়, যখন জন্ম নেয় তখন কিছু করার থাকে না। ভালবাসা সমাজ-সংসারের নিয়ম-কানুন মানে না। অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য মানুষে মানুষে যে প্রভেদ তা মানে না। অল্প কথায়—ভালবাসা কোনো কিছুই মানে না সুতরাং কী পরিণতি হবে তা

আগে থেকে অনুমান করা ঠিক নয়, আর যদি হয় তাহোলে তুমি ভেবেই বা কী করবে আমিই বা কী করব।

ওর কথা শুনে তপতীদেবী আঁৎকে উঠলেন, বলকি এরকম কিছু হোলেও হোতে পারে!

পারে না এরকম কথা জোর দিয়ে বলা বোধহয় ঠিক হবে না।—মন্দিরা কথা শেষ করে হাসতে থাকল।

তপতীদেবী বললেন, এরকম সম্ভাবনা থাকলে তোমার ওর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। ভেবে দেখ মন্দিরা যদি সত্যি সেরকম কিছু হয়, তাহোলে তোমার আর এ সমাজে স্থান হবে না। তুমি ত' জান আমাদের সমাজ যা স্পর্শকাতর তাতে ওরকম একটা ছেলেকে কিছুতেই মেনে নেবে না।

আমাব পায়ের যন্ত্রণাটা বেড়েছে—প্লীজ বৌদি লিভ মি অ্যালোন।

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি যা বললাম তা নিয়ে একটু ভেব।—বক্তব্য শেষ হোতেই তপতীদেবী আর দাঁড়ালেন না দ্রুত পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তার ঘর ত্যাগ করার সাথে সাথেই মন্দিরা খাটের একপাশে এসে শুয়ে পড়ল।

॥ তিন ॥

ইন্দ্র কলেজের সর্বশেষ পরীক্ষার ফল জেনে বাড়ি ফিরে এলো। ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে বিশ-পঁচিশজন এসে হাজির তাদের ঝুপড়িতে। তারা সকলেই সেদিন অন্য চোখে দেখতে শুরু করল ইন্দ্রকে। পাশের খবর শুনে পুটু একটা বড় আকারের সন্দেশ ওর মুখে গুঁজে দিয়েছিল প্রথম তারপর আনন্দের আতিশয্যে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রত্যেককে খবরটা জানিয়ে এসেছে। জানিয়ে ফিরে এসে বসেছে ইন্দ্রর কাছে। শুধু পুটুই নয় পরিবারের প্রত্যেকে এসে ইন্দ্রর কাছে বসে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, এমনকি যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠেও আজ অন্য সুর। এতদিন মাঝে-মধ্যেই ও তাকে ঠেস দিয়ে কথা বলেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে, অন্যান্য সময় ওর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার চেষ্টা করেছে। ইন্দ্রর সান্নিধ্যে ও বিরত বোধ করেছে। আসলে ওর লেখাপড়া করাটা ও কখনই ভাল চোখে দেখত না, প্রচণ্ড ঈর্ষার জ্বালায় সব সময় জ্বলত, ভীষণ কষ্ট হোত ওর। আলো আর আঁধার একই ছাদের নিচে থাকলে দুটোই ভীষণভাবে চোখে পড়ে সকলের এটা যুধিষ্ঠির মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ও জানত ইন্দ্রর ভালটা যত মানুষ দেখবে ততই তার খারাপ দিকটার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়বে। একই গর্ভজাত হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রকে সহ্য করতে পারছিল না এতদিন এই কারণে। যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবত তার কোনো অন্যায় নেই তাদের কেউই কোনো কালেও

স্কুলের দোরে পা রাখেনি সুতরাং সেও বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে এমন কিছু গর্হিত কাজ করেনি অথচ ইন্দ্রর জন্য ও সবার কাছেই খারাপ, ওর জন্যই তাকে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়। ওর মনে হোত অন্যায়টা ইন্দ্রই করেছে। লেখাপড়া তাদের জন্য নয়। এরজন্যই ও একই গর্ভজাত হোলেও ওকে সহ্য করতে পারছিল না। আজ ইন্দ্রর পাশের খবরটা শুনে হঠাৎ ও খুশি হয়ে উঠল, বুঝল এতদিন ভুল করেছে, এরকম একজন অসাধারণ ছেলে তার একান্ত আপনজন একথা ভেবে আজ ও সত্যিই রীতিমত খুশি হোলো। দীর্ঘদিনের মেঘ যেন সরে গিয়ে সূর্য উদয় হোলো যুধিষ্ঠিরের মনে। ও খুব সন্তর্পণে হাত রাখল ইন্দ্রর পিঠের উপর, যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইল এক অচেনা আপনজনকে যাকে ধরাছোঁয়া যায় ঠিকই কিন্তু নাগাল পাওয়া যায় না। ইন্দ্র এতদিন কাছে থেকেও দূরে সরে সরে যাচ্ছিল কিন্তু আজ যুধিষ্ঠির বুঝতে পারল ও তাদের নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। ওর এই মুহূর্তে আরো কিছু মনে হোতে থাকল, মনে হলো ইন্দ্র যেন দেবতা হয়ে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্যান্য ভাই-বোনরা অন্যভাবে ইন্দ্রকে দেখছে। তাদের মধ্যে শুধু পুটু ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে এবং এখনো দেখছে, একমাত্র তার কোনো কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই ইন্দ্রর কাছ থেকে, ও শুধু চেয়েছে ইন্দ্র শিক্ষিত হোয়ে উঠুক, এ আবর্জনার মধ্য থেকে নিস্কৃতি পাক, বাবুদের একজন হোয়ে থাক ব্যাস আর কিছু নয় আর কোনো কিছুই প্রত্যাশা করে না ওর কাছ থেকে। এমনকি ইন্দ্র যদি আর্থিক সাহায্য না করতে চায় তাদের সংসারে তাহোলেও ওর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকবে না তার জন্য। অন্যান্য ভাই-বোনরাও আজ খুশির ঝরনা হয়ে উঠেছে একটা বিশেষ কারণে। তাদের আশা ইন্দ্রর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যের ছায়াটা সরে যাবে সংসারের উপর থেকে। ইন্দ্রর বাবা-মা'র খুশির কারণও একই। বাবা-মা-ভাইবোন সকলেই ওর কাছে ঘন হয়ে বসে নিজের নিজের স্বপ্নের জগতের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকল। পুটু ঝুপড়ির প্রতিটি বাসিন্দাকে জানিয়ে এসেছিল তার ভাইয়ের পাশের সংবাদটা। এরকম সংবাদ শুনে অনেকে খুশি হয়েছে, খুশি যে হয়েছে তার প্রমাণ তারা খবরটা পেয়ে ইন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

ইন্দ্র ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছে। ফার্স্ট-ক্লাস পাবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল ওর। যা প্রিপারেশন ছিল তাতে ফার্স্ট-ক্লাস না পাওয়ার কোনো কারণ থাকার কথা নয়, থাকতও না যদি না পরীক্ষার সময় ও অসুস্থ থাকত। একশ' দুই-তিন জ্বর নিয়ে ওকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ফলে ও পরীক্ষা দে'য়ার পর নিশ্চিন্ত হোতে পারছিল না। সেজন্যই গেজেট দেখার পর ও খুশি না হয়ে পারেনি। প্রফুল্লচিত্তে ও রাসবিহারী থেকে হেঁটে আসছিল বাসস্থানে ফেরার উদ্দেশ্যে। মুদিয়ালির কাছাকাছি আসতেই মন্দিরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইন্দ্র মন্দিরাকে বাস থেকে নামতে দেখল। দেখে একবার ভাবল এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে কিন্তু পরের মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলল। ও ভেবেছিল

মন্দিরা ওকে দেখতে পায়নি কিন্তু ওর ধারণা যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারল তার নামটা ওর কণ্ঠে উচ্চারিত হোতেই। খুব জোরেই তার নাম ধরে ডেকে উঠল ও। ইন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরা রাস্তা অতিক্রম করে তার কাছে এসে বলল, পার্ট-টু'র রেজাল্ট ত' বেরিয়েছে গেজেট দেখেছেন ?

দেখেছে যে সেকথা মাথা নেড়ে জানালো ইন্দ্র।

মন্দিরার কণ্ঠ আবার বেজে উঠল, সুখবরটা শোনান এবার।

ইন্দ্র জানালো। শুনে মন্দিরা খুশি হয়ে বলল, আমাকে কিন্তু আজ আপনার খাওয়ানো উচিত, বলুন উচিত কিনা ?

ইন্দ্র অসহায় দুটি চোখ মন্দিরার মুখের উপর এনে বলল, সামান্য ক'টা পয়সা বাঁচাবার জন্য যে দু' কিলোমিটারেরও বেশি পথ হেঁটে আসে তার কাছে খেতে চাওয়ার একটাই অর্থ হোতে পারে। একটা গল্প শুনবেন ?

শুনি।

কোনো একসময় কিছু ছেলে একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়ছিল, ঢিলের আঘাতে পুকুরের মণ্ডুকের দলের প্রাণ যাবার উপক্রম তাই তারা ছেলেদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিল যাতে এমন বিপজ্জনক খেলা তারা না খেলে। ছেলেরা মণ্ডুকদের কথা শুনে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, তোরা এমনই নিকৃষ্ট প্রাণী যে তোদের বেঁচে থাকা কিম্বা না থাকার কথা ভেবে এমন একটা খেলা বাতিল করা যায় না। গল্পটা শুনেছেন কখনো ?

মন্দিরা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। তার একটা হাত ইন্দ্রর হাতের উপর রাখল। এরপর ওর সুলোচনদ্বয়কে স্থাপিত করল ইন্দ্রর চোখের উপর। গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল দু'এক মুহূর্ত, তারপর বলল, ইন্দ্র আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি। আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে—আমি আপনার বন্ধু হোতে চাই।—এ পর্যন্ত বলেই ও ব্যাগ খুলে কুড়ি টাকার একটা নোট বার করে ইন্দ্রর হাতে গুঁজে দিয়ে আবার মুখ খুলল, ধার দিলাম চাকরি পেয়ে ফেরৎ দিয়ে দেবেন এবার চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকি।

ইন্দ্র বলল, বন্ধুত্ব সমানে সমানে না হোলে স্থায়ী হয় না দু'দিন বাদেই ভেঙে যায়। তেল আব জল এক জায়গায় পাশাপাশি থাকতে পারে কিন্তু মিশতে পারে না।

ভেঙে যাবেই একথা আপনি জোর দিয়ে বলতে পারবেন না কারণ আপনার হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যাতে এত জোর দিয়ে বলা যায়।

আছে।

আছে ?

দ্রোণাচার্য আর দ্রুপদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা অসম বলেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বন্ধুত্বের অমর্যাদা করেছিল দ্রুপদ। অতীতের সেই বন্ধুর প্রতি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কৌরবদের অস্ত্রগুরু হয়েছিল দ্রোণাচার্য।

বেশ ত' যদি আমাকে সেরকম হোতে দেখেন কখনো তাহোলে আপনি

কৌরবদের মত কাউকে খুঁজে বেড়াবেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই এত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

আছে, আপনাকে আরো একটা গল্প বলি তাহোলেই বুঝতে পারবেন আছে কী নেই।

দাঁড়ান আগে রেস্টুরেন্টটায় ঢুকি তারপর শুনব।—বলেই মন্দিরা হাঁটতে শুরু করল। মেনকা সিনেমার কাছে একটা রেস্তরাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রকে বলল, ঢুকুন।—বলে ও এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে এবং ইন্দ্রকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই আগে ঢুকে পড়ল। ইন্দ্র ওকে অনুসরণ করে এলো। এরপর কোণের দিকের টেবিলের কাছে বসে মন্দিরা ইন্দ্রর বসার অপেক্ষায় থাকল, ও বসতেই বলল, এবার গল্পটা বলুন।

না থাক, আমি বরং অন্য একটা কথা আপনাকে বলি?

বলুন।

আপনি উপযাচক হোয়ে হাঁড়িকাঠে মাথা রাখছেন কেন বলুন ত'?

বুঝলাম না।

আমার সঙ্গে যে সম্পর্কই গড়ে উঠুক না কেন তাতেই আপনার বিপদ. লোকে জানলে মুখ লুকোবার জায়গা থাকবে না।

মুখ লুকোবার কথা ভাবলে তবেই জায়গার প্রশ্ন উঠবে আমি যা করি তা লুকিয়ে রাখি না কারণ আমি বিশ্বাস করি অন্যায় আমি করি না। যা ন্যায়সঙ্গত মনে করি তার জন্য বোধহয় প্রাণটাও বিসর্জন দিয়ে বসতে পারি. আর কিছু বলবেন?

এতটা?

বিশ্বাস হোচ্ছে না?

হোচ্ছে। এখন থেকে তাহোলে আমরা বন্ধু—তাই ত'?

প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিল মন্দিরা কিন্তু তার আগেই বয় এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। ও ইন্দ্রকে বলল, আজ আপনি খাওয়াচ্ছেন সুতরাং কী খাওয়াবেন তা ঠিক করবেন আপনি।

ইন্দ্র ভেবে ভেবে খাদ্যসামগ্রীর অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে যাওয়ার পর বলল, এ ধরনের বড় রেস্তরাঁয় ইতিপূর্বে কখনো ঢুকেছি কিনা মনে পড়ছে না সুতরাং আমাকে খাবারের অর্ডার দে'য়ার কথা বলে বেশ বিপদে ফেলেছিলেন।

কথাটা মন্দিরা যেন শুনলই না, ও যে কথাটা পাড়তে গিয়ে পাড়তে পারেনি একটু আগে সেটা এখন ব্যক্ত করল, এবার কী করবেন ঠিক করলেন?

কী করব তা সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করে না।

ও ইন্দ্রর কথা শুনে অবাক, বলল, আপনার উপর নির্ভর করে না ত' কার উপর নির্ভর করে?

ইন্দ্র পুটুর কথা জানালো ওকে। কীভাবে তাকে নিয়ে পুটু ছোটবেলা থেকে

স্বপ্ন দেখছে তা সবিস্তারে জানালো। শুনে মন্দিরা মনে মনে পুটুকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করল। যাকে ও পুটু ভাবছে তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইন্দ্রর কাছে জানতে চাইল সে পুটু কিনা। তার অনুমান নির্ভুল জানতে পেরে ও অবাক হোলো, ভেবে পেল না ওরকম একটা মেয়ের এমন শক্তি থাকে কী করে। এমন ইচ্ছেই বা হোলো কেন এবং এত মনের জোরই বা থাকে কী করে। মেয়েটাকে আগে যখন দেখেছে তখন ও অন্যরকম ছিল, ছেঁড়া অপরিষ্কার কাপড়-জামা পরত, তৈলহীন রুক্ষ চুল যেন কাকের বাসা হোয়ে থাকত কিন্তু ইদানীং ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ভাল ভাল জামা-কাপড়ও পরে, শুধু তাই নয় আজকাল ও রীতিমত সেজে বেরোয়। প্রতিদিন হয় সকালে না হয় সন্ধ্যের সময় সাজসজ্জা সেরে বেরোয়। অবশ্য ঐভাবে পুটুই যে শুধু সেজে বেরোয় তা নয় আরো কয়েকজন বেরোয় কিন্তু তাদের নিয়ে কখনই ভাবেনি মন্দিরা শুধু ওকে নিয়ে ভাবে। এর একমাত্র কারণ ও জানে মেয়েটা ইন্দ্রর বোন তবে ওর নাম যে পুটু তা এই প্রথম জানলো। ইন্দ্র আরো বোন আছে তাদের মধ্যে পুটুকে বাদ দিয়ে আরো একজন বেশ বড় তাকে বিশেষ বেরোতে দেখে না ও।

কী ভাবছেন?—প্রশ্ন করল ইন্দ্র।

আপনার দিদি কী এইখানেই আপনাকে পড়া শেষ করতে বলবে?

মনে হয় আরো পড়তে বলবে। ও চাইছে আমি এগোই যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর পর্যন্ত পৌঁছনোর প্রয়াস চালাই। এরজন্য ও কী অসম্ভব পরিশ্রম করছে তা অন্য কারো চোখে পড়ুক আর নাই পড়ুক আমি দেখতে পাই। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কাজ থেকে ফেরার পর যখন ওর ক্লান্ত মুখটা দেখি তখন মনে হয় আর পড়ব না, ওকে এবার রেহাই দেব কিন্তু যখন বুঝি না পড়লে ও আরো বেশি কষ্ট পাবে আরো ক্লান্ত ওর মনে বাসা বাঁধবে তখন এগিয়ে যাওয়ার কথা না ভেবে উপায় থাকে না। আমি যখন কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তখন যত-না আমার আনন্দ হয় তার চেয়ে ঢের বেশি হয় ওর। সে সময় শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। দিদি চায় আমি একদিন আস্তাকুঁড় থেকে বেরিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের একজন হয়ে যাই। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, ওর এই চাওয়াটা অর্থাৎ আমার বড় হয়ে ওঠার যে ইচ্ছেটা ও পোষণ করে তার আড়ালে তিলমাত্র স্বার্থ নেই। বলুন ত' ওকে কী করে বোঝাই মধ্যবিত্তদের সমাজের দরজাটা কোনোদিনই আমাদের জন্য খোলা থাকবে না। মধ্যবিত্ত সমাজে উঠে আসা সম্ভব নয়।

বাধাটা কোথায়?

আপনি জানেন না কোথায়?

মন্দিরা বলল, কী করে জানব বলুন আমাকে ত' উঠে আসতে হয়নি। আমার ধারণা এখন মধ্যবিত্ত সমাজের দরজাটা আপনার জন্য আর বন্ধ নয়। ভাল একটা চাকরি পেয়ে গেলেই আপনার দিদির ইচ্ছেটা অপূর্ণ থাকবে না।

ওর কথা শুনে ইন্দ্র হাসল কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে আর একটাও কথা বলল না।

মন্দিরা ঐ হাসির অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, ইন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইল হাসির মধ্যে বিদ্রূপ আছে কিনা। ও যখন ঐভাবে ইন্দ্রর মুখের উপর চোখ রেখে বসে আছে তখনই বেয়ারা অর্ডার অনুযায়ী খাবার টেবিলে সাজিয়ে রেখে চলে গেল। বেয়ারা চলে যাবার পর ও নীরবতা ভঙ্গ করল, নিন আরম্ভ করুন।

ইন্দ্র অনভ্যস্ত হাতে কাঁটাচামচ তুলে নিল কিন্তু ব্যবহার করতে গিয়ে বুঝল অভ্যাস ব্যতীত ও দুটো ব্যবহার করা সহজ নয়। ও মন্দিরার চোখের উপর চোখ রেখে তার অসহায় অবস্থাটা বোঝাতে চাইল।

মন্দিরা আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই ও হঠাৎ হাতের ইশারায় বয়কে ডাকল। বয় আসার পর জানালো খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে কেবিনে রাখতে, বলে ও উঠে দাঁড়ালো। এরপর তাকে অনুসরণ করার কথা ইন্দ্রকে জানিয়ে ও একটা কেবিনে চলে এলো। ইন্দ্র আসার পর এবং বেয়ারা খাবার পৌঁছে দিয়ে কেবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে চলে যাওয়ার পর ও বলল, এখন আপনি আস্তে আস্তে চেষ্টা করুন।

আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন এবার। লেখাপড়া শিখছি ঠিক কথা কিন্তু আমাকে আপনি পরিচিত জনের কাছে বন্ধু বলে পরিচিত করালে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন আমি আপনার বন্ধু। আরো একটা কথা—বন্ধুর কাছে অসুবিধের কথা নির্দ্বিধায় জানাবেন।

কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানের পর ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় পা দিয়ে মন্দিরা বলল, আরো কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করতে পারবেন?

পারব কিন্তু কেন বলুন ত'?

লেকে একটু বসবেন?

আপনার অসুবিধা না হোলে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

আমার অসুবিধা থাকলে আপনাকে বলতে যাব কেন। এ কথা বললেন কেন বলুন ত'?

ফাঁকা কোনো জায়গায় আমাদের একসঙ্গে বসা কী নিরাপদ?

নয় কেন! সবাই ভাবতে পারে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা এই ত'?

না সেজন্য নয়।

তবে?

আমাকে এবং আপনাকে যারা চেনে তারা আমাদের একসঙ্গে ঐ জায়গায় বসে থাকতে দেখলে আপনার কী হবে ভাবুন ত'!

আমার জন্য এত দুশ্চিন্তা কেন?

বাহ্, বন্ধুর জন্য বন্ধুর দুশ্চিন্তা হবে না! আচ্ছা মন্দিরা আপনাকে একটা প্রশ্ন করলে উত্তর পাব?

না শুনে বলা শক্ত, শুনব কিন্তু তার পূর্বে চলুন আগে লেকে গিয়ে বসি। —বলেই মন্দিরা লেকে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে হন হন করে হাঁটতে থাকল। লেকের সীমানার মধ্যে ঢুকেও একইভাবে হেঁটে জলের ধার পর্যন্ত চলে আসল। তারপর ঝুপ করে বসে ইন্দ্রকে বলল, বসুন।—বলে ওর বসার অপেক্ষায় থাকল। বসার পর বলল, এবার কী প্রশ্ন করবেন করুন।

ইন্দ্র বলল, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে অনেকবার ভেবেছি আপনাকে জিজ্ঞেস করব সে সম্বন্ধে কিন্তু করব করব করেও করিনি।

কী সেই কথা?

আমার মত এক হা ঘরের ছেলের সঙ্গে আপনি আলাপ করতে এগিয়ে এসেছিলেন কেন?

আপনার প্রেমে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নিয়ে নয়, সে ইচ্ছে পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই।

সেটা আমি জানি।

আপনার সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল আছে, যে পরিবেশে আপনি জন্মেছেন সেখানে থেকে সরস্বতীর আরাধনা করা যে কত শক্ত তা ভাবাই যায় না। সত্যি কথা বলতে কী আমি আপনাকে জানব বলে ভাবছিলাম অনেক দিন আগে থেকেই আজ বলতে বাধা নেই আমি আড়াল থেকে আপনাকে লক্ষ্য করতাম।

মন্দিরা আর ইন্দ্রর মধ্যে কথা বিনিময় হোতে থাকল। কথা বলতে বলতে এক সময় মন্দিরা সামান্য ঘাড় ঘোরালো, ঘোরাতেই ও সন্ধ্যাকে দেখতে পেল। সন্ধ্যা একা নয় সঙ্গে একজন আছে। ওর মনে হলো সঙ্গের জনটি শুভ হোতে পারে। ও যেমন সন্ধ্যাকে দেখতে পেল সেও তাকে দেখতে পেল। দেখে সন্ধ্যা কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরা ইন্দ্রকে অপেক্ষা করতে বলে সন্ধ্যার কাছে এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। ওকে টেনে নিয়ে যাবার সময় শুভকে তাদের অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে ভুলল না। সন্ধ্যাদের নিয়ে ও ইন্দ্রর কাছে এসে প্রথমে ওদের দু'জনকে বসার অনুরোধ জানালো তারপর ইন্দ্রকে দেখিয়ে সন্ধ্যাকে বলল, চিনিস?

সন্ধ্যা প্রথমে ঘাড় নাড়ল তারপর বলল, চিনি কী করে বলি তবে অনুমান করতে পারছি—ইন্দ্রবাবু।

ইন্দ্র কিছুটা বিস্মিত হোলো শুনে। কী ভাবে তাকে চিনল বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, কী ভাবে জানলেন?

আগেই ত' বললাম অনুমান করছি, মন্দিরার কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে অনুমান করাটা খুব কঠিন কাজ নয়।—এ পর্যন্ত বলেই ও শুভকে মন্দিরার সঙ্গে পরিচয় করাল। করিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল,

তোর রূপকুমারের যে এমন রূপ তা ভাবতেই পারিনি, শালা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ—না ?

শুনে মন্দিরা শব্দ করে হেসে উঠল, এরপর ইন্দ্রর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আমার বান্ধবীর কী ধারণা জানেন ? ভাবছে আপনি আমার প্রেমিক।

নোস্ !—সন্ধ্যা রীতিমত অবাক হোয়ে ওর দিকে তাকাল।

আমরা বন্ধু, শুধু বন্ধুই আমরা।

এখানে যেভাবে বসে আছিস তাতে ভাবাই যায় না তোদের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।

মন্দিরা বলল, ওর আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে, ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছে ও সেই আনন্দেই এখানে এসেছি বলতে পারিস্, বন্ধু বন্ধুর সাফল্য দেখলে খুশি ত' হবেই—হয় কিনা বল ?

সন্ধ্যা আবার মন্দিরার কানের কাছে মুখ আনল, ফিস ফিস করে বলল, তোর ইন্দ্রকে দেখে কী মনে হোচ্ছে জানিস মনে হোচ্ছে শুভকে বাতিল করে দিয়ে ওর সঙ্গে প্রেম করি।

সন্ধ্যার কথাটা রসিকতা তাই মন্দিরা শুনে নিঃশব্দে হাসল একটু তারপর সন্ধ্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কথাটা তোর হৃদয়েশ্বরকে জানাব ?

কথা এইভাবে গড়ালো কিছুক্ষণ এরপর এক সময় সন্ধ্যা ঘড়ির উপর চোখ এনে উঠে উড়ল। সন্ধ্যা আর শুভ চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র উঠে পড়তে চাইল। মন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল, দেখে বলল, অনেক বেজেছে কথায় কথায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে সত্যি অনেক দেরি করিয়ে দিলাম আপনাকে, আপনার শুভ সংবাদটার জন্য নিশ্চয়ই বাড়ির মানুষজন অপেক্ষা করছে, চলুন ওঠা যাক।—বলেই মন্দিরা উঠে দাঁড়ালো।

ওরা একসঙ্গে কথা বলতে বলতে ট্রেনলাইনের কাছ পর্যন্ত এলো। ওখানে এসেই মন্দিরা ওর কাছে বিদায় নিয়ে তার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ইন্দ্র কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। মন্দিরা আর তার মধ্যে দূরত্ব কিছুটা বজায় রাখার জন্যই ও দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মন্দিরা ওর দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার পর ও পা দুটোকে সচল করে তুলল।

আস্তানায় ফিরে ও পাশের সংবাদটা বাড়ির মানুষজনকে জানালো। এরপরই পুটুর তার মুখে সন্দেশ গুঁজে দে'য়া সেই সঙ্গে বাড়ির মানুষজন তাকে ঘিরে বসা থেকে শুরু করে পুটুর মুখে সংবাদ পেয়ে পড়শীদের আগমন—এ সবই ঘটল পরপর। এই মুহূর্তে মানুষের বেশ কিছুটা ভিড় বেড়ে তাদের জীর্ণ ঝুপড়িটা ভরিয়ে ত' ফেলেছেই এমনকি ঝুপড়ির বাইরেও অনেক মানুষ জড়ো হোয়ে আছে। অনেক মানুষের অনেক কথা যেন ঢেউ হয়ে উঠল। বার বার সেই ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকল ইন্দর উপর। বিব্রতবোধ করছিল ইন্দ্র। সুলুক সাঁতরা ওর অবস্থা বুঝতে পেরে সবাইকে ধমকে থামাবার চেষ্টা করতে থাকল। কিছুক্ষণ প্রচেষ্টা

চালিয়ে হাল ছেড়ে দিল। এরপর যুধিষ্ঠির আর লালি এক সঙ্গে চিৎকার করে সকলকে থামিয়ে দিল। নীরবতা নেমে আসার পর মহাদেব ইন্দ্রর কাছে সরে এসে ওর মাথাটা বুকের উপর টেনে এনে বলল, হ্যারে ইন্দ্র এবার তুই অনেক বড় চাকরি পাবি—না ? অনেক টাকা পাবি—না ?

পুটু ধমকে উঠল, শুধু টাকা আর টাকা তোর কত টাকা চাই বল ? আমাকে আর লালিকে বেচে দে এতো এতো টাকা পেয়ে যাবি। এত বড় পাশটা ছেলেটা যে দিল তার জন্য কোথায় খুশি হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে তা না কেবল টাকা আর টাকা।—এরপর ইন্দ্রর দিকে ফিরে বলল, তুই এই জঞ্জালের মধ্যে আর পড়ে থাকিস না অন্য কোথাও চলে যা আমাদের কাউকেই তোর দেখতে হবে না, আমি বলছি তুই এখানে থাকিস না—সব অমানুষের দল, স্বার্থপর।

সুলুক সাঁতরা পুটুর কথার তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, এটা তোর বলা উচিত হোচ্ছে না পুটু শত হোলেও বাপ বলে কথা, ছেলে বাপকে দেখবে না ত' কী অন্য কেউ দেখবে !

পুটু গলার স্বর বিকৃত করে বলল, বা—প ! কেন দেখবে ? বাপ কী ছেলেকে দেখেছে ! ও যে লেখাপড়া শিখেছে তা কী বাপের পয়সায় ! বাপ দিয়েছে পয়সা ? না ও কাউকেই দেখবে না।

ওর কথা শেষ হোতে না হোতেই চাঁপা গর্জন করে উঠল, শুধু তোকে দেখবে কারণ তুই টাকা ঢেলে ওকে পড়িয়েছিস—এই ত' ? এবার বলি তুই এ্যাত্তো এ্যাত্তো টাকা কী করে আনিস তা ভাবছিস আমি বুঝি না—না ? শুধু আমি কেন সবাই জানে কী করে তুই টাকা আনিস। পেটে ধরেছি বলে কী এসব দেখে আমাকে চুপ করে থাকতে হবে !

বল কী জানিস।—কথাট বলতে গিয়ে পুটুর গলার শিরা ফুলে উঠল।

শুনবি ? তুই একটা বেশ্যা মাগী—ছিঃ।—ছিঃ।—কথাটা শেষ করে চাঁপা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চাঁপার কথা শুনে পুটু যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, কী আমি বেশ্যা ! ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস কর আমি কী করি, ঠিক আছে এখন থেকে দেখব একপাল শুয়োরের মুখে হাত ওঠে কী করে।

কী তুই তোর ভাই-বোনদের শুয়োর বললি !—উত্তেজনায় চাঁপার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকল, দুপ্দাপ্ করে পা ফেলে ঘরের এক কোণ থেকে কলাই করা থালা আর অ্যালমুনিয়ামের হাঁড়ি আর গ্লাস নিয়ে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকল সেই সঙ্গে তার ঠোঁট দুটো বিরামহীন ভাবে নড়তে থাকল।—নিয়ে যা তোর পয়সায় কেনা বাসন-কোসন, পেটের অন্ন ত' আর ফিরিয়ে দে'য়া যায় না পারলে তাও ফিরিয়ে দিতাম। পেটে শত্তুর ধরেছিলাম তা না হোলে এমন কথা শুনতে হয় !

পুটুও মুখ চালাতে থাকল সমান তালে।—তুই পেটের মেয়েকে বেশ্যা বলতে পারিস অথচ মেয়ে কিছু বলতেই দোষ—না ? খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলে এতগুলো

মানুষের অন্ন জুগিয়ে যাচ্ছি অথচ আমার দিকে কারো চোখ পড়ে না একবারের জন্যও, চোখ ত' পড়েই না উল্টে খারাপ খারাপ কথা শুনতে হয়—এই না হোলে বাবা-মা !

পড়শীরা মা আর মেয়ের ঝগড়া উপভোগ করছিল তাই থামাবার প্রচেষ্টা তাদের তরফ থেকে ছিল না, বরং তারা দু'দলে বিভক্ত হোয়ে একদল মাকে এবং অন্য অ'রেক দল মেয়েকে সমর্থন করে এমন ভাবে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিল যাতে ঝগড়া আরো বৃদ্ধি পায়। ওদের এ ধরনের প্রবণতা এই প্রথম নয় যখনই যেখানে ঝগড়া শুরু হয়েছে তখনই তারা মহা উৎসাহে এক এক পক্ষকে এক এক দল সমর্থন করে সে ঝগড়াকে বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছে। এখন একমাত্র সুলুক সাঁতিরা এই ঝগড়া থামিয়ে দে'য়ার উদ্দেশ্যে কখনো পড়শীদের কখনো মা ও মেয়েকে ধমকে থামাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করলে কী হবে তার প্রচেষ্টা খুব বেশি ফলপ্রসু হোচ্ছে না। হঠাৎ যুধিষ্ঠির জ্যা থেকে মুক্ত হওয়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে বলল, আর একটাও কথা যদি কারো মুখে আর শুনতে পাই তাহোলে খুব খারাপ হোয়ে যাবে, শালা তখন থেকে খালি কেচরমেচর কেচরমেচর থামার নাম নেই।

যুধিষ্ঠিরের ধমকে কাজ হোলো একসঙ্গে সকলের মুখ বন্ধ হোলো। পড়শীরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল। যুধিষ্ঠিরও বসে থাকল না ওদের সঙ্গে সেও চলে গেল অন্যত্র। চাঁপা রাগে গজগজ করতে করতে যুধিষ্ঠিরের ঘর ছাড়ার আগেই ট্রেন-লাইনের উপর চলে এসেছিল। সর্বশেষ তিনজন মাত্র থাকল ঝুপড়ির ভেতর—পুটু, ইন্দ্র আর লালি। ইন্দ্রও উঠে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু পুটু ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, বোস তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

এখন থাক পরে শুনব।—ইন্দ্র কথা শেষ করে দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার উঠবার চেষ্ঠা করল।

পরে নয়—যা সব বাড়ির মানুষ তুই বড় হোয়ে উঠছিস দেখে কী আনন্দ সবার, ভাবছে সংসারের লাঙলটা তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিব্বি থাকবে, প্রত্যেকের শখ-আহ্লাদ মিটিয়ে নেবে তোকে নিঙরে। এখানে তোকে আমি বেশিদিন থাকতে দেব না। তোর লেখাপড়া শেষ হোলেই তাড়াব, তুই যে মেয়েটার সঙ্গে মিশিস তাকে নিয়ে ভদ্র পাড়ায় গিয়ে ঘর বাঁধবি।

ইন্দ্র বুঝল ও মন্দিরার কথা বলছে, বুঝতে পেরে হাসল।

পুটু ওকে হাসতে দেখে ভাবতে থাকল সে যা বলেছে তার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যাতে ও হাসতে পারে। বুঝতে না পেরে বলল, কীরে হাসছিস কেনরে ইন্দ্র ?

হাসছি তোর কথা শুনে। তুই কী ভেবেছিস ও আমার সঙ্গে প্রেম করে ?

করে না ! তাহোলে তোরা একসঙ্গে ঘুরিস কেন ?

লালি এক কোণে বসে একটা ছেঁড়া কাপড়কে সেলাই করে পরার উপযুক্ত করে তুলছিল এবং মাঝে মাঝে ওদের এক একটা কথা শুনে মুখ তুলে কখনো ইন্দ্রর

মুখের দিকে কখনো পুটুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সাধারণত ও কোনো কিছুর মধ্যেই বিশেষ থাকতে চায় না। কথাও খুব কম বলে তবে রেগে গেলে সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ে। ওর সম্বন্ধে আরো কিছু বলা চলে যেমন ও পারিবারিক কোনো কলহের মধ্যে নাক গলাতে চায় না। কে কোথায় গেল কী না গেল এবং কে কী করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে ভেবে বিন্দুমাত্র মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করতে চায় না। ও এরকম বলে এত কিছু হোয়ে যাওয়ার পরও নির্বিকার চিত্তে কাপড় সেলাই করে যাচ্ছিল কিন্তু ইন্দ্রর কথা ওর কানে পেঁছিবার পর আর মুখ না খুলে পারল না। ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, দাদা তোর সঙ্গে প্রেম করে না ও—কী বলছিস।

ঠিকই বলছি ও আমার বন্ধু।

ছেলে আর মেয়ে কখনো বন্ধু হোতে পারে ?

পারে।—লালির কথার জবাব দিয়ে পুটুকে ইন্দ্র বলল, তুই একথা বলবি বলেই কী আমাকে বসতে বললি ?

না, এ কথা বলার জন্য তোকে আটকাইনি—তোকে আরো পড়তে হবে।

না, আর নয় অনেক হয়েছে কী হবে আরো পড়ে ? তাছাড়া আমার জন্য তোকে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে হোচ্ছে তা দেখে আর লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না। —কথাটা শেষ করেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ইন্দ্র।

ওর কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি পুটু উত্তেজিত হোয়ে উঠল, তোকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না এ কথা আগেও বলেছি এখনো বলছি, আমি বলছি তোকে আরো পড়তেই হবে।—এরপর ওর উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পাওয়ার পর অন্য সুরে বলল, কী আরো পড়া যায়রে ইন্দ্র বল না ?

পড়া অনেক কিছুই যায় তবে যদি পড়ি তাহোলে এম-কম পড়ব। এতে খুব বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে না কয়েকটা টিউশনি করতে পারলেই পড়ার খরচ উঠে আসবে হয়ত।

অন্য কী পড়লে খরচ বেশি লাগবে ?—প্রশ্ন করে পুটু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকল।

ইন্দ্র দু'এক মুহূর্ত ভাবল তারপর ওর কথার জবাব দিল, অনেক কিছুই আছে যেমন আই-সি-ডাবলু-এ-আই, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, সি-এ—অনেক আছে কটা বলব।

এগুলোর মধ্যে কঠিন কোনটা রে ?

সি-এ।

অন্যের কাছে কঠিন হোলেও তোর পক্ষে মোটেও কঠিন নয় আমি জানি, তোর যা মাথা তাতে তুই ঠিক পাশ করে যাবি। তুই তাহোলে সি-এ-তেই ভর্তি হোয়ে যা, টাকার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

পুটুর কথা শেষ হোতে না হোতেই লালিও ওকে সমর্থন করে বলল, পড়-না দাদা দিদি ত' বলছে টাকা দেবে।

দিতে গিয়ে কী হাল হয়েছে ওর দেখেছিস ?

লালি বিষণ্ণ সুরে বলল, সত্যি দিদি তুই যা পরিশ্রম করছিস তাতে ভয় হয় কোন্‌দিন-না অসুখে পড়ে যাস।

দূর্‌ আমি কী মাটি কাটি আমি ত' মডেলিং করি, মডেলিং করতে কী পরিশ্রম করতে হয়! শুধু লোকে দশ কথা বলে এটা সহ্য করতে একটু কষ্ট হয় তবু বাইরের লোক বললে এক রকম কিন্তু ঘরের লোকজন যখন বলে তখন মেজাজ গরম হোয়ে যায়। শুনলি ত' নিজের মা আমাকে বেশ্যা বলে গেল।

মা'র কথা ছাড় আজকাল কথা যা বলে তাতে কানে আঙুল দিতে হয়।—লালি কথাটা বলে সেলাই শেষ হোয়ে যাওয়া কাপড়টা থেকে দাঁত দিয়ে সুতো কেটে ছুঁচটা আলাদা করল।

ইন্দ্র বলল, দু' একটা দিন ভেবে দেখি কী পড়া উচিত তারপর তোকে জানাব। —পুটুর কথার জবাব দিয়ে ও উঠে পড়ল। গরমে গায়ে ঘাম বসতে শুরু করেছে, কিছুক্ষণ আগে ভিড়ের চাপে ওর দম বন্ধ হোয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ভিড়ের চাপ কমার পরও ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, এমনিতেই ঘরটাতে হাওয়া ঢোকে না বললেই চলে তার উপর প্রকৃতিদেবীর কৃপাদৃষ্টি তাদের উপর বিকেল থেকেই বর্ষিত হচ্ছে না। ভুলেও সমীরণ তাদের দ্বার অতিক্রম করে ঘরে আসতে চাইছে না ; ফলে ইন্দ্র ঘর্মাক্ত শরীরে ঘরের ভিতর বসে ছটপট করছিল কিন্তু পুটুর নির্দেশ অমান্য করতে পারছিল না বলে এতক্ষণ বসেছিল এবার তার কথার উত্তর দিয়ে আর ঘরে থাকতে চাইল না বেরিয়ে এলো বাইরে। বাইরে আসতেই বিরজুর সঙ্গে চোখাচোখি হোলো। বিরজু ওকে দেখেই হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। এই মানুষটাকে ও সহ্য করতে পারে না। দেখলে মনে হয় মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ সাতেপাঁচে থাকে না কিন্তু বাস্তবে মানুষটা মোটেও সুবিধের নয়। পয়সার জন্য অনেক নিচে নামতে পারে। বিহারের ছাপড়া জেলা থেকে কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে কলকাতায় এসেছিল অর্থোপার্জনের আশায়। যা টাকা-পয়সা ছিল তা দিয়ে কোনো কিছুর ব্যবসা করবে ভেবেছিল কিন্তু ঠগের পাল্লায় পড়ে নিঃস্ব হোয়ে শেষ পর্যন্ত এইখানে আশ্রয় নেয়। তখন মানুষটার মাথায় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়নি কারোরই। সে সময় কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর সহজে পাওয়া যেত না প্রশ্নটা বুঝতে এত সময় নিত ও যে বেশির ভাগ সময় প্রশ্নকর্তা মানুষটাকে একটা বিশেষণ উপহার দিয়ে উত্তর পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে চলে যেত। এমন একটা মানুষের পেটে বাংলাদেশের অন্নজল কিছুদিন পড়তেই হোয়ে উঠল অন্য এক মানুষ। সেই বিরজুকে কিছুদিন পর আর চেনা যেত না। ও কী যে করত তা স্বয়ং ভগবান ব্যতীত আর কেউ জানত না তখন, যা করত তাতে ভালই অর্থ উপার্জন হোত ওর যদিও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে কত অর্থ উপার্জিত হোত তা বোঝার উপায় ছিল না তবু ওর যে ভাল আয় তার প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল বুলান এবং তাতে আয়ের

রাস্তাটাও আবিষ্কার করে ফেলেছিল। বিরজু জুয়াড়ি এবং মাতালদের ঘড়ি, ছাতা, ঘটি-বাটি কিম্বা অন্য যে কোনো জিনিস বন্দক রেখে টাকা দিত। বিশেষ বিশেষ সময় চড়া সুদে ধার দিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জুয়াড়ি কিম্বা মাতালরা সে সব জিনিস ছাড়িয়ে নিতে পারত না তখন ও সেগুলো বেচে দিত। এভাবে মন্দ রোজগার হোত না ওর। ও এখনো সে ব্যবসা করে কিনা বলা শক্ত যদি করেও থাকে তাহোলে এখন আর সেটা মূল ব্যবসা নয় এখন ওর অন্য ব্যবসা—একটা নয় একাধিক। এখন যা করে অর্থাৎ যে সব ব্যবসা করে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই কারোরই, না থাকলেও সকলেই অনুমান কবতে পারে ওর আরো ব্যবসা আছে। প্রত্যেকেরই অনুমান অপরাধ জগতে ও বিচরণ করে। একমাত্র ওর কিছুটা জানে ইন্দ্র। যা ও জেনেছে তা অস্বাভাবিক এবং ভযঙ্কর। মানুষটার ভেতবের ভয়ঙ্কর দিকটা উম্মোচন করতে হোলে মালতিব কথা এসে যায়। মালতি বিরজুর বাঙালি বধূ। বছর পাঁচেক ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে ও দেখে আসছে মালতি খুবই পতিব্রতা স্ত্রী। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত। প্রায়ই ইন্দ্রর চোখে পড়ে স্বামীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ধরনেব ব্রত পালন করে ও। এছাড়া আরো অনেক কিছুই চোখে পড়ে যেমন প্রতিদিন দেখে মালতিকে বিরজুর হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে তেল মাখিয়ে দিতে আবাব কখনো দেখে স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোয়ে বসে গল্প করতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক এ বস্তির কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেই। দু'জনের মধ্যে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্য কখনো ঝগড়া হোতে দেখেছে এমন কথা একজনও বলতে পারবে না। একবার বিরজু অসুস্থতার জন্য তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি সেই তিনদিন মালতি তার শয্যার পাশ থেকে নড়েনি বললেই চলে, মুখে অন্ন পর্যন্ত তোলেনি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনরাত্রি সেবাশুশ্রূষা করে ওকে সুস্থ করে তুলেছিল। নিঃসন্দেহে বলা চলে দু'জনের মধ্যে যে ভালবাসার সম্পর্ক ইন্দ্র দেখেছে তাতে বিন্দুমাত্র ফাটল নেই। জমাট পাথরের মত প্রেম দু'জনের মধ্যে। কিছুদিন পূর্বে এটাই জানত এর জন্য মালতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল ওর কিন্তু এখন ও তার উপর সম্পূর্ণ বিতশ্রদ্ধ। এর কারণ ও একটা ভয়ঙ্কর কিছু জেনেছে মালতি আর বিরজু সম্পর্কে। প্রত্যেক সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে ওরা দু'জন সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে যায়, রাত্রে একা বিরজু ফিরে আসে। পরের দিন সকালে মালতি ফেরে। ঝড়ের পর একটা অঞ্চলের যে চেহারা হয় ওর চেহারাও থাকে অনেকটা সেরকম—বিধ্বস্ত। ওকে দেখে তখন মনে হয় বায়ু তাড়িত কোনো ছিন্নপত্র হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা ইন্দ্রর বোধগম্য হোত না। পরে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। আলিপুরের শ্যামসুন্দর ধর নামের কোনো এক ব্যাচেলারের বাড়িতে ওকে পেঁছে দিয়ে আসে বিরজু। এটা জানার পর ইন্দ্র অবাক হোয়ে ভেবেছে এরপর অর্থাৎ এরকম একটা কিছুর পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকে কী করে! এ কোন ধরনের প্রেম! ঘর থেকে বেরিয়ে বিরজুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

ইন্দ্র ভেবেছিল মানুষটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু ওর সে ইচ্ছা ফলপ্রসু হোলো না, বিরজু হাতের ইশারায় ওকে ডেকে বসল। এরপর তার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকল না। পায়ে পায়ে মানুষটার কাছে এসে ও বলল, কী বলবে বল ?

বস-না বলছি।—কথা বলতে বলতেই বিরজু হাতের তালু দিয়ে তার পাশের জায়গাটার উপর থেকে ধুলো সরিয়ে দিল।

এত খাতির করে বসানো হোচ্ছে দেখে ইন্দ্র বুঝল কোনো উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে অকারণে এভাবে নিজের হাতে ধুলো ঝেড়ে বসাবার মানুষ আর যেই হোক না কেন বিরজুপ্রসাদ কখনই নয়। কী উদ্দেশ্যে ওকে ডাকা হয়েছে তা জানার কৌতুহল যে ইন্দ্রর একেবারেই হোচ্ছে না একথা ঠিক নয় তবু ও মানুষটার কাছ থেকে পালাতে চাইল, বলল, বসব না কাজ আছে আমাকে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে বেরোতে হোচ্ছে সুতরাং যা বলার তাড়াতাড়ি বল।—কথার মধ্যেই ও যে যথেষ্ট বিরক্ত মানুষটার উপর তা প্রকাশ পেল।

পাঁচটা মিনিট শুধু বোস তাহোলেই হবে, পাঁচ মিনিট বসলে এমন কিছু দেরি হোয়ে যাবে না তোর।—বলে বিরজুপ্রসাদ আশার দীপ জেবলে তাকিয়ে থাকল ইন্দ্রর দিকে।

ইন্দ্র বসবে কিনা ভাবল এক মুহূর্ত তারপর বসে পড়ল। বসে বলল, তোমাকে ত' আগেই জানিয়েছি আমার সময় নেই সুতরাং যা জানাবার তা সংক্ষেপে বলবে।

তোর বৌদি তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।

কেন ?

ও একটু লেখাপড়া শিখতে চায়। স্কুল-টিস্কুলে পড়বে না শুধু বই পড়ার মত বিদ্যের দরকার, গল্পের বই-টই পড়তে পারলেই হোলো। পুটু আর লালির মত বই-টই পড়তে চায়।

আমার সময় হবে না।

এমন কী রাজকার্য করিস যে এক-আধ ঘণ্টা সময় হবে না তোর ?

আমি পারব না পড়াতে।

সে কথা তোর বৌদিকে বলে আসিস। যা-না তোর বৌদির সঙ্গে দেখা করে আয়-না।

বললাম ত' আমার সময় হবে না।—বলেই ইন্দ্র উঠে পড়তে যায় কিন্তু পারে না বিরজু ওর কাঁধটার উপর হাতের সামান্য চাপ দিয়ে ওকে আটকায় প্রথম তারপর বলে, তোকে এমনি পড়াতে হবে না আমি টাকা দেব এর জন্য।

তোমার টাকা আমি নেব! ভাবলে কীভাবে বিরজু দা ?

পাপের টাকা বলে ? পাপের টাকা হোলেও টাকায় পাপ লাগে না। মানুষ অনেক কিছুকেই ঘেন্না করে কিন্তু টাকাকে ঘেন্না করে না। যদি করেও সে ভুল করে কারণ টাকার মত পবিত্র আর কিছু নেই ইন্দ্র। এত লেখাপড়া শিখেও এ

কথাটা জানতে পারিসনি এতদিন! দ্যাখ টাকা মুচি-মেথরের হাত ঘুরে ব্রাহ্মণের হাতে উঠছে, ভেবে দ্যাখ এতটা পবিত্র গঙ্গাজলকেও মানুষ ভাবে কিনা, তাই বলছিলাম টাকাকে ঘেন্না করিস না। আরেকটা কথা বলব তোকে আমি খারাপ হোতে পারি কিন্তু তোর বৌদি ত' খারাপ নয়।

তোমার থেকে সে আরো খারাপ।

কী বললি সে আরো খারাপ! তার সম্বন্ধে তুই কতটুকু জানিস?

বিরজুর বক্তব্য শুনে ইন্দ্র প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বিরক্তি সহকারে বলল, বৌদিকে বোল প্রতি সপ্তাহে যাকে আলিপুরে যেতে হয় ইন্দ্র তাকে পড়াতে পারে না।—কথা শেষ করে ও আর দাঁড়ায় না হন হন করে হাঁটতে শুরু করে।

রাতে ন'টার পর ও ঝুপড়ির বাইরের ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আকাশে যে মেঘ আছে তাতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কতটা তা পরখ করে দেখছিল। ওর দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ ও অনুভব করল তার হাতটা কে যেন খপ্ করে চেপে ধরল। ও চোখ নামিয়ে আনল আর তখনই হাতটায় সামান্য টান লাগল। মালতি শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল তার আস্তানার দিকে সেই সঙ্গে ও বলতে থাকল, আমি খারাপ! আমি কতটা খারাপ জেনে যা, আয় আমার সঙ্গে।

ছেড়ে দাও আমাকে আমি কিছু জানতে চাই না।

এখন চাই না বললে চলবে কেন ইন্দ্র তোকে আজ জানতেই হবে আমি কতটা খারাপ।

আমি ত' বলছি বৌদি তোমার সম্বন্ধে আর কখনো কিছু বলতে যাব না।

এখন আর সে কথা বললে চলবে না, তুই যদি না আসিস আমার সঙ্গে তাহোলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব সেরকম কিছু করলে তুই কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবি না।

ইন্দ্র অনেক চেষ্টা করল মালতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হোলো। নিরুপায় হোয়ে তার সঙ্গে ওকে যেতেই হোলো।

মালতি ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির করল তার ঝুপড়িতে। ঝুপড়ি বলাটা ঠিক হোচ্ছে না কারণ ওদের এখন ইঁট-সিমেণ্টের তৈরি চার দেয়ালের ঘর, মাথার উপর টালির চাল। যাই হোক মালতি ইন্দ্রকে টেনে এনে ঘরে ঢোকাল তারপর দরজা বন্ধ করে অর্গল আটকে দিল। দিয়েই বলল, তোর বিরজু দা আজ রাতে ফিরবে না কল্যাণীতে গেছে। এবার বল কতটা খারাপ তুই জেনেছিস? এ ঘরে যদি তোকে আমার সঙ্গে থাকতে হয় তাহোলে কাল ভোরে তোর মুখে চুনকালি পড়বে তখন দেখব তুই আমাকে কী করে খারাপ বলিস।

ইন্দ্রর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ তবু কোনো রকমে বলল, আমি তোমার সম্বন্ধে মিথ্যে কিছু বলিনি বৌদি যা জেনেছি তাই বলেছি তাতে এত বড় শাস্তি আমাকে দিও না।

ওর কথা শুনে মালতি খিল খিল করে হেসে উঠল তারপর দু' ঠোঁটের মাঝখান থেকে হাসি মিলিয়ে যাবার পর বলল, কাল লোকে যা জানবে তাই বলবে তারাও কিছু মিথ্যে বলবে না। আমাকে খারাপ বলছিস কিন্তু কতটুকু জেনেছিস আমার সম্বন্ধে ? তোর নিজের সম্বন্ধে কী ধারণা ?

ইন্দ্র প্রশ্নের জবাব দিল না আসলে এই মুহূর্তে তার কী করণীয় তা বুঝে উঠতে পারল না।

মালতি সামান্য কিছুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকল এবং যখন ও বুঝতে পারল উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন ও বলল, আমি আমার শরীর থেকে এক এক করে জামাকাপড় খুলে ফেলে দেখব কতটা ভাল তুই ?—কথা বলতে বলতে ও তক্তপোষের উপর থেকে উঠে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে ওর চোখের তারা স্থির হোয়ে থাকল ইন্দ্রর চোখের উপর।

ইন্দ্রর হাত-পা ঠান্ডা হোয়ে আসছিল ক্রমশঃই, কপালে ঘামের বিন্দু জমে উঠেছিল এখন মালতিকে দাঁড়াতে দেখে সেই ঘামের বিন্দুগুলো বড় হোতে থাকল।

মালতি সোজা দরজার কাছে এসে ছিটকিনিটা নামিয়ে পাল্লা দুটোকে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রর কাছে এসে বসল। এরপর বিদ্যুৎ চমকে ওঠার মত হেসে উঠল, সেই হাসি ক্রমশঃই ঝড় হোয়ে উঠল, সেই ঝড়ের দাপটে বুকের উপর থেকে কাপড় খসে পড়ল। মালতি তাড়াতাড়ি আঁচল পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে এনে বলল, খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি—না? যাক সে কথা, আমার কথা শুনবি ? শোনাব তোকে তবে তার পূর্বে আমি একটা কথা জানিয়ে রাখি যতক্ষণ আমার কথা শেষ না হোচ্ছে ততক্ষণ কোনো প্রশ্ন করতে পারবি না, অবশ্য করবিই বা কী করে তোর যা অবস্থা তাতে গলা দিয়ে কথা বেরোবে বলে মনে হয় না।

আমি ত' তোমার কাছে শুনতে চাইনি বলছ কেন ?

কারণ আমি খারাপ এ কথা ঠিক কিন্তু কতটা খারাপ এবং কেনই বা খারাপ তা তোকে জানতেই হবে, তার পূর্বে তোকে একটা কথা বলে নি তোর বিরজুদাকে তোরা যতটা খারাপ ভাবিস মানুষটা ততটা খারাপ নয়। এ কথা ঠিক ও যে রাস্তা ধরে হাঁটছে সেটা সোজা রাস্তা নয় তবুও সব কিছু জানার পর মানুষটাকে তোরা খারাপ বলতে পারবি না। এমন মানুষটাকে ভাল না বেসে পারি নি। আমার জায়গায় অন্য কেউ হোলে হয়ত ওর সঙ্গে ঘর করতে পারত না কারণ মানুষটা শুধু আকৃতিতেই পুরুষমানুষ। আমি ত' লেখাপড়া জানি না তাই ভদ্রভাবে তোকে গুছিয়ে বলতে পারলাম না যা বলতে চাইছি তবু তোর মতন শিক্ষিত ছেলের সেকথা বুঝে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ওর ইচ্ছেতেই আমাকে আলিপুরে যেতে হয়। আমি ওকে ভালবাসি তবু শরীর একটা আছেই। বল ইন্দ্র আমি কী খুব অন্যায় করছি ? তাছাড়া আমাদের এখানে ক'জন ভাল আছেরে ?

ইন্দ্র উঠে পড়ল। জামার আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে পায়ে পায়ে সৃষ্টি হওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল তাদের

ঝুপড়ির দিকে। কয়েক পা এগোতেই ঝণ্টু, মিঠু আর বুলানের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল ওর।

কী বিদ্যেসাগর একটু আগে মালতির ঘর থেকে বেরোতে দেখলাম না তোকে? —প্রশ্নটা করে ঝণ্টু ইন্দ্রর প্রায় গায়ের কাছে এমন ভাবে দাঁড়ালো যাতে ও পাশ কাটিয়ে না যেতে পারে।

এই তিনটে ছেলেকে ভয় পায় না এমন মানুষ এ অঞ্চলে নেই। এরা কী ভাবে ওর-জীবনকে তছনছ করে দিতে চাইছে তা ইন্দ্র জানে। অন্যদের মত ইন্দ্র এদের ভয় পায় না। ভয় পায় না বোলেই ও ঝণ্টুকে বলতে পারল, হ্যাঁ ঠিকই দেখেছিস পথ ছাড়।—বলতে বলতে সামান্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ওকে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নিতে চায় কিন্তু সফল হয় না।

বুলান হাল্কাভাবে এতক্ষণ শিস দিচ্ছিল ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিস দে'য়া বন্ধ করে বলল, ওস্তাদ দরজা বন্ধ করে কী হচ্ছিল?

বুলানের কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি মিঠু গেয়ে উঠল, হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হ্যায় আউর চাবি খোঁ য্যায়।

বুলান মিঠুকে ধমকে থামাল, তারপর ইন্দ্রর কাঁধের উপর ডান হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, কলির কেষ্ট মাইরি—এধারে মালতি ওধারে মন্দিরা গুরু চালিয়ে যাও আমাদের কোনো আপত্তি নেই শুধু এক পাঁইটের ক্যাশ ছেড়ে যাও।

ইন্দ্র বলল, পয়সা আমার কাছে নেই থাকলেও দিতাম না।

দিতিস না কী-বে দেবো এমন যে…। বুলান এ পর্যন্ত বলার পরই একটা অশ্লীল খিস্তি আওড়ালো।

ইন্দ্র যদিও ওদের ভয়ে ভীত নয় তবু তিনজনের সঙ্গে যুদ্ধে নামার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই বলে ভাবতে থাকল কীভাবে ওদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। যখন একথা ভাবছে তখন হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসল যুধিষ্ঠির। এসে বুলানকে উদ্দেশ্য করে বলল, কী হয়েছে রে?

উত্তর দিল মিঠু, তোর ভাই একখানা জন্তর মাইরি দু'-দু'জনের সঙ্গে পেয়ার-মহব্বত করছে।

যুধিষ্ঠির এক দাবড়ানি দিয়ে ওকে থামাল প্রথম তারপর বলল, শালা আর একটা ডায়লগ যদি থ্রো করতে দেখি তাহোলে এমন ঝাড় দেব যে তোর ঘরের দেয়ালে ফুলের মালা লটকে ফটো হয়ে ঝুলবি।

এ-কী বলছ গুরু তুমিই ত' ইন্দ্রকে হিড়িক মারতে!—ঝণ্টু অবাক হোয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যুধিষ্ঠিরই আবার বলল, ফোট্ এখান থেকে ফের যদি কপচাস তাহোলে তোদের তিনজনকেই মেরে ভারতবর্ষের ম্যাপ বানিয়ে ছাড়ব।

এরপর ওরা তিনজনই আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস সঞ্চয় করতে পারল না। যুধিষ্ঠিরকে ওরা ভালমতনই চেনে ও যদি হাত চালায় তাহোলে এ তল্লাটে এমন

কেউ নেই যে ওর সঙ্গে পেরে উঠবে। শারীরিক শক্তি এবং সাহস দুটোই ওর অপরিসীম। আগে আরো ভয়ংকর ছিল ইদানীং কিছুটা সংযত করেছে নিজেকে। এর একমাত্র কারণ চুমকী। চুমকীর সঙ্গে ওর ভালবাসা হওয়ার পর থেকে কিছু কিছু বদ অভ্যাস ও ত্যাগ করেছে। আগে মেয়ে দেখলেই অশ্লীল কথা ছুঁড়ে দিত তাদের উদ্দেশ্যে। বুলান, মিঠু এবং ঝন্টুও থাকত ওর সঙ্গে। ওর ভয়ে মেয়েরা কাঁটা হোয়ে থাকত। যুধিষ্ঠির একদিন চুমকীর উদ্দেশ্যে একটা অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিল ভেবেছিল অন্যান্য মেয়েদের মত সেও ভয়ে মাথা নিচু করে চলে যাবে কিন্তু ও চলে যায়নি কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যুধিষ্ঠির অবাক হোয়ে তাকিয়ে থেকেছিল ওর দিকে, ভাবতেই পারেনি মেয়েটা ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। ওর দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ তার বোধগম্য হোলো না বোলে ও মূক হোয়ে অপেক্ষা করে থাকল পরবর্তী ঘটনার জন্য। ওর মনে তখন অনেক প্রশ্ন। মেয়েটা এরপর কী করতে পারে তা নিয়ে ও ভাবতে শুরু করল। কী করতে পারে তা হাজার ভেবেও আবিষ্কার করতে পারল না।

সামান্য কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর চুমকী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসল ওর কাছে। ওর কাছে বলা যায় এই কারণে যে চুমকীর দৃষ্টি তখন শুধুমাত্র ওর মুখের উপরই অনড় হোয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বুলান আর ঝন্টুর দিকে তাকাল একবার তারপর যুধিষ্ঠিরকে বলল, তোমার চামচাগুলোকে ফোটাও কয়েকটা কথা বলব তোমাকে।

যুধিষ্ঠির প্রতিবাদ করে উঠল, ওরা যাবে না যা বলার ওদের সামনেই বলতে হবে।

তাহোলে আমার পক্ষেও বলা সম্ভব হোচ্ছে না।—যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তর দিয়ে চুমকী চলে যাবার উদ্দেশ্যে কয়েক পা এগোলো।

যুধিষ্ঠির বুঝল চুমকীকে না আটকালে কথাটা শোনা হবে না সুতরাং ও বুলান আর ঝন্টুকে সরে পড়ার নির্দেশ জানিয়ে ওকে বলল, এবার বল কী বলবি ?

চুমকী জানালো কথাটা শুনতে হোলে ওকে লেকে যেতে হবে। যুধিষ্ঠির বুঝে উঠতে পারল না কী এমন কথা জানাবে যার জন্য তাকে লেকে যেতে হবে, বুঝতে না পারলেও কথাটা জানার আগ্রহে ও বিনা বাক্য ব্যয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

লেকে আসার পর চুমকী একটা গাছের নিচে বসে যুধিষ্ঠিরকে বসার জন্য অনুরোধ জানালো। যুধিষ্ঠির ওর নির্দেশ পালন করে বিরক্তি সহকারে বলল, নক্সা না করে যা বলবি তাড়াতাড়ি বল।

বলছি এতো ব্যস্ত হোচ্ছ কেন ?—চুমকী কথাটা বলে কিছুক্ষণ সময় নীরব থাকল, আসলে ওর বক্তব্য কী ভাবে বলবে তা নিয়ে ভাবল এরপর যুধিষ্ঠির আরো একবার তাড়া লাগাবার পর বলল, আমাকে কেমন দেখতে বলত যুধিষ্ঠিরদা ?

প্রশ্নটা শুনে চট করে উত্তর দিতে পারল না যুধিষ্ঠির শুধু চুমকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। চুমকী দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন একটু অন্যভাবে করল। এবার চুপ করে থাকল না ও, চমকিলি গুলাব কী মাফিক খুবসুরৎ।—বলে খ্যাক্ খ্যাক্ হাসল এরপর যখন খেয়াল হোলো ও কিছু একটা বলার উদ্দেশ্যে ডেকে এনেছে তাকে তখন হাসি বন্ধ করে বলল, কী বলতে চাইছিস বলত !

চুমকী আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল, তুমি খারাপ খারাপ কথা কেন বল যুধিষ্ঠিরদা ? তুমি যদি কথা দাও কখনো খারাপ কথা আর বলবে না তাহোলে তোমাকে একটা দারুণ কিছু দেব।

বেশ বলব না এবার বল কী দিবি ?

চুমকী উত্তর পাওয়ার পর চারপাশে চোখ রেখে দেখে নিল কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে কিনা যখন বুঝল সে সম্ভাবনা নেই তখন একটা হাত যুধিষ্ঠিরের চোখের উপর রেখে বলল, চোখ বন্ধ করে থাক।—বলে ওর গালের উপর তার ঠোঁট দুটো ছোঁয়ালো।

এমন অভাবনীয় কিছু ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যুধিষ্ঠির। ওর সমস্ত শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন বীণার ঝংকার—কেঁপে উঠল ও। সজোরে বুকের মধ্যে টেনে নিল চুমকীকে। এই ঘটনার পর ওর মধ্যে হোলো অনেক পরিবর্তন।

ব্যাপারটা বুলান, ঝণ্টু, মিঠুর জানতে বাকি থাকল না। ওরা বুঝল যুধিষ্ঠির মেয়েটাকে ভালবেসেছে। একদিন মিঠু চুমকীর শরীরের বিশেষ অবয়ব নিয়ে একটা অশালীন মন্তব্য করে বসল যুধিষ্ঠিরের কাছে। এর পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হোয়ে উঠেছিল তা জানতে এ অঞ্চলের কারো বাকি থাকেনি। মিঠু তিন মাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তার কৃতকর্মের কথা শুধু ভেবেছে হয়ত। এই ঘটনার পর বুলান, ঝণ্টু মিঠু এবং অন্যান্যরাও যমের মত ভয় করতে শুরু করেছে ওকে। এরই জন্য আজ যখন যুধিষ্ঠির বলল তাদের ভারতবর্ষের মানচিত্র বানিয়ে ছাড়বে তখন তা নীরবে হজম করে সরে পড়তে হোলো ওদের। ওরা চলে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলল, তোকে ওরা অপমান করার সাহস পেত না এর জন্য আমি দায়ী। আসলে আমি তোকে হিংসে করতাম, তোর উপর আমার রাগ হোত। তোর জন্য আমাকে বেশি খারাপ মনে হোত বলেই রাগ হোত। আমাদের এখানে ক'জন আর ভাল বল অথচ সবার চোখে যেন একমাত্র আমিই খারাপ। তুই লেখাপড়া না শিখলে এতটা খারাপ কেউ ভাবত না। বিশ্বাস কর এখন আর তোর উপর আমার একটুও রাগ নেই। তুই এত বেশি লেখাপড়া শিখে ফেলেছিস যে তোকে দেখিয়ে এখন আর আমাকে কেউ কিছু বলে না। যাক তুই আর এখানে থাকিস না যদিও ওরা কখনই তোকে কিছু বলতে আর সাহস পাবে বলে মনে হয় না তবু এ সময় এদিকটায় তোর থাকা উচিত নয়।

তুই যাবি না ?

এই সন্ধ্যেবেলা। এ সময় কবে আমাকে বাড়িতে দেখেছিস ?

এখন সন্ধ্যে ! রাত কখন তাহোলে ?

আমাদের ত' এটাই সন্ধ্যে, তুই আর কথা বাড়াস না বাড়ি যা। বলেই যুধিষ্ঠির আবার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

॥ চার ॥

প্রায় দিন পনের পর মন্দিরার সঙ্গে ইন্দ্রর দেখা হোলো। মন্দিরা প্রত্যেকদিনই আশা করে থাকছিল ওর সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু হচ্ছিল না। প্রত্যেকদিনই অবশ্য ইন্দ্রকে দেখতে পায় তবে ওদের যোগাযোগ দিন পনের বিচ্ছিন্ন হোয়ে ছিল। যেহেতু ওরা দুটি বিপরীত মেরুতে বাস করছে সেহেতু ইচ্ছে করলেই একজন অন্যজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। লোক নিন্দের ভয়ে তটস্থ হোয়ে থাকার মেয়ে মন্দিরা কখনই নয় তবু ঐ বস্তিতে গিয়ে ইন্দ্রকে ডেকে এনে কথা বলতে পারে না বিশেষ এক কারণে। ও জানে এখন ব্যাপারটা তার বাড়ির লোক জানলে ইন্দ্রর পক্ষে ক্ষতিকর হোতে পারে। তার বাড়ির লোক ইন্দ্রর সঙ্গে মিশতে দেখলে কী করতে পারে ভেবে ও ওদের বস্তির দিকে পা বাড়াতে ভরসা পায়নি। আর কিছুদিন পর ইন্দ্র চাটার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্ট হোয়ে যাবে তখন জানলে খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এই মুহূর্তে জানলে তার বাড়ির মানুষজন ওকে অপমান করতে পারে ভেবে ও বস্তিতে যাবার কথা ভাবেনি। মন্দিরা ইন্দ্রর সঙ্গে মিশে বুঝেছে ও খুবই ভাবপ্রবন। যদি অপমানিত হয় তাহোলে পড়া ছেড়ে দিতে পারে। সুতরাং চাইলেই ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবু ও চেষ্টা করেছে এ ক'দিন। পড়ে-টড়ে রাত করে বাড়ি ফেরে ইন্দ্র সুতরাং সে সময় কোনো মহিলার পক্ষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব নয় এই কারণে ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায় থেকেছে যদি বাড়ি ফেরার সময় ইন্দ্রর সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয় এই আশায় –হয়নি। আজকাল মন্দিরা নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এক এক সময় মনে হোচ্ছে ইন্দ্র ওর মনে ছড়াতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিছক বন্ধুত্বের কিনা তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে পারছে না। এই পনের দিন ও নিজের মনের ভেতরটায় যেটা অনুভব করেছে সেটাকে শূন্যতা না বলে অন্য কিছু বলা ঠিক হবে কিনা তা রীতিমত ভেবে দেখার বিষয় বলে মনে হয়েছে ওর। এই পনের দিন ওর মধ্যে অস্থিরতা ছিল। বার বার জানালার কাছে এসে ওর চোখ ইন্দ্রকে খুঁজেছে। আজ যখন আঁধার সবে নামতে শুরু করেছে সে সময় সন্ধ্যার সঙ্গে ও লেকগার্ডেন্সের প্রশস্ত সড়কের উপর দিয়ে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল বাস-স্টপেজে পৌঁছবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কথা বলতে বলতে ওরা

প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের কাছে চলে এসেছিল আর তখনই হঠাৎ সন্ধ্যা ইন্দ্রকে দেখতে পেল।

এই ইন্দ্র আসছে।—সন্ধ্যা কনুই দিয়ে সামান্য আঘাত করে মন্দিরার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

কথাটা শুনে মন্দিরার হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। একটা খুশির ঝরনা যেন নেমে এলো মনের মাঝে। সামান্য কেঁপে উঠেছিল ও সেটা সন্ধ্যার চোখে ধরা পড়ে গেল। ও মন্দিরার অবস্থা দেখে বলল, তোর মনের এই হাল অথচ আমাকে কিছু জানাসনি পাজী মেয়ে। ও ত' সি-এ করছে সুতরাং ওকে নিয়ে তোর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় পাশ করে বেরোলে ও কোথা থেকে এসেছে সে প্রশ্ন কেউ করবে না, চালিয়ে যা।—বলতে বলতেই হাসল সন্ধ্যা তারপর ইন্দ্রর নাম ধরে জোরে ডেকে উঠল।

ইন্দ্র নিজের মধ্যে ডুবে থেকে হেঁটে আসছিল বাস থেকে নেমে হঠাৎ তার নামটা বামা-কণ্ঠে উচ্চারিত হোতেই ও দৃষ্টি সামনে প্রসারিত করল। করে ওদের দু'জনকে দেখতে পেল। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছে চলে এলো।

ইন্দ্র ওদের কাছে পেঁছিতেই সন্ধ্যা বলল, জ্ঞানার্জন করে ফিরছেন সম্ভবত?

ইন্দ্র ঘাড় নেড়ে বক্তার অনুমান যে নির্ভুল সেটা জানাল।

খুব তাড়া আছে? আমি বলতে চাইছি একটু দেরি করে বাড়িতে ফিরলে কী খুব বেশি অসুবিধা হবে?

ইন্দ্র সন্ধ্যার কথা শুনে তাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে বলল, আপনার কথা শুনে মনে হোচ্ছে আমাকে দেখে আপনি বুঝে ফেলেছেন অনেকক্ষণ মুখে কিছু দে'য়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

মন্দিরা এবার ওর কথার উত্তর দিল, অনেকক্ষণ বলতে কতক্ষণ?

পাঁচ-ছ' ঘণ্টা হবে, বেশিও হোতে পারে।

সেকি এতক্ষণ না খেয়ে আছেন!—কথা বলতে বলতে মন্দিরা ঘড়ির উপর চোখ রাখল।

এ নিয়ে ভাববেন না আমাদের মধ্যে খাদ্য ও খাদকের মধ্যে দেখা হওয়ার কোনো সঠিক নিয়ম নেই, নিরাসনে কত দিন কত রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে তা বসে শেষ করা যাবে না। আপনাদের সঙ্গে দেখা হোয়ে যাওয়াতে ভাবলাম এমন সুযোগ হাতছাড়া করি কেন তাই লজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা বলে ফেললাম। কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট কথাটা যে কত বড় সত্যি তা ত' নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

না, পাচ্ছি না। আমরা আপনার বন্ধু বলেই বলতে পারলেন না হোলে কী পারতেন?—ইন্দ্রর কথার পৃষ্ঠে কথা বলল সন্ধ্যা।

চলুন এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।—বলে মন্দিরা অগ্রসর হওয়ার জন্য পা বাড়ালো।

ওরা রেস্তরাঁ হোয়ে লেক রোডে আসল। আসার পর সন্ধ্যা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। ইন্দ্র আর মন্দিরা হাঁটতে হাঁটতে লেকে চলে আসল। লেকে আসার পর মন্দিরা বলল, এখানে কিছুক্ষণ বসব চলুন ঐ গাছটার নিচে বসি।—বলে ও হাতের ইশারায় একটা গাছের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালো ইন্দ্রর।

ইন্দ্র ওর নির্দেশ পালন করে গাছটার নিচে বসে বলল, আপনার পরীক্ষা সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে এ সময়ে এ ভাবে······

বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকার মেয়ে আমি নই যা পড়ছি তাতে ফেল করব না, ভাল রেজাল্ট করার বাসনা বিন্দুমাত্র নেই আমার। এখন লেখাপড়ার কথা থাক।

থাকবে ?

হ্যাঁ। আপনার ফাইন্যালের একটা গ্রুপ ডিসেম্বরে দিচ্ছেন ত' ?

ইন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। তাকাল বটে কিন্তু মন্দিরার কথার উত্তর দিল না।

মন্দিরা উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ থেকে বলল, কী ব্যাপার আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না কেন ?

লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন ত' আপনার করার কথা নয় ? ডিসেম্বরেই দেব। আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।

কী কথা ?

আমাদের বন্ধুত্ব কত দিন অটুট থাকবে।

হঠাৎ একথা ভাবার কারণ ?

আমাদের মধ্যে ব্যবধান ত' অনেক তাই ভয় হয় এমন বান্ধবীকে না কোনোদিন হারিয়ে বসি। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে বার বার আমার মনে উদয় হয়েছে একটা প্রশ্ন এমন অসম বন্ধুত্ব কেন হোলো, না হোলেই ভাল হোত, বন্ধুত্ব হওয়ার পর শুধু আপনার জন্য ভয় হোত, আমার জন্য যদি আপনার মান-সম্মান হারাতে হয় এই ভয়ে বুক কাঁপত। রাগও হোত আপনার উপর এত মানুষ থাকতে আমার মত একজন সর্বহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত হয়নি আপনার। এখন শুধু নিজের কথা মনে হয়।

কী মনে হয় ?

এমন বান্ধবীকে হারাতে চাই না। এখন মনে হয় আপনি সরে গেলে সব দিক থেকেই নিঃস্ব হয়ে যাব। এই ভয়ে আমার মধ্যে কী যে হয় তা আপনাকে বোঝাতে পারব না !

বিশ্বাস করা শক্ত।

পনের দিনে যে মানুষের মনে তার বান্ধবীর কথা একবারের জন্য উদয় হয়নি তাকে বিশ্বাস করি কী করে !

হয়নি কে বলল আপনাকে ? অনেকবার হয়েছে কিন্তু আপনার দেখা পাওয়ার কোনো উপায় খ‍ুঁজে পাইনি।

আচ্ছা ইন্দ্র বন্ধুত্বের সীমারেখাটার শেষ কোথায় বলুন ত' ?

জানি না, কেন এ প্রশ্ন হঠাৎ ?

সে সীমারেখা আমরা ইতিমধ্যে অতিক্রম করে গেছি কিনা ভেবে দেখেছেন ?

কী বললেন বলুন ত' ? আপনার বক্তব্য আমার বোধগম্য হোচ্ছে না।

মন্দিরা প্রশ্নের উত্তর দিল না শুধু ওর চোখ দুটোতে ফুটে উঠল অব্যক্ত ভাষা। সে ভাষা এক সময় তরল হোয়ে অপাঙ্গকে সিক্ত করে ফেলল।

ইন্দ্র কথাটা বলে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বসেছিল। দিনের আলো আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল সেই সঙ্গে আঁধারের আঁচল নেমে আসছিল নীলাম্বরের বুক থেকে। আলোর বিদায়ের আর অন্ধকারের আগমনের দৃশ্যটা ইন্দ্রর চোখকে টেনে রেখেছিল। ঐ ভাবে বসে ও মন্দিরার উত্তরের অপেক্ষায় থাকল কিছুক্ষণ যখন ও বুঝল উত্তর আসার সময় অতিক্রান্ত হোয়ে গেছে তখন ও ঘাড় ঘোরাল, ঘুরিয়েই ও অবাক। মন্দিরার চোখে জল দেখে ও বলল, আপনি কাঁদছেন ? কিন্তু কেন ?

হঠাৎ মন্দিরা ইন্দ্রর জামার দুটো পাশ চেপে ধরে বলল, তুমি কেন বুঝবে না ইন্দ্র এখনো কেন বুঝবে না ?—বলে ও ইন্দ্রর জামা থেকে হাত সরিয়ে নিল, নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের কোল থেকে জলের দাগ তুলতে শুরু করল।

এ কী করলে ! এমন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত তুমি নিলে কেন মন্দিরা ?

সিদ্ধান্ত কেন নিতে যাব আমিই কী কখনো ভেবেছিলাম এমন হবে। ভালবাসব বলে ভালবাসা যায় না আবার ভালবাসব না ভেবে রাখলেও ভালবেসে ফেলতে হয় শেষ পর্যন্ত সুতরাং সিদ্ধান্ত নে'য়ার প্রশ্নই ওঠে না। পনেরটা দিন শুধু নিজের মনের ভেতরটা দেখেছি, দেখেছি তুমি আছ মন জুড়ে, বার বার তোমাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টা আমার শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

এবার কী হবে মন্দিরা ?

কী হবে মানে ? তুমি পাশ করে বেরোও তারপর দু'জন একসঙ্গে পথ চলব।

তোমার সমাজ মেনে নেবে না।

কেন মেনে নেবে না তুমি ত' শিক্ষিত এবং পরিবর্তিতও।

ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছ। তোমাদের সমাজ শিক্ষা দেখে না, পরিবর্তন দেখে না তারা দেখে অতীত। যখনই জানবে আমি কোথা থেকে এসেছি তখনই তারা দূরে ঠেলে দেবে, সমাজের দরজাটা মুখের উপরই বন্ধ করে দেবে। অবশ্য সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই শুধু তোমার কথা ভাবছি। এমন নির্বাসন তুমি মেনে নিতে পারবে না।

কেন পারব না নিশ্চয়ই পারব। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে যদি শমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিতে হয় তাহোলেও তা করে নিতে পারব বোধহয়।

শুধু তোমাকে নিয়েই আমি সমাজ গড়ব—নতুন সমাজ। সমস্ত মানুষের সমাজকে দেখাব দু'জনের সমাজ যে সমাজের অতীত থাকবে না, স্পর্শকাতরতা থাকবে না, রক্ষণশীলতা থাকবে না।

ইন্দ্র মন্দিরার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, চল এবার ফিরি।

মন্দিরা ওর বুকের উপর মাথাটা নামিয়ে এনে বলল, এমন ভাললাগা সময়টা অনন্তকালের হোতে পারে না ইন্দ্র ? ঘর থাকবে না সমাজ থাকবে না কোনো কিছুই থাকবে না শুধু আমরা দু'জন এভাবে অনন্তকাল বসে থাকব।

ইন্দ্র হাসল, বলল, আমার উপর বিশ্বাস রাখ মন্দিরা তোমাকে আমি সমস্ত অন্তর জুড়ে রাখব। আর ন'দশ মাস পর একসঙ্গে পথ চলব কিন্তু আজ আর নয় চল বাড়ি ফিরে যাই এখন।

চল।—বলে মন্দিরা উঠে দাঁড়াল।

ইন্দ্রও উঠে পড়ল। এরপর ওরা কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ হেঁটে এলো। ট্রেনলাইনের কাছাকাছি এসে মন্দিরা প্রশ্ন করল, কাল দেখা হবে আমাদের ?

তোমার পরীক্ষা কবে ?

সোমবার।

তাহোলে কাল নয় তোমার পরীক্ষার পর দেখা হবে তার আগে নয়।

তোমার সঙ্গে দেখা না হোলে পরীক্ষা আমি দেবই না প্রত্যেক দিন না হোলেও অন্তত সপ্তাহে দু'দিন তোমার দেখা পেতে চাই, এবার ভেবে দেখ আমি পরীক্ষা দি সেটা তুমি চাও কিনা।

এরপর বলি কী করে দেখা করব না, কখন কোথায় দেখা হবে বল।

মন্দিরা জানালো কোথায় এবং কবে দেখা হবে। সময়টার কথা মনে মনে হিসেব-নিকেষ করে বলতে গিয়েও না বলে ইন্দ্রর কখন সময় হবে জেনে নিল প্রথম তারপর তার মনে মনে নির্ধারণ করা সময়ের কিছু পরিবর্তন করে জানালো ওকে। জানিয়ে আর বিলম্ব না করে ঢাল বেয়ে ট্রেনলাইনে উঠে এলো।

যে জায়গা পর্যন্ত দু'জন একসঙ্গে এসেছিল এবং যেখান থেকে মন্দিরা একা চলে গিয়েছিল সে জায়গায় ইন্দ্র কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে গেল তাদের ঝুপড়িটার দিকে।

ট্রেনলাইন পেরিয়ে ঝুপড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় মন্দিরার পুটুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। পুটু ওকে দেখে ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটকে চেপে হেসেছিল এবং কিছু একটা বলতে গিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। কী বলতে গিয়েও বলতে পারেনি তা মন্দিরার জানা হয়নি। বাড়ি ফিরে আসার পথে ও ভাবতে চেষ্টা করল কী কথা পুটু বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। যে কথা বলতে চেয়েছিল ও সে কথা তার জানা হয়নি বটে তবে ওর বুঝতে অসুবিধা হয়নি ইন্দ্রর আর তার বিষয়েই কিছু বলতে

চেয়েছিল। ইতিপূর্বে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে পুটু সেইজন্যই মন্দিরার মনে হয়েছিল ওদের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে ওর। পরে তার মনে হয়েছিল পুটুকে ডেকে কথাটা জানা উচিত ছিল। সম্ভবত কয়েক পা এগিয়ে এসেও পুটু তার মনের কথা প্রকাশ করার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। পুটুকে নিয়ে কিছু সময় ভাবার পর ও ইন্দ্রকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। ও যখন ফিরে এলো তখন বাড়ি ভর্তি মানুষ। ছোট মাসি, ছোট মেসো আর ওর তিন মাসতুতো ভাই-বোন তার বাবা-মা'র সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে। ওরা সকলেই দিল্লিতে থাকে শুধু লিপি কলকাতায় থাকে, বড় মাসির কাছে। মাঝে মাঝে ও দু'চারদিন মন্দিরাদের বাড়িতেও থেকে যায়। যেহেতু লিপির বয়স প্রায় মন্দিরারই মত সেহেতু ওদের মধ্যে সম্পর্কটা বন্ধুর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ক'দিন পূর্বে লিপি জানিয়ে ছল ছোট মাসিরা কলকাতায় আসছে কিন্তু আজকের দিনটিতেই যে আসবে এরকম কথা বলেছে বলে ওর মনে পড়ল না। ছোট মাসিরা কলকাতায় আসলেই বড় মাসিদের কাছেই ওঠে প্রত্যেকবার এবারও নিশ্চয়ই উঠেছে। উঠে থাকলেও আজই যে এসেছে তারা এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই ওর কারণ আজ না এসে অন্যদিন আসলে ফোনে খবর পেয়ে যেত ওরা। মন্দিরা ঘরে ঢুকতেই ছোট মাসি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে মন্দিরা কত বড় হোয়ে গেছিস! মাত্র তিন বছর কলকাতায় আসিনি এই তিন বছরে কলাগাছের মত বেড়ে উঠেছিস।— এ পর্যন্ত বলেই ছোট মেসোর দিকে ফিরে বললেন, তিন বছর আগে একটুখানি ছিল —না ?

প্রশ্ন শুনে ছোট মেসো বললেন, তখন লিপিও ত' ঐ রকমই ছিল।

ছোট মাসি সঙ্গে সঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ জানালেন, না-না আমার মনে হোচ্ছে মন্দিরা বেশি বেড়ে উঠেছে যেন তালগাছ।

এবার লিপি তার মা'র কথার পৃষ্ঠে কথা বলল, ও ত' বরাবরই আমার থেকে লম্বা মা, শুধু লম্বাই নয় ওর স্বাস্থ্যও ভাল। দেখার মত ফিগার ওর।—বলে লিপি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়েই মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, মা-বাবা কলকাতায় থাকছে ক'দিন পরে কথা বলিস, চল ছাদে যাই।—কথাটা বলেই ও মন্দিরার হাতটা ধরে টান লাগল।

মন্দিরা ছোট মাসি আর ছোট মেসোর সঙ্গে কথা না বলে ঘর থেকে বেরোতে চাইছিল না কিন্তু লিপি সে সুযোগ ওকে দিল না টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। ঘর থেকে বার করে আনার পর লিপি বলল, তোকে অকারণে বার করে আনিনি কথা আছে। ছাদে চল আগে তারপর বলব।

ওরা ছাদে এসে কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। কার্নিশে পিঠ ঠেকিয়ে লিপি মন্দিরার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকল।

হাসির কারণ বোধগম্য হোলো না মন্দিরার তাই ও বিস্মিত হোয়ে বলল, কী হোলো এভাবে হাসছিস কেন ?

কতদিন হোলরে ?—প্রশ্ন করার সময়ও লিপির ঠোঁটে চাপা হাসি ভেসে থাকল।

কী কতদিন হোলো ?—লিপিকে হাসতে দেখে মন্দিরা বিস্মিত হয়েছিল এবার ওর প্রশ্ন শুনে রীতিমত অবাক। এরকম প্রশ্নের উত্তর হয় না কারণ প্রশ্নটা কোন দিক থেকে আসছে তা বোঝার উপায় নেই।

ন্যাকা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস ভেবেছিস শিবের বাবাও টের পাবে না, ছেলেটা কে ?

সঠিকভাবে না বললে জানব কী করে কার কথা জানতে চাইছিস।

তুই খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছিস কার কথা বলছি তবু বলি যে ছেলেটার কথা বললাম তাকে দেখতে ঠিক সিনেমার নায়কদের মত, দারুণ হ্যান্ডসাম। কী নামরে ওর ?

মন্দিরা বুঝল ইন্দ্রর কথা বলছে ও। ওর কথা বলা যায় না লিপিকে তাই ও বলল, তুই বোধহয় রূপকুমারের কথা বলছিস !

যে ছেলের কথা বললাম তার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা যে গভীর তা আমার জানতে বাকি নেই এবার বল সেই ছেলেই রূপকুমার ত' ?

যদি বলি হ্যাঁ ?

তাহোলে বল ও কী করে।

সি-এ ফাইন্যাল দেবে।

লিপি প্রায় লাফিয়ে উঠল শুনে, বলল, তাহোলে ত' সমস্যাই নেই মেজো মেসো আর মেজো মাসি মত দিয়েই দিয়েছে ধরে নে। আমার মাঘ মাসে বিয়ে ঠিক হোয়ে গেছে মেজো মাসিকে বলি তোরটাও একসঙ্গে লাগিয়ে দিতে।—বলেই ও ছুটে নিচে নামতে শুরু করল।

মন্দিরা ওকে আটকাবার চেষ্টা করল, করলে কী হবে কোনো ভাবেই ওকে আটকে রাখা গেল না। লিপি নিচে নেমেই মন্দিরার মা-বাবা এবং আরো যারা ঘরে ছিল তাদের সামনেই কথাটা পেড়ে বসল। শুধু এইটেই রক্ষে ইন্দ্রর নামটা জানায়নি ওকে জানালে সেটাও জানত তারা। ইন্দ্রকে সম্ভবত বাড়ির মানুষরা চেনে কারণ মানদা ওর গল্প এ পরিবারের প্রত্যেককেই শুনিয়েছে। মানদাদের সকলের মুখে মুখেই আজকাল ইন্দ্রর কথা। আজ ও তাদের গর্ব তাই ওরা ওর কথা না বলে পারে না। নিরক্ষর হওয়ার জন্য ও কতটা শিক্ষিত হোয়ে উঠেছে এবং কতটা শিক্ষিত হোতে চলেছে তা মানদা জানে না শুধু জানে ও বাবুদের মত শিক্ষিত হোয়ে উঠেছে। সে কথা এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছে যে কতবার বলেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এর জন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাড়ির প্রত্যেকে না হোলেও অন্তত ওর মা এবং বৌদি ইন্দ্রকে চেনে। মন্দিরা ভেবে পেল না এখন কী করবে। দু' মিনিট যেতে না যেতেই ওর ডাক পড়ল। প্রথম সুদেষ্ণাদেবী ওর নাম ধরে ডাকলেন সেই সঙ্গে লিপির কণ্ঠও ভেসে আসল। কী প্রশ্ন করা হোতে পারে ওকে তা নিয়ে

ভাবতে ভাবতে খুব মন্থর গতিতে সিঁড়ির কাছে আসল, এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেক দুশ্চিন্তার মেঘ ওর মনের মধ্যে ভীষণ ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্রর কথা প্রকাশ হোয়ে পড়লে ওর পড়ার ক্ষতি হোতে পারে ভেবে ও এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকল। লিপি দু' একবার ওর নাম ধরে ডেকেই উপরে উঠে আসল এবং ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসল। যে ঘরে সকলে ছিল সে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে লিপি বলল, আসামীকে হাজির করে দিলাম এবার জেরা করার পালা তোমাদের।—বলেই সোফার একটা কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল।

সুদেষ্ণাদেবী মন্দিরাকে বললেন, লিপি যা বলল তা সত্যি!

উত্তর কী দেবে ভেবে পেল না মন্দিরা। মনে মনে ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছিল কোনো অবস্থাতেই ইন্দ্রর কথা প্রকাশ করবে না এখন। যতদিন না ও পড়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে ততদিন ওর কথা গোপন রাখবে। আজ যে অবস্থার সম্মুখীন হোতে হোলো তাতে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এটা ও ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারল। মায়ের প্রশ্নের উত্তর কী ভাবে দেবে ভাবতে ভাবতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝের উপর অদৃশ্য অর্ধবৃত্ত এঁকে যেতে থাকল।

ছেলেটা কী চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট ?—সুদেষ্ণাদেবী ওর নীরবতার মধ্য থেকেই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

মন্দিরা এবার আর নিরুত্তর থাকতে পারল না, বুঝল এখন কিছু না বলার পরিণাম ভাল হবে না ; যে ভাবেই হোক এ সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। পাশ কাটিয়ে যেতে হবে সুকৌশলে প্রসঙ্গটা। কিছুদিন বাড়িব মানুষজনকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, কোনো ভাবেই তাদের বেশি কৌতূহলী হোতে দেবে না। এ কথা ভেবে ও জবাব দিল, এখনো নয়।—জবাব দিয়েই পালাতে চাইল ও।

কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া।—মন্দিরাকে ধমকে দাঁড় করালেন সুদেষ্ণাদেবী। এরপর ও দাঁড়িয়ে পড়ার পর বললেন, কবে পাশ করে বেরোবে! ওদের পদবী কী?

মায়ের প্রশ্ন শুনে ও ভেতরে ভেতরে তেতে উঠছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও শান্ত এবং সংযত ভাবে উত্তর দিল, ডিসেম্বরের মধ্যে ফাইন্যালের দুটো গ্রুপ কমপ্লিট হবে হয়ত।—প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ও সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দিল। দিয়ে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তার ঘরে চলে আসল।

সুদেষ্ণাদেবী নিঃশব্দে চোখের মাধ্যমে তপতীদেবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওকে অনুসরণ করার জন্য, শুধু অনুসরণ করাই নয় আরো কিছু নির্দেশ ছিল। যে ছেলের কথা লিপি বলেছে তার সম্বন্ধে আরো একটু বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইছেন তিনি। শাশুড়ী কী বলতে চাইছেন বুঝতে পেরে তপতীদেবী মন্দিরার পিছু পিছু চলে এসেছিলেন। ওর ঘরে ঢুকে খাটের এক পাশে বসে বললেন, দেখলে তো যা বলেছিলাম তাই হোলো। ইন্দ্র সি-এ করছে! ভাবাই যায় না, এমন ছেলে

তোমার বাবা-মা হাজার চেষ্টা করলেও জোগাড় করতে পারত না কিন্তু হোলে কী হবে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে তারা রাজী হবে না। কী করবে মন্দিরা?

মন্দিরা বলল, তোমাকে যদি একটা অনুরোধ করি রাখবে?

শুনি আগে তারপর ভেবে দেখব। আগেই জানিয়ে রাখি তোমাদের কোনো ভাবেই সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

তোমাকে কোনো সাহায্য করার অনুরোধ জানাব না শুধু তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আর কয়েকটা মাস তুমি ইন্দ্রর কথা মা-বাবার কাছে পেড়ে বসবে না। ও পাশ করে বেরোলে আমরা বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাব। বৌদি একটা কথা শুনবে! ইন্দ্র ইচ্ছে করে ও ঘরে জন্ম নেয়নি সুতরাং জন্মের জন্য ওকে দায়ী করা কোনো ভাবেই ঠিক হ'ব না। একটা মানুষ যে নিজের চেষ্টায় শিক্ষার আলো জেলে তার মনের সমস্ত অন্ধকারকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছে তাকে আহ্বান না জানানোটা যে কত বড অন্যায় তা কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। এরকম একটা অন্যায়কে আমি কখনই সহ্য করতে পারব না বৌদি।

তুমি সত্যি কি ওকে ভালবাস মন্দিরা? নাকি ওর উপর অবিচারের কথা ভেবে প্রতিকার করার কিম্বা প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ওরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

ভালবাসা না থাকলে কোনোটাই সঠিক ভাবে করার কথা মনে হবে না বৌদি। আর একটা কথা—একটু আগে তোমাকে বললাম তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হবে, তুমি সবাইকে বোঝাও প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বল য'তে কয়েকটা মাস আমাকে তারা বিব্রত না করে এবং আর কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশা না করে। কয়েকটা মাস তাদের ঠেকিয়ে রাখ যাতে ইন্দ্র নির্বিঘ্নে তার পড়া শেষ করে ফেলতে পারে। কী বৌদি এই উপকারটুকু করবে ত'?

তপতীদেবী বললেন, চেষ্টা করে দেখব। তুমি কাজটা ঠিক করছ কিনা বুঝে উঠতে পারছি না। ইন্দ্র খুব ভাল ছেলে কিন্তু যেখানে ওর শৈশব থেকে যৌবন-কাল পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে সেখানকার প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া সহজ নয়। সুতরাং ওর সঙ্গে সমস্ত জীবন অ্যাডজাস্টমেণ্ট হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারছি না।

মন্দিরা হেসে উঠল তপতীদেবীর কথা শুনে, বলল, বাঃ বৌদি কী যুক্তি! এবার আমি একটা প্রশ্ন করি তোমাকে ও সি-এ হওয়ার পর কাকে জীবনসঙ্গিনী করবে, কার সাথে বিয়ে হওয়া উচিত? ওদেরই একজনের সাথে? এর অর্থ একজন চাটার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্টের স্ত্রী যে হবে সে হয় কখনো বাড়ি বাড়ি বাসন মাজত না হয় কোনো অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই ত'?

তপতীদেবী ওর কথার উত্তর দিতে গিয়ে কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললেন, তা নয় তবে আমি ত' শুধু তোমার কথা ভাবছি।

স্বার্থপরের মত!

প্রতিবাদ জানাবার মত ভাষা তপতীদেবীর কণ্ঠে স্থান পেল না শুধু দুর্বল কণ্ঠে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলেন। তার সে চেষ্টা সফল হোলো না। অস্ফুট কিছু পদ বেরোল তার মুখ দিয়ে বটে কিন্তু তা অন্যের কানে ত' দূরের কথা নিজের কানেই ঠিক মত পেঁছিল না সম্ভবত।

বৌদি আর নয় আমাকে একটু একা থাকতে দাও।—মন্দিরা যে যথেষ্ট উত্তেজিত তা প্রকাশ পেল তার বক্তব্যে! কথা শেষ করে নিজেকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে এলো পশ্চিমের জানালাটার কাছে। ওর মনে হোলো বড় নিঃসঙ্গ হোয়ে পড়ছে ও যেন এখনই বাড়ির মানুষজন অনেক দূরে সরে সরে যাচ্ছে, এমন একাকিত্ব এর আগে মনে হয় নি। এই একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার যেন একটাই উপায়, পশ্চিমের জানালাটার কাছে দাঁড়ালেই সমস্ত নিঃসঙ্গতা দূর হোয়ে যাবে। মন্দিরার মনের ভেতর এরকম কথার প্রতিধ্বনি হোলো যেন। জানালার কাছে এসে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে জানালার পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে তপতীদেবী তখনো দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ও বলতে গেল, মা-বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ইন্দ্রর কথা আমার কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে জেনে নিয়ে তাদের বলার কথা সম্ভবত কিন্তু তার সম্বন্ধে কিছু বলা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কী বলবে তাদের কাছে যাবার আগে ঠিক করে যেও। যা বলতে চেয়েছিল ও তা বলা হোলো না, লিপি এসে ঢুকল মন্দিরার ঘরে। ওকে দেখেই মন্দিরা তাড়াতাড়ি খাটের কাছে সরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সরে না আসলে নিঃসন্দেহে লিপি এসে দাঁড়াত তার পাশে, দাঁড়ালে তার চোখ অবশ্যই পেঁছে যেত ঝুপড়িগুলোর উপর। ও ইন্দ্রকে দেখে ফেলত হয়ত কথাটা মনে হোতেই মন্দিরা সরে এসে খাটের একপাশে বসে ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, বোস যদিও তোকে আমার বসতে বলতে ইচ্ছে করছে না মনে হোচ্ছে তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই ভাল হোত।

খুব চটেছিস দেখছি,—বলেই লিপি তপতীদেবীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আচ্ছা বৌদি তোমার কী মনে হয় আমি অন্যায় করেছি? ওকে ত' একদিন জানাতেই হোত আমি না হয় দু'দিন আগেই জানিয়ে দিয়েছি এই ত'? জানিয়ে খারাপটা কী হয়েছে বলত? সেজো মাসি ত' রীতিমত খুশি হয়েছে বলে মনে হোলো। আমাকে বলেছে মন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে। মেজো মেসোও যে খুশি তা তার মুখ দেখে বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। খুশি হবে নাই বা কেন বল একে ছেলেটা সি-এ করছে তার উপর শুনেছে পাল্টি ঘর। শুধু কী তাই যখন শুনেছে ওর চেহারা নায়ক নায়ক তখন আমার মা বলেছে, আমাদের মন্দিরা খুব বুদ্ধিমতী...

মন্দিরা ধমকে উঠল, তুই চুপ করবি না বক বক করেই যাবি?

লিপি গলার স্বরের তারতম্য ঘটিয়ে ভারি করে নাটকীয় ভাবে বলল, চুপ করা সম্ভব নয় বেবি কারণ প্রাথমিক তদন্ত করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। মিঃ রূপকুমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে হবে, কমপ্রিহেনসিভ ডিসকাশন ছাড়া

সব কিছু জানা সম্ভব নয় সুতরাং বক বক ত' করতে হবেই বন্ধু।—এরপর তপতী-দেবীকে বলল, বৌদি এখন কেটে পড়ত আমাকে আমার মহান দায়িত্বটুকু পালন করতে দাও।

তপতীদেবী মন্দিরার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছিলেন। লিপির সান্নিধ্যে ও যে খুবই অস্বস্তি অনুভব করছে তা বুঝে লিপিকে কিছু বলবেন কিনা ভাবলেন একবার। চোখের কোণ দিয়ে মন্দিরার দিকে তাকালেন তারপর শুধু বলতে পারলেন, ওর পরীক্ষা ওকে বেশি বিরক্ত কোরো না লিপি।

পরীক্ষার কথা কী বলছ! বড় পরীক্ষাই ত' দোরগোড়ায় সে পরীক্ষা ছেড়ে অন্য কোনো পরীক্ষার কথা ভাবার দরকার নেই এখন, আমি খুব বেশিক্ষণ কথা বলব না দু' চার মিনিট কথা বলেই চলে যাব।

এরপর তপতীদেবী আর কিছু বলতে না পেরে চলে গেলেন। তার চলে যাওয়ার অপেক্ষাতেই লিপি কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল চলে যেতেই বলল এবার বল।

কী বলব ?—মন্দিরা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না এখন তার কী করা উচিত। ইন্দ্রর সম্বন্ধে যা জানিয়েছে তার বাইরে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। আজ ফিরে আসার পর ও ভেবেছিল শুধু ইন্দ্রকে নিয়ে ভাববে। আজকের ওর সঙ্গে তার প্রতিটা মুহূর্তের ঘটনা মনের পর্দায় ভাসিয়ে তুলবে। এমন পূর্ণ হয়ে ছিল আজ সে বাড়ি ফেরার পর এরকম একটা ঘটনার সম্মুখীন না হোতে হোলে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারত ও। সুখের তরণী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত ভবিষ্যতের ভাল-লাগার মোহনার দিকে। প্রথম দিকে ইন্দ্র ওকে কৌতূহলিত করেছিল। দারিদ্র-সীমার নিচে থেকে, যারা ঐ ঝুপড়ির মধ্য থেকে জগতটাকে দেখে তাদের ভালমন্দ সুখ-দুঃখ সব ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ট্রেনলাইনের ধার ঘেঁষে বড়-জোর আধ কিলোমিটার তাদের জগতের সীমানা। এর বাইরে এরা অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। যেটুকু সুখ ওদের সঙ্গী তা ঐ চৌহদ্দির মধ্যেই তার বাইরে ওরা অ-সুখী। হাজার মানুষের সন্দেহ ওদের ঘিরে—ওরা অমানুষ, অসৎ এবং আরো ভয়ঙ্কর কিছু। কলকাতার সামান্য একটু জায়গায় ওরা আলাদা এক জগৎ তৈরি করেছে। আলাদা সমাজ তৈরি করেছে। এদের একমাত্র সঙ্কল্প টিকে থাকা। প্রত্যেকটি দিন শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। বেঁচে থাকাটাই যেন একমাত্র কাজ। অন্য কিছু ভাবার সুযোগও নেই অবকাশও নেই। এই জগতের একজন ইন্দ্র যে বুঝেছে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বাঁচার কোনো অর্থই হয় না আর একজন পুটু যে দেখতে চায় তাদেরই একজন মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে। ইন্দ্র আজ অনেক বড় হয়েছে, শুধু নিজেই বড় হয়নি ওদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে। এখন অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে নিজেদের নিয়ে। অনেকেই আগামী দিনে আরো ইন্দ্র আসবে তাদের মধ্যে এ আশায় দিন গুনছে। ছেলে-মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। যে মানুষ ঐ জায়গায় থেকে এতটা এগোতে পারে তাকে নিয়ে না ভেবে পারেনি মন্দিরা। এরকম একজনকে জানবে বলে ও নিজে

থেকে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করেছে। তখন শুধু ভেবেছিল ওকে জানবে। এর বেশি কিছু ভাবেনি। আলাপ হওয়ার পর ও ইন্দ্রকে জানতে গিয়ে বুঝেছে এ মানুষ তাকে ভরিয়ে দিতে পারে। ও মানুষটাকে ভাল না বেসে পারেনি। বুঝেছিল ওর মন জুড়ে শুধু ইন্দ্র। রক্তের অণু-পরমাণুর মধ্যে যেন ও ছড়িয়ে আছে। ওর মনে হোচ্ছে সে যেন ইন্দ্রর প্রতিবিম্ব। ওকে বাদ দিলে তার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। পনের দিন ধরে শুধু এ কথাই মনে হযেছে ওর। এসব কথা লিপিকে বলা যায় না। বলা যায় না বলে ও শুধুমাত্র বলতে পারল কী বলার থাকতে পারে তার। আসলে অনেক কথাই অনুচ্চারিত থাকবে বলে ঐ একটি মাত্র প্রশ্ন করে লিপিকে পাশ কাটাতে চাইল মন্দিরা।

কী বলব-কী বললে চলবে অনেক কথাই বলতে হবে, কী ভাবে আলাপ, কে আগে এগিয়েছে তুই না ও, কোথায় থাকে, কে কে আছে বাড়িতে ইত্যাদি ইত্যাদি, নে শুরু কর।—লিপি কথা বলতে বলতে একটা বালিশ টেনে কনুয়ের নিচে নিয়ে সামান্য কাৎ হোয়ে বসল।

মন্দিরা ওর কাছ থেকে পালাবার উপায় খুঁজছিল কিন্তু যখন সব রকম প্রয়াস চালাবার পর ব্যর্থ হোলো তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে অন্য কথা বলল, তুই কোথায় দেখেছিস আমাদের? আমাদের সম্পর্কটা তোর জানার কথা নয় জানলি কী করে?

তোদের লেকে দেখেছি। ঐ জায়গায় না দেখলে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ থাকত। কবে দেখেছি বলব?—প্রশ্নটা করে লিপি চোখ বন্ধ করে দিনটা মনে করার চেষ্টা করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পেরে বলল, মনে পড়ছে না তবে মাস দুয়েক আগে কোনো একটা ছুটির দিনে দেখেছি। আমরা তিন বন্ধু শরৎ বোস রোডের একজন প্রফেসরের বাড়ি থেকে গাড়িতে ফিরছিলাম। দূর থেকে তোদের দেখেছিলাম, দেখে মনে হয়েছিল তোকেই দেখেছি। তখনো আমি সুনিশ্চিৎ ছিলাম না। একটু আগেও ছিলাম না তুই অস্বীকার করলে ভাবতাম ভুল দেখেছিলাম।

তোর বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না দিব্যি আন্দাজে ঢিলটা ছুড়েছিস, যেভাবে বললি তাতে ভাবাই যায়নি তুই আমাকে ভাল মতন দেখেসনি। আমাকে ভাল মতন দেখিসনি অথচ ওকে বেশ ভাল মতনই যে দেখেছিস তা তোর কথা থেকেই পরিষ্কার।

তোরা যেভাবে বসেছিলি তাতে তোকে ভাল মতন দেখা না গেলেও ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তোর রূপকুমারের অত রূপ না থাকলে ওকে ওভাবে দেখতাম কিনা বলা শক্ত। সত্যি কথা একটা শুনবি? ওকেই আমরা প্রথম দেখেছিলাম, ওর রূপের জোয়ার থেকে আমার চোখ সরছিলই না তাই তোকে আমি দেখেছিলাম অনেক পরে।

যাক সে কথা তুই আজ থাকছিস ত'?

থাকলে তুই খুশি হবি না অখুশি হবি?

থেকে গেলে বরাবরই ত' আমি খুশিই হই অখুশি হোতে কবে দেখেছিস আমাকে ?

দেখিনি তবে আমার মনে হোচ্ছে এবার আমি চলে গেলেই যেন তুই খুশি হবি।

এ ধরনের অদ্ভুত কিছু তোর মনে হওয়ার উত্তর আমি দিতে পারব না।

তোর পরীক্ষা কবে ?

সোমবার।

সোমবার মানে এই সোমবার ? পরশুর পরের দিন ?

মন্দিরা জানালো দু'দিন বাদে যে সোমবার সেই সোমবারেই তার পরীক্ষা।

শুনেই লিপি উঠে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এত কাছে পরীক্ষা ভাবিনি এখন আর তোকে বিরক্ত করা চলে না। আজ আমি থাকছি না তোর পরীক্ষার পর এসে থাকব।

তোরা কী আজ সকলেই চলে যাবি ?

মা থাকবে। আমিও থাকব বলেই এসেছিলাম তোর পরীক্ষা না হোলে থেকে যেতাম, বাবার সঙ্গে চলে যাব। আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না—যাচ্ছি।—লিপি কথা শেষ করেই চলে গেল।

ও চলে যাবে শুনে মন্দিরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল এবার ঘর ছাড়তেই নিশ্চিন্ত হোলো পুরোপুরি। হোয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে বিছানায় এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

মন্দিরা চলে যাবার পর ইন্দ্র কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল মন্দিরার সঙ্গে ব্যবধান বজায় রাখার জন্য। ও জানে তাদের একসঙ্গে অন্যের চোখে পড়ে যাওয়ার পরিণাম কী হোতে পারে। দুশ্চিন্তা মন্দিরার জন্য। নিজের জন্য ভয়-ভাবনা নেই কারণ ও ভালভাবেই জানে তার মত সর্বহারার হারানোর কিছু নেই। মন্দিরার আত্মীয়-স্বজন তাদের একসঙ্গে দেখলে নিঃসন্দেহে তাকে অপমান করবার চেষ্টা করবে কিন্তু তাতে ও বিন্দুমাত্র ভীত নয়, জন্ম থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষজনের কাছ থেকে যা পেয়ে এসেছে তাতে নতুন করে আর অপমানিত হওয়ার ভয় বুকে বাসা বাঁধতে পারে না। জন্মাবার পর থেকেই পায়ে পায়ে যেন অপমানের শৃঙ্খল জড়িয়ে আছে। মন্দিরার জন্যই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ ও চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ইন্দ্র ফিরে এসেছিল আস্তানায়।

পুটু ফুটকির সঙ্গে কথা বলছিল ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্র বাসায় ফিরে আসার সময় ও জানিয়ে রেখেছিল সে যেন তার ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘরেই থাকে। ইন্দ্র আর মন্দিরাকে ও আগেই দেখেছিল। লেকের ওপাশে ওদের আসতে দেখে ও বুঝেছিল মন্দিরা চলে যাবার পর ইন্দ্র ঘরে ফিরবে তাই ও ফুটকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকে টাকার কথা জানাবে বলেই অপেক্ষা করতে বলেছিল তার জন্য। ফুটকির সঙ্গে যে বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা তাড়াতাড়ি শেষ করে ঘরে ফিরে এসে ইন্দ্রকে জানালো যে টাকাটা না পেলে ওর পড়া বন্ধ হোয়ে যাচ্ছিল সেটা জোগাড় করা সম্ভব হোচ্ছে সুতরাং ও যেন টাকার জন্য আর না ভাবে। ইন্দ্রর পড়ার খরচের জন্য বেশ কিছু টাকা প্রথমেই ধরে দিতে হোয়েছিল এবং তারপর থেকে দিয়ে যেতে হয়েছে মাঝে মাঝে এখন আবার অনেক টাকার প্রয়োজন। টাকা না দিলে ও এগোতে পারবে না।

ইন্দ্র জানত চাটার্ড পড়া ব্যয়সাপেক্ষ। মধ্যবিত্তদের মধ্যেই অনেকে এ খরচ বহন করতে অপারগ। তাদের কাছে ত' এটা স্বপ্নেরও অতীত। ও চাইছিল না পড়তে। পুটুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল অনেকবার কিন্তু সে চেষ্টা তার ফলপ্রসূ হয়নি। নিরুপায় হোয়ে শেষ পর্যন্ত তার নির্দেশ ও মেনে নিয়েছিল।

সত্যি বলতে পুটুও এতটা ব্যয়সাপেক্ষ ভাবেনি। মডেলিং করে ওকে পড়ানো যাবে না ওর বিশ্বাস হয়নি, ভেবেছিল তার হাতে যা কাজ আছে তাতে অসুবিধা হয়ত হবে না। আর যদি হয় তাহোলে দু' একজন আর্টিস্টের কাছ থেকে কিছু টাকা অ্যাড্‌ভান্স পেয়ে যাবে। পেলে আস্তে আস্তে শোধ করে দেবে। ইন্দ্র পাশ করে বেরিয়ে গেলে তখন কোনো সমস্যাই থাকবে না। কিন্তু তখনো ও ভাবতে পারেনি মডেলিং করে আর টাকা ধার করে সি-এ পড়ানো সম্ভব নয়। পড়াতে গিয়ে বুঝল অন্য পথ না নিলে ইন্দ্রকে পড়ানো যাবে না। কোন পথে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। এর তার কাছে ছুটোছুটি করেছে কিন্তু তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঝুমরিকে বলেছে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে। যে কোনো কাজও করবে। যে কোনো ধরনের কাজ বলতে ঠিক কী বলতে চাইছে তা ঝুমরি বুঝতে পারেনি তাই সঙ্গে সঙ্গে ওকে আশ্বস্ত করতে পারছিল না। জানিয়েছে মান-সম্মান যাতে বজায় থাকে এমন কোনো কাজেই পুটুর প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েও ঝুমরি এত টাকা পাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। তার আয় খুব জোর পঞ্চাশ-ষাট টাকা এক একদিনে। সে টাকাও প্রতিদিন যে পায় তা নয় কোনো কোনো দিন কাস্টমার পাওয়ার জন্য বেশ কিছু খসাতে হয়। পার্টি যে জোগাড় করে দেয় তাকে দশ-পনের টাকা দিতে হয়। এছাড়া যারা ওকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে তাদের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা আছে। মোট কথা সব কিছু বাদ-টাদ দিয়ে যা পায় তা বিরাট অঙ্ক নয়। পুটুর মুখশ্রী যেহেতু তার থেকে অনেক ভাল সেহেতু ও যদি সে যে কাজ করে সে কাজ করতে রাজী থাকে তাহোলে ঝুমরি চেষ্টা করে দেখতে পারে যাতে ও ওর প্রয়োজনীয়

টাকা পেতে পারে। পুটুর তখন যা মানসিক অবস্থা তাতে অন্য কোনো কিছুই ভাবতে পারছে না। মনে মনে স্থির করেই রেখেছিল টাকার জন্য সব কিছু করতে পারবে। ঝুমরিকে জানালো যে পথে তার প্রয়োজনীয় টাকা আসবে সে পথে যেতে তার আর এখন আপত্তি নেই।

তোকে একটা কথা বলব ?—ঝুমরি ওর জন্য চেষ্টা করবে জানিয়ে প্রশ্ন করল।

বল।—খুব হাল্কা ভাবে যেন কথাটা পুটু ভাসিয়ে দিল। আসলে তার জীবনের গতি কোন দিক মোড় নিতে চলেছে সে কথা ভেবে ও নিজের মধ্য থেকেই যেন নিজেকে হারাতে থাকল। ইতিপূর্বে এমন ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে কেঁপে উঠেছ বার বার। বস্তির মেয়েদের অনেককেই ও পছন্দ করে না তাদের শারীরিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না বলে। যে পরিবেশে সে জন্মেছে সেখানে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করার নৈতিক দায় কিম্বা সদিচ্ছা সকলের থাকে না। বেঁচে থাকাই যেখানে মূল সমস্যা সেখানে এরকম কথা ভাবার সুযোগ কতটুকু! কোনো কিছুর বিনিময়ে বেঁচে থাকা যেখানে অনেক বড় সেখানে কৌমার্য নিযে ভাবা অনেকের কাছে নিরর্থক মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। পুটু সেভাবে কখনো ভাবেনি তাই শুধু দু' মুঠো অন্নের জন্য নিজেকে অপমানিত করতে চায়নি। বেঁচে থাকার জন্য আকপাকু করেনি। বাঁচার একটা অর্থ আছে এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। শুধু বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করলেই যে বেঁচে থাকা বলে প্রমাণিত হয এটা কখনই ও ভাবেনি। এই পরিবেশে থেকেও ও স্বতন্ত্র। এরই জন্য ও ইন্দ্রকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। এভাবে বেঁচে থাকতে চায় ও। এটাই ওর কাছে বেঁচে থাকা। আজ বাঁচার জন্য শারীরিক ভাবে বাঁচার কথা ভাবতে পারল না। যে মৃত্যুর কথা ভেবে অনেকে অনেক কিছু করে বাঁচতে চাইছে সে মৃত্যুর কথা ভাবেনি ও। সেই মৃত্যুর থেকে বাঁচার জন্য ইতিপূর্বে কখনো ভয়ংকর কিছু করার কথা ভেবে বসল। শরীর বিলিয়ে দিলে শরীর থাকে না, থাকে হাড় আর মাংস। ওটা মরাও নয় বাঁচাও নয। শুধু কিছুটা শারীরিক বিপর্যয় ঘটে এবং কিছুটা মানসিক। নিজেকে কিছুটা অপমানিত করা হয়। এত কিছু ভাবে না, ভাবতে পারে না তবে যদি অন্য কোথাও জন্মাত, শিক্ষার আলো পেত তাহোলে ঐ ভাবেই ভাবত। ও ভাবে না ভাবলেও পুটু তার নিজের মত করে যা ভাবে তা ওদের কেউ ভাবতে পারে না, ভাবে না।

ঝুমরি পুটুর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলছিল, এত কষ্ট করে ইন্দ্রকে এভাবে লেখাপড়া করাচ্ছিস কেন? আমরা খারাপ কিন্তু তুই ত' আমাদের অনেকের মত নোস. খারাপ কিছু নেই তোর মধ্যে তাই আমি অবাক হোয়ে ভাবছি নিজেকে নরকে নিয়ে গিয়ে ওকে পড়াবি কেন? তোর কি ধারণা ও রোজগার করে তোকে ভালভাবে রাখবে, খেতে পরতে দেবে?

সে আশা করি না আমি। ও ভাল ভাবে বাঁচুক মাথা উঁচু করে থাকুক, বাবুদের একজন হোয়ে যাক ব্যাস আর কিছু নয় আর কিছু চাই না আমি।

পুটুর কথা শুনে ঝুমরির চোখের পলক অনড় এবং মণি দুটি স্থির হোয়ে থাকল ওর মুখের উপর। ঝুমরির মনে হোতে থাকল ও যেন অতি কাছের এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে দেখতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঐভাবে তাকিয়ে থাকার পর ও বলল তুই অনেক বড় রে পুটু তোর মত আমরা একজনও নই।

বড় ছোট বুঝি না আমার একটা চেষ্টা সাথক হোয়েছে দেখে আমি মরতে চাই। ও বড় হোলে আমি কী পাব তা বোঝাতে পারব না, কেন পারব না তাও বোঝাতে পারব না, লেখাপড়া যদি জানতাম তাহোলে হয়ত পারতাম। শুধু বলতে পারি যা পাব তার থেকে বড় পাওয়ার আর কিছু নেই।

সেদিন ঝুমরির আর পুটুর মধ্যে ঐ পর্যন্তই কথা হয়েছিল। এরপর আবার ওদের কথা হযেছিল দিন কয়েক পরে। ঝুমরি দিন কয়েক পরে একদিন সকালে পুটুকে ডেকে ঝুপড়ির বাইরে বার করিয়ে এনে জানিয়েছিল ওর জন্য সে একটা ব্যবস্থা করতে সক্ষম রয়েছে তবে তার জন্য দিন চার-পাঁচ আরো অপেক্ষা করতে হবে। ডি. সি. চতুর্বেদী নামে এক মধ্যবয়স্ক বিত্তবান ভদ্রলোক যেদিন ঝুমরির সঙ্গে পুটুর কথা হচ্ছিল সেদিনই মিরাট যাচ্ছেন, ফিরে আসার পর পুটুকে তার কাছে নিয়ে যাবে ঝুমরি। কথা হয়েছে মানুষটার সাথে। মানুষটা একজন ভাল মেয়ে চাইছে, চিরস্থায়ী ভাবে একজনকে চাইছে। যদি মানুষটার পুটুকে পছন্দ হয় তাহোলে ওর আর্থিক সমস্যা আর থাকবে না। মানুষটা ভাল। ঝুমরির মত মেয়েদের মানুষটা খোঁজে না। মানুষটা ওকে খুঁজে নিয়েছিল অন্য প্রয়োজনে। অন্য প্রয়োজন বলতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একজন বিশেষ মানুষকে বশে আনতে চাইছিল। সেই বিশেষ মানুষটার বিশেষ দুর্বলতার জায়গার সন্ধান পেয়ে ঝুমরিকে পাটনায় নিয়ে গেছিল তার জন্য। পথে চতুর্বেদীর মনের ইচ্ছেটা ঝুমরি জানতে পারে। জেনে পুটুর কথাটা জানায় তাকে।

শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে শুনেছিল ঝুমরির কথা, শেষ হোয়ে যাওয়ার পরও এক-আধ মিনিট কিছু বলতে পারেনি। ওর ভেতরটা তখন নিভে যাওয়ার আগে যে ভাবে প্রদীপ দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে সেভাবে জ্বলছিল। চোখের সামনে মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুলছে। ও ছোটকাল থেকেই রক্ষণশীল, শরীরের শুচিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বস্তির মেয়েরা কখনই ওর মত ভাবে না। প্রত্যেক বছর দোলের সময় একটু বাড়াবাড়ি হয়। ছেলেরা একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রং মাখনোর অছিলায় মেয়েদেব শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছুঁয়ে থাকে ওরা। তা নিয়ে যদি কোনো মেয়ে রুষ্ট হোয়ে ওঠে তাহোলে বড়জোর খিস্তি-খেয়ুড় করে ওঠে। যার উদ্দেশ্যে করে তার তাতে বিন্দুমাত্র যে কিছু যায়-আসে না তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। ওরকম খিস্তি শুনে দাঁত বার করে হেসে ওঠে। পুটু কিন্তু সেরকম কিছু হোলে সহজে অপরাধীকে নিস্তার দেয় না। কামড়ে খিমচে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। একবার দোল পূর্ণিমায় পুটুকে রং খেলতে টেনে নিয়ে গেছিল বস্তির মেয়েরা। মেয়েরা আর ছেলেরা পরস্পরকে রং মাখাচ্ছিল।

শালীনতা বজায় কোনো কালেই দোলের দিন থাকে না সেদিনও ছিল না। খুব বেশি বাড়াবাড়ি না হোলে তা নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায় না। পুটু অন্যদের মত নয় তাই তার ক্ষেত্রে যখনই শালীনতা বিঘ্নিত হচ্ছিল তখনই জ্বলে উঠছিল। ঠিক এই কারণেই ও বেরুতে চায় না প্রত্যেক বছর কিন্তু সেবার না বেরিয়ে পারেনি। মেয়েরা দল বেধে এসে ওকে টেনে বার করেছে। বেরিয়ে ভেবেছিল পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই ফিরে আসার চেষ্টা করবে কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, না হওয়ার কারণ বন্ধন হঠাৎ ওকে রং মাখাতে গিয়ে ব্লাউজের গর্ভে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পুটু তখন রাগে কী করবে ঠিক করতে পারছিল না, ক্রমাগত সজোরে ওর দু'গালে প্রথমে চড় মারল কয়েকটা তারপর কামড়ে-খিমচে চুল টেনে ওকে ড্রেনলাইনের উপর শুইয়ে ছাড়ল। এই ঘটনার পর পুটুর ধারে কাছে কেউ কখনো ঘেঁষেনি। সেই পুটুই আজ যখন শুনল তাকে নিজে গিয়ে এক অপরিচিত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হোতে হবে তখন যেন ও নিজের মধ্য থেকেই নিজে হারিয়ে গেল। আর এজন্যই ঝুমরির বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করার পর কেঁপে উঠল, এক-আধ মিনিট নীরব হোয়ে থাকল তারপর যেন দূর থেকে ভেসে আসল ওর কণ্ঠস্বর, ঠিক আছে যেদিন যেতে হবে বলিস।—এর কয়েক দিন পর ঝুমরির সঙ্গে সেই মানুষটার কাছে গেছিল। তারপর ওর জীবনে সেই ভয়ংকর দিনটা এলো। চতুর্বেদী ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল, অঙ্গ পীড়ন করল, বুকের মাঝখানে নিল ওকে এবং অবশেষে ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে গেল। মানুষটা বর্বরের মত থাবা বসায়নি পুটুর উপর বরং বলেছে, তোমাকে আমি জোর করব না, জোর করে কোনো কিছু পেতে চাই না আমি যখনই অসহ্য মনে হবে আমাকে জানাবে আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে ছেড়ে দেব।—পুটুর কৌমার্য বিসর্জন দিতে কষ্ট হয়েছে তবু ইন্দ্রর কথা ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে সে কষ্ট সহ্য করেছে। একদিন নয় একাধিক দিন নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছে। দিন কয়েক আগে ইন্দ্র জানিয়েছিল এবার ওর অনেক টাকার প্রয়োজন হবে। টাকার অংকটা শুনে ও ভয় পেয়েছিল, এতো টাকা তার পক্ষে কম সময়ের মধ্যে কী ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে ভেবে পাচ্ছিল না। চতুর্বেদী কলকাতায় থাকলে অসুবিধায় পড়তে হোত না। মানুষটা তার প্রতি যথেষ্ট সদয়। ওর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এখন অন্য রকম। এখন আর শুধু শরীরকে ঘিরে সে সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়, এক ধরনের মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পরস্পরের মধ্যে। পুটু বোঝে না এ সম্পর্ক ভালবাসা কিনা। ঝুমরিকে জিজ্ঞেস করেছিল ও কিন্তু সেও সঠিক কিছু বলতে পারেনি শুধু বলেছে, আমি এসব কিছু বুঝি না কারণ তোর মত একটা বাবু নিয়ে ত' ব্যবসা নয় তাই মন দে'য়া-নে'য়ার প্রশ্নই ওঠে না।—যা জানতে চেয়েছিল তার উত্তর মেলেনি তবু এক এক সময় ওর মনে হয় হয়ত এটাই ভালবাসা। চতুর্বেদীর সান্নিধ্য এখন ওর ভাল লাগে এটা ভালবাসা নয় ত' আর কী! এরকম একটা সম্পর্ক আছে বলেই ও জানত চতুর্বেদী কলকাতায় থাকলে ওকে টাকার জন্য ঠেকে যেতে হোত না। মানুষটা কলকাতায় নেই তাই এ সময় এত টাকা কী ভাবে সংগ্রহ করবে ভেবে পেল না যদিও

ইন্দ্র যখন জানিয়েছিল তখন ও সঙ্গে সঙ্গে যা সব সময় বলে থাকে তাই বলেছে অর্থাৎ টাকার জন্য ভাবতে হবে না ওকে এ কথা জানিয়েছে। জানিয়েছে বটে কিন্তু তখনো ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না কী ভাবে টাকাটা জোগাড় করবে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হোয়ে ঝুমরিরই শরণাপন্ন হোলো ও। এক সময় এই ঝুমরিকে ও সহ্য করতে পারত না কিন্তু ইদানীং বুঝেছে মেয়েটা খারাপ নয় অনেক উপকার করেছে ওর। ও যদি মুখ ফিরিয়ে থাকত তাহোলে পুটু কখনই ইন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। যাই হোক এবারও পুটু নিরুপায় হোয়ে ওর কাছে এসেই হাজির হোলো। ওর সমস্যা শুনে ঝুমরি এবারও ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানের পর ওর সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় জানাতে এলো ঝুমরি। এবারও ঝুপড়ির বাইরে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ও বলল, তোর টাকার ব্যবস্থা হোতে পারে পুটু তবে তার জন্য একটা অল্প বয়স্ক ছেলের সঙ্গে দিন দুয়েকের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হবে। ছোট ভাই-টাই পরিচয় দিয়ে কোনো হোটেলে থাকতে হবে তোকে। ছেলেটা ছেলেমানুষ সুতরাং একটু সাবধান থাকবি—এবার বল যাবি ত' ?

পুটুর টাকার প্রয়োজন এত বেশি যে তখন অন্য কিছু ভাবার মত অবস্থা নয় তাই শুধু বলল, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই ত' ?

একটু সতর্ক থাকতে পারলে নেই। তুই নিজেও থাকবি আর ওকেও বার বার সাবধান করে দিবি যাতে পথে-ঘাটে বেচাল কিছু না করে।

ঝুমরিকে সম্মতি জানালো পুটু। এরপর নিশ্চিন্ত হোতে পারল ও। ভাবল আর মাত্র একটা বছর তারপর এসব ছেড়ে দেবে, যে প্রয়োজনের জন্য এ পথে আসা সে প্রয়োজন তখন আর থাকবে না। বছর খানেকের মধ্যেই ইন্দ্র পড়া শেষ করে ফেলবে এবং নিঃসন্দেহে ভাল চাকরি পেয়ে যাবে। ওর জন্যই তাকে এ পথে পা বাড়াতে হয়েছে সুতরাং সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নিজেকে শেষ করার আর প্রয়োজন নেই যদিও চতুর্বেদীকে ও ছাড়তে পারবে কিনা এখনো ভেবে ঠিক করতে পারছে না। বেশ কিছুদিন ধরে চতুর্বেদী শুধু শারীরিক প্রয়োজনে ওকে কাছে টানে না, এক একদিন মানুষটা ওকে বেডরুমে নিয়েই যায় না শুধু বুকের মধ্যে নিয়ে হয় বসে থাকে না হয় কথা বলে। নিজের কথা। কখনো পুটুর কথা জানতে চায়। এ ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটে। এ জন্যই মানুষটাকে নিয়ে ও ভাবে। এখনো ভেবে আবিষ্কার করতে পারেনি মানুষটাকে ভালবাসে কিনা এবং তাকে ও ছেড়ে দিতে পারবে কিনা। ঝুমরি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তার নিজের ভাষায় যে সব মানুষ তার কাছে আসে তাদের সম্পর্কে ওকে জানিয়েছে। তারা কতটা নির্লজ্জ এবং কতটা বেলেল্লাপনা করে তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছে। যে সব মানুষদের কাহিনী পুটু শুনেছে তাদের সঙ্গে চতুর্বেদীকে এক আসনে বসাতে পারেনি। তারা লম্পট কিন্তু চতুর্বেদীকে কখনই লম্পট বলা চলে না। একথা ঠিক সে একজনকে চেয়েছিল এবং শারীরিক প্রয়োজনের জন্যই চেয়েছিল তা সত্ত্বেও

তাকে লম্পট ভাবতে পারে না পুটু। নারী পুরুষের এক চিরন্তন সম্পর্ক কখনো ভালবাসা হয় কখনো ব্যভিচার হয়। কেউ সেতারে সুর তোলে আবার কারো হাতে সেই সেতারই আর্তনাদ করে ওঠে। মানুষটা শারীরিক ভাবে ওকে গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু তা বেলেল্লাপনা নয়। এমন মানুষটাকে তাই ও টাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবে কিনা এখনো ঠিক করতে পারেনি। এক এক সময় মনে হয় পারবে না। আজ ও নিরুপায় হোয়ে অন্য এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য সম্মত হোলো। এরকম পরিস্থিতি না হোলে ও কখনই অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে আসার কথা ভাবত না। ও ঠিকই করে রেখেছিল চতুর্বেদী ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষকে ও কাছে আসতে দেবে না। সে সঙ্কল্প ওর ভেঙে গেল। ঝুমরির সঙ্গে কথা হোয়ে যাওয়ার পর ও ইন্দ্রকে জানাতে পারল টাকার যোগাড় হোয়ে যাবে নতুন একটা কাজ জুটেছে, দু' দিনের আউট-ডোরের কাজ। ইতিপূর্বে ও বাইরে কখনো যায়নি তাই ইন্দ্র শুনে বলল, তুই একা বাইরে যাবি!—ও যে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তা তার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল। পুটু ওকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে উঠল, তুই কীরে ইন্দ্র কী করে ভাবলি আমি একা যাব, একা কী যাওয়া যায়? একা কেন—সঙ্গে অনেকেই থাকবে, যে বাসে যাব সে বাস মেয়ে-পুরুষে বোঝাই হোয়ে থাকবে। কিছু ভাবিস না, দুদিন আউটডোরের কাজ করে আসলে তোর প্রয়োজনীয় টাকাটা যোগাড় করে ফেলতে পারব।—কথাটা বলার সময় ও যেভাবে হাসির ঝরনা নামাবার চেষ্টা করছিল তা স্বাভাবিক ছিল না, হাসতে গিয়েই বুঝেছিল হাসিটা নিজের কাছেই অন্য রকম ঠেকছে! ও বুঝল জোর করে যে হাসার চেষ্টা করছে ও তা যে-কেউ ওর মুখের দিকে তাকালেই ধরে ফেলবে, বুঝতে পেরেই মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে ইন্দ্রর সম্পূর্ণ দৃষ্টি পড়তে দেয়নি তার মুখের উপর। এবং যখন বুঝল আর বিশেষ কিছু বলতে গেলে মনের ভেতর যে ভয়কে হাসির বর্মের সাহায্যে আড়াল করতে চেয়েছে তা প্রকাশ হোয়ে পড়বে তখন ও তাড়াতাড়ি কথায় ছেদ টেনে দেয়ালে খাটানো দড়ি থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরের দিন খুব ভোরে পুটু বেরিয়ে গেল। নির্ধারিত জায়গায় এসে দেখল ঝুমরি যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আগের দিন সেই ছেলেটা তার আগেই এসে গেছে। গতকালই সকালে ছেলেটার সঙ্গে ঝুমরি ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে সময় ওর সঙ্গে তার বিশেষ বাক্যালাপ হয়নি। শুধু পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পরই ও চলে এসেছিল। যদিও ওর বিশেষ কোনো কাজ ছিল না তবু ও অপেক্ষা করতে চায়নি। ফেরার সময় ঝুমরিকে বলেছিল, এই ছেলে! এ ত' ইন্দ্রবই বয়সী ছেলেরে ঝুমরি এর সঙ্গে—ভাবাই যায় না!—কথা শুনে ঝুমরি শরীরে ঢেউ তুলে হেসে তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, দোকানদার যখন কিছু বেচে তখন কাকে তা বেচবে আর কাকে বেচবে না তা নিয়ে ভাবে নাকি! তুই একটা আস্ত বোকা মেয়ে ছোট বড় দিয়ে তোর কী দরকার টাকা পেলেই হোলো।

আমার কথা শোন ওসব ভাবতে গেলে চলে না। ঐ বয়সের ছেলে বলেই অত টাকা পাচ্ছিস তা না হোলে পেতিস? কেউ দেবে না।—কথাটা মিথ্যে নয় মাত্র দুটো দিনের জন্য এত অর্থ পাওয়া যায় না। এই সত্যিটা উপলব্ধি করতে পেরে পুটু কিছু বলতে পারেনি যদিও ও মন থেকে অস্বস্তি তাড়াতে পারছিল না তবু চুপ করে থেকেছে। টাকার প্রয়োজন খুব বেশি না হোলে ও কখনই এরকম একটা ছেলের সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে আসার কথা ভাবতেই পারত না। যাই হোক টাকার যখন বিশেষ প্রয়োজন এবং বিকল্প কোনো উপায় যখন নেই তখন ঐ প্রসঙ্গে ঝুমরিকে কিছু বলতে পারেনি। আজ আবার ছেলেটাকে দেখে ওর মনে কালকের সেই অস্বস্তিটা ফিরে এলো।

ছেলেটা ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো, কাছে এসে বলল, চা খাবেন। সকালে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয়নি? প্রশ্ন করেই একটা চায়ের দোকানের দিকে পুটুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল, চলুন দোকানটায় গিয়ে বসে চা খেতে খেতে কথা বলা যাক।—বলেই ও অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে চায়ের দোকানটার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

নির্দেশ পেয়ে পুটু যন্ত্রচালিতের মতো ছেলেটার সঙ্গে হেঁটে চলল। ওকে পুরোপুরি একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি গ্রাস করে রেখেছে তখনো। ধর্মতলার বাস গুমটির কাছে চায়ের দোকানটার ভেতর ছেলেটা ঢুকে পড়ল। পুটুও ঢুকল ওর সঙ্গে। কোণের দিকে একটা টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসল। বসার পর পুটু বলল, তোমাকে একটা কথা বলছি তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করতে পারে। প্রয়োজন হোলে দিদি বলে ডেকো তাহোলে হয়তো আমরা কোনো বিপদে পড়ব না। আর আপনি নয় এখন থেকে বলবে তুই, আমিও তাই বলব।

পুটুর কথা শুনে ছেলেটা একপাশে ঘাড় কাৎ করল। এরপর গলা চড়িয়ে চায়ের অর্ডার দিল।

চা ওদের টেবিলে পৌঁছবার আগে পুটু ওর নামটা জেনে নিল এবং নিজের একটা কাল্পনিক নাম ওকে জানালো। জানিয়েই ওর মনে হোলো ছেলেটা ঝুমরির কাছ থেকে তার নামটা জেনেছে কিনা তা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। যদি জেনে থাকে তাহোলে ওকে মিথ্যেবাদী ভাববে, কথাটা মনে হোতেই একটু অস্বস্তি হোলো, পরে মনে হোলো এ ব্যাপার নিয়ে ওর চিন্তিত না হোলেও চলবে কারণ এখন আসল নামটা জানলেও যা, নকল নামটা জানলেও তাই, ওসব নিয়ে ও এখন বিন্দুমাত্র ভাববে না।

চা-টা খেয়ে নে।—চায়ের কাপ বয় টেবিলে পৌঁছে দিয়ে চলে যেতেই ছেলেটা বলল, বলেই হেসে ফেলল।

পুটুও হাসবার চেষ্টা করল।

বার কয়েক হর্ন বাজাবার পর ছেলেটা আর পুটু উঠে পড়ল। ওরা বাসে উঠে

আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছাড়ল। পুটু বাস ছাড়ার পর ছেলেটাকে গলার স্বর নামিয়ে বলল, চঞ্চল টাকাটা আমাকে দিয়ে দাও, কত দিতে হবে জানত?

চঞ্চল কথার উত্তর না দিয়ে ব্যাগ খুলে কয়েকটা এক শ' টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে পুটুর মতনই গলার স্বরকে খাদে নিয়ে গিয়ে বলল, গুণে নিন।

পুটু টাকাগুলি গুণে দেখল সে যা চেয়েছিল তার থেকে দু'শ টাকা বেশি দিয়েছে ও। বেশি দেখে কিছুটা অবাক হোয়ে বলল, এত কেন? ঝুমরি তোমাকে জানায়নি কত চেয়েছি আমি!

জানিয়েছে।

তাহোলে বেশি দিচ্ছ কেন?

ইচ্ছে হোলো তাই দিলাম।

পুটু দু'শ টাকা বার কবে চঞ্চলের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি যখন বেশি চাইনি তুমি দেবে কেন? আমার বেশি টাকার প্রয়োজন নেই।

দিলেও নেবেন না কেন?

তোমার কাছে যে টাকা আমি চেয়েছি সেটুকু টাকাই আমার প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন। তুমি ঠিক বুঝবে না কতটা প্রয়োজন তবে ওরকম প্রয়োজন না হোলে তোমার সঙ্গে আসতে আমি রাজী হোতাম না। আমার একটা ভাই আছে বয়স তার সম্ভবত তোমারই মতন।—কথা বলতে বলতে পুটু টাকাটা তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে রাখল, রেখে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে থাকল। যদিও ও জানে ঐভাবে বসে থাকা তার উচিত নয় কারণ চঞ্চল তাকে আনন্দ বিলনোর জন্য এক মুঠো টাকা দিয়েছে তবু তার সঙ্গে ওর বয়সের ব্যবধানের জন্য সহজ হোতে পারছিল না। তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ওর অসুবিধা হোচ্ছিল, এর জন্যই ও বাইরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে চোখ নিয়ে এসেছিল।

দেড়টার সময় ওরা দীঘায় পেঁাছল। কলকাতা থেকেই চঞ্চল হোটেল বুক করে এসেছিল তাই পেঁাছেই ওরা সোজা হোটেলে চলে আসতে পারল। দুপুরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে পুটু ভেবেছিল একটু ঘুমিয়ে নেবে কিন্তু চঞ্চলের অত্যাচারে ও দু'-চোখের পাতা এক করতে পারল না। ঐটুকু ছেলে তাকে অস্থির করে তুলল। দুটো দিন ঐভাবে ওর অত্যাচার দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হোলো। যেদিন ওরা ফিরে আসবে সেদিন ও কেঁদে ফেলল। প্রায় দশ-বারো মিনিট ধরে কাঁদল। ওর অবস্থা দেখে চঞ্চল তখন ভেবেই অস্থির। কেন কাঁদছে পুটু তা ওর মাথায় আসল না তাই বার বার শুধু ও প্রশ্ন করে গেল। পুটু সে সময় ওর একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি। ফেরার সময় জানালো কেন ও কেঁদেছিল। চঞ্চলের মুখটা ইন্দুর মুখ বলে মনে হয়েছিল। দু' দিনের মধ্যে কোনো এক সময় একথা আরো একবার মনে হয়েছিল, মনে হোতেই চঞ্চলকে বুকের উপর থেকে ঠেলে নামিয়ে গালে একটা সজোরে চড় মেরে বসেছিল। চঞ্চল তখন ভাবতেই পারেনি কেন এরকম করল পুটু। বিস্মিত হোয়ে গালে হাত বুলিয়েছে কিন্তু কিছু বলতে পারেনি সে সময়।

পরে ওকে কাঁদতে দেখে আরো বেশি অবাক হয়েছে। সেই থেকে ও ক্রমাগত প্রশ্ন করে গেছে। বাসে ওঠার পর উত্তর পেয়ে বলেছিল, আমাদের মধ্যে যা ঘটে গেছে তারপর তোমাকে কোনো ভাবেই দিদি বলা যায় না যদি যেত তাহোলে বলতাম দিদি আমাকে এবারের মত ক্ষমা করে দাও এরপর কখনো এমন দুর্মতি আর হবে না আমার। আর কখনই এসব কিছু করবার কথা ভাবব না।

পুটু অন্য কথা ভাবছিল, ভাবছিল একজন ক্রেতার কাছে কোনো কিছু বিক্রি করার পর বিক্রেতার মনে কষ্ট হোতে পারে না একথা জোর দিয়ে বলা যায় না তবে তার জন্য ক্রেতার উপর রাগ করা অনুচিত। যাই মনে হোক না কেন তার জন্য তার গালে চড় মারা চলে না। ও বলল, আমি বোধ হয় একটা কাজ ঠিক করিনি, দুটো দিনের জন্য নিজেকে বিকিয়ে যখন দিয়েছিলাম তোমার কাছে তখন আমার যাই মনে হোক তার জন্য তোমাকে চড় মারার অধিকার ছিল না।

চঞ্চল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, বলল, নিশ্চয়ই ছিল এই বয়সে আমি যা করলাম তা ভাবাই যায় না। এ ধরনের অপরাধের ক্ষমা নেই। তুমি আমার আচরণ দেখে কী ভাবছ তা অনুমান করতে পারছি। যে ভয়ঙ্কর পরিচয় আমি রাখলাম এ দুটো দিনে তা কহতব্য নয় তবু এতটা খারাপ হওয়ার জন্য একটা কারণ আছে। সতের বছর বয়সে এমন একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ে যায় যা দেখার পর থেকেই আমি খারাপ হোতে থাকি। বার বার সে দৃশ্য আমার মনে ভেসে উঠেছে এতদিন আর আমার ছটপটানি বেড়েছে। ভেবেছি সে সুখ আমার না পেলেই নয়। তারপর থেকেই নারীর শরীরের প্রতি আমার আকর্ষণ ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। দেহ নিয়ে যে সব মেয়েরা ব্যবসা করে তাদের কাছে যেতে গিয়ে যেতে পারিনি কারণ ওদের কাছ থেকে কী পাব সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্রায়ই ওদের কাছে ছুটে ছুটে যেতাম, একটু কাছে টানতাম আর কিছু খারাপ খারাপ কথা বলতাম ব্যস আর কিছু না। কোনো ভাল মেয়ে খারাপ হোতে চায় না, খারাপ মেয়ের কাছে যা পাওয়া যায় তা নিতে পারছিলাম না তাই এমন একজনকে খুঁজছিলাম যে না খারাপ না খুব ভাল। তোমাকে একটু আগে বললাম ওদের কাছে ছুটে ছুটে যেতাম কিন্তু ওদের কাছে বলতে ঝুমরির কাছেই আসতাম বেশি। আমি কী চাই একদিন ওকে তা বলেছিলাম। শুনে ও সেদিন আমার উপর বলতে গেলে খড়্গ-হস্ত। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে, বলেছিল, কেন আস আমার কাছে। বেরিয়ে যাও আর কখনো আসবে না। এতই যখন খারাপ মনে হয় আমাদের কাছে আসা কেন বাপু! সত্যিই সেদিন ও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ক'দিন আগে পথে হঠাৎ দেখা হয় ওর সঙ্গে তখন ওর কণ্ঠে অন্য সুর। তোমার কথা জানিয়েছিল। তুমি কতটা খারাপ এবং কতটা ভাল তা ওর কাছ থেকে জেনেছিলাম। এখন মনে হোচ্ছে এমন গর্হিত কাজ করা উচিত হয়নি আমার।

কলকাতায় ফিরে আসার সময় চঞ্চল আর পুটুর মধ্যে কথা বিনিময় হোতে

থাকল। বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে চঞ্চল তার ছোট বোনের কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোতে চেয়ে কী করেছে ও সে সব কথা এক এক করে বলে যেতে থাকল পুটুকে। ওকে খুবই সহজ-সরল ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল পুটুর, কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না এই ছেলেই তাকে বিবস্ত্র করে কী খেলাই না খেলেছে দু'দিন ধরে। এক অপরিণত পুরুষের মত অতি উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে কখনো হেসে উঠছিল আবার কখনো মুখে গাম্ভির্যের মুখোশ এঁটে বিভিন্ন ঘটনার কথা বলে যাচ্ছিল ও। কথায় কথায় মন্দিরার কথায় চলে আসল। মন্দিরার নামটা শুনেই পুটু পেছনের হেলান দেয়ার জায়গাটা থেকে পিঠ সরিয়ে নিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে বসল। চঞ্চল তার এই পরিবর্তন বুঝতে পারল না। পারল না বলেই যে ভাবে মন্দিরার কথা বলে যাচ্ছিল সে ভাবেই বলে যেতে থাকল। মন্দিরাকে ওর ভাললাগত তাই ও অনেক চেষ্টা করেছিল যাতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোতে পারে কিন্তু পারেনি, মেয়েটাকে ও কিছুতেই বুঝতে পারেনি। বড় কঠিন মেয়ে বলেই মনে হোত ওর। ইদানীং একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে ওর প্রেম-টেম হয়েছে কিনা তা সঠিক ভাবে চঞ্চল এখনো জানে না তবে ওর অনুমান হয়েছে।

কথাটা শুনে পুটু প্রশ্ন করল, ছেলেটা কিরকম দেখতে, তোমার মতন?—চঞ্চলের কথা শুনে ওর মনে যে কথাটা উদয় হোলো তা কতটা সঠিক বুঝে নিতে চাইল ও। ইন্দ্র ব্যতীত অন্য কেউ হোতে পারে না কারণ মন্দিরা ইন্দ্রর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় তবু মনে যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সামান্যতম স্থান দখল করে না থাকতে পারে তারজন্যই প্রশন করে বসল ও। ইন্দ্রর চেহারার বর্ণনা শুনলে ওর বুঝে নিতে কষ্ট হবে মনে হোলো না।

প্রশ্ন শুনে চঞ্চল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার থেকে ঢের ভাল, দারুণ দেখতে তবে ছেলেটার আর্থিক অবস্থা বোধহয় ভাল নয় কারণ পোশাক-পরিচ্ছদ যা পরে থাকে তা খুবই খারাপ। আমি ভেবেই পাই না ওরকম একটা ছেলের সঙ্গে মন্দিরার কী করে ভাব-ভালবাসা হয়। যদি নাও হোয়ে থাকে তাহোলেও ছেলেটার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কী করে তা আমার মাথায় ঢোকে না। মানলাম ছেলেটার মত অসাধারণ সুন্দর খুব কমই দেখা যায় কিন্তু তাই বলে চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে ওর ঘুরে বেড়ানোটা আমার কাছে রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার।

পুটুর আর কোনো সন্দেহ থাকল না ও ইন্দ্রর কথাই বলছে। বুঝতে পেরে বলল, ছেলেটা গরীব বোলে মন্দিরার ওর সঙ্গে মেশা উচিত নয় এ ধারণা তোমার ঠিক নয় চঞ্চল। আচ্ছা তুমি ছেলেটাকে ঈর্ষা কর না ত'? মন্দিরা তোমার কাছে ধরা দেয়নি তাই হয়ত দু'জনের উপরই···

পুটুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে চঞ্চল বলে উঠল, না—না এখন আর আমি মোটেও মন্দিরার উপর ইন্টারেস্টেড্ নই। সত্যি কথাটা তোমায় আজ বলি আমি এতদিন শুধু খারাপ চিন্তাই করে এসেছি। কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ

হোতে পারি তাহোলে তাকে ছুঁয়ে দেখব এ কথাই ভেবেছি, যেদিন বুঝেছি ও ভাল মেয়ে ওকে স্পর্শ করতে পারব না সেদিন থেকে ওকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছি।

চঞ্চলের সঙ্গে কখনো পুটু কথা বলছিল আবার কখনো জানালার বাইরের দৃশ্যাবলীকে ছুঁয়ে থাকছিল ওর চোখ। চঞ্চলের কথার পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা না বলে ওর মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ছুটন্ত বাইরের দৃশ্যের মধ্যে চোখ নিয়ে এসে ভাবতে থাকল, ওর কথা শুনে তার কিছু বলা উচিত, কী বলবে তা নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ! তারপর আবার ওর দৃষ্টি ফিরে এলো পূর্বের স্থানে, দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলল, আমি ত' গরীব অথচ আমাকে নিয়ে দু'দিন মেতে উঠেছিলে, কেন উঠেছিলে? গরীব বলে কী যা পেতে চেয়েছিলে তা পাওনি? ভাললাগার সঙ্গে গরীব-বড়লোকের কী কোনো সম্পর্ক আছে? তুমি ত' ভদ্রলোকের ছেলে অথচ আমার মত একটা খারাপ মেয়েকে নিয়ে দিব্বি দু'দিন ফূর্তি করে এলে, কী করে করতে পারলে বলত? ছেলেটা গরীব হোতে পারে এবং ভাল ভাল জামা-কাপড় পরার ক্ষমতা না থাকতে পারে কিন্তু সে ত' মন্দিরাকে নিয়ে তোমার মত বাইরে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করে আসার কথা ভাবেনি!

পুটুর কথাতে ঝাঁঝ ছিল। চঞ্চল বুঝল তার কথাটা পুটুর ভাল লাগেনি তাই ও অপরাধীর মত মুখ করে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বলল, আমার বোধহয় ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি আসলে আমি খুব ভেবে কিছু বলিনি। আমি একটা খারাপ বখাটে ছেলে কিন্তু তুমি নিজেকে অত খারাপ ভাবছ কেন? তুমি ত' টাকার বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আমার সঙ্গে এসেছ তা না হোলে ত' আর আসতে না—বল আসতে? তুমি ত' আর ঝুমুর নও।

চঞ্চলের কথা শুনে পুটুর দু' ঠোঁটে হাসি লেপ্টে থাকল কিছুক্ষণের জন্য, এরপরই ওর মুখ থেকে সেই হাসি সম্পূর্ণ বিলীন হোলো এবং এক অচেনা সুর নির্গত হোলো ওর কণ্ঠ থেকে, আমি ধোয়া তুলসি পাতা এ কথা তোমাকে কে বলল? আমি একজনের বাঁধা মেয়েমানুষ একথা তুমি কী জান?

চঞ্চল প্রথমে প্রশ্নের উত্তর দিল নির্বাক থেকে অর্থাৎ ঘাড়টা সামান্য ঝাঁকিয়ে বোঝালো জানে তারপর বলল, সব কিছু জেনেও বলছি তোমাকে খারাপ ভাবতে পারছি না। খারাপ হোলে তুমি আমাকে চড় মারতে না কখনই, কাঁদতেও না। আমি অনেক ছোট তোমার ভাইয়ের বয়সী তাই কষ্ট হোয়েছে তোমার, খারাপ যদি হোতে তাহোলে কী কষ্ট হোত?

পুটু বলল, আমার ভাল মন্দর কথা থাক—তুমি যা চেয়েছ তা পেয়েছ, না পেলে তোমাকে সহজে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারত না। আমি একটা কথা বলব শুনবে?

শুনব, বল।

এখন থেকে ভাল হওয়ার চেষ্টা কর। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে সুতরাং তোমার এত নিচে পড়ে থাকা উচিত নয়, আমি বলছি তুমি চেষ্টা করলে ভাল ছেলে হোয়ে যেতে পারবে।

তোমার কথা আমি রাখতে পারি তবে একটা শর্ত আছে।

বেশ বল!

তুমি এসব ছেড়ে দাও আর কারো বাঁধা মেয়েমানুষ হোয়ে থেকো না।

পুটু কপালের উপর অবাধ্য চুলকে এক হাতে চেপে ধরে বলল, তুমি কী ভাবছ আমি শখ করে একাজ করি? আমার এক এক সময় বেশ মোটা টাকার প্রয়োজন হোয়ে পড়ে যার জন্য বাধ্য হোয়ে একাজ করতে হয় এই যেমন এবার মনের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে আসতে হোলো।

অপরাধ বোধের গ্লানিতে চঞ্চলের মাথা কিছুটা নত হোলো, চোখে-মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণা, একটা কষ্ট ওকে যেন কুরে কুরে খেতে শুরু করল। ও আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলল, যা হোয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কিছু করা যাবে না তবে এখন থেকে তোমার যখনই টাকার প্রয়োজন হবে আমার কাছে আসবে, আমি দেব, এমনিই দেব।

তুমি দেবে! তা আমি নেব কী করে চঞ্চল? ওভাবে টাকা নে'য়াটা ভিক্ষে নে'য়া ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপর কী বলা যায় ভাবতে থাকল চঞ্চল সেই সঙ্গে ভাবতে থাকল কী ভাবে ওকে সাহায্য করা যায়। পুটু ঐ কাজ করুক এটা ও কিছুতেই চাইছিল না তাই একটু পরে ওর ঠোঁট নড়ে উঠল, তাহোলে তুমি আমার কাছ থেকে ধার নেবে পরে যখন পারবে অর্থাৎ তোমার সুবিধে হবে ফেরৎ দিয়ে দেবে।

যদি না পারি ফেরৎ দিতে?

পারবে, ঠিক পারবে আর একান্তই যদি না পার তখন না হয় তুমি যা করছ তাই কোর।

যৌবনে মনের প্রশস্ততা খুব বেশি থাকে, এ সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ইচ্ছে থাকে প্রবল তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাবার অবকাশ থাকে না। যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস থাকে তার কোনো বেদিই থাকে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ঠিক এভাবে না হোলেও এই কথাগুলোই পুটু যেভাবে ভাবতে পারে সেভাবে ভেবে কথার জবাব দিল না; শুধু দু' ঠোঁটের মাঝে হাল্কা মেঘের মত হাসি ছড়ালো।

চঞ্চল বলল, আমি জানি তুমি কেন হাসছ।

কেন?

ভাবছ ইমোশনে কথাগুলো বলে গেলাম পরে এ কথার কোনো গুরুত্বই থাকবে না আমার কাছে—না?

ইমোশান না কী যেন বললে কথাটার মানে কী?

চঞ্চল অর্থটা জানিয়ে বলল, আমি আমার মায়ের নামে শপথ করে বলছি আমি আমার কথা রাখব এবার বল আমার অনুরোধটা রাখবে ত'?

ভেবে দেখি।

না ভেবে দেখি নয় আমার কথা তুমি রাখবে।

পুটু কথার জবাব না দিয়ে ওর হাতের উপর হাতটা রাখল যেন এ ভাবে অনেক

অব্যক্ত কথা বলে ফেলতে চাইল। ভাষার দীনতার জন্য মনের মধ্যে সে কথা তোলপাড় করছে তা প্রকাশ করতে পারল না। যে ল্যান্ডস্কেপের উপর পুটু আজ দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশে যেন ভূমিকম্প হোয়ে সেখান থেকে সরে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে। চঞ্চলের হাত সেই ল্যান্ডস্কেপ পর্যন্ত পেঁছিতে পারবে না, ওকে ওখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না সে। এর জন্য পুটুর হয়ত কষ্ট হোত কিন্তু ও ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্র দু' হাত বাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়ে আছে, ওকে দেখে ওর মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই, আজ ও সুখী। কখন চারপাশের জমি ভাঙতে ভাঙতে তার পায়ের নিচের জমিতে ভাঙন ধরবে তা নিয়ে ওর ছিটেফোঁটাও ভয় নেই শুধু যতক্ষণ আছে ইন্দ্রর বড় হোয়ে যাওয়া বেচারাটা দেখতে পাক এটাই ওর কাম্য। পুটুর মনে হোলো চঞ্চলকে ইন্দ্রর কথাটা জানাবে কিন্তু পরে মনে হোলো না জানানোই ভাল। ওর মনে হোলো চঞ্চলকে ও বুঝতে পারছে ওকে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল ততটা খারাপ নয়, এখনো বয়সের তুলনায় যথেষ্ট ছেলেমানুষ এবং সরলও। এখন দেখে বোঝাই যাচ্ছে না ছেলেটা দুটো দিন কী ভয়ঙ্কর হোয়ে উঠেছিল। অনেক দিনের তৃষ্ণার্ত মানুষ যেরকম হাতের কাছে জল পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা গ্রহণ করে সেরকমভাবে ও পুটুকে গ্রহণ করেছিল। সেই ছেলেটাই যে এখন যাকে ও দেখছে সে কথা বিশ্বাস করাই যেন শক্ত। চতুর্বেদী ওর মত কখনো ভয়ঙ্কর হোয়ে ওঠেনি। মানুষটা অন্য রকম। মানুষটা যেভাবে ওকে কাছে টেনেছে তা দেখেই পুটুই এক এক সময় অবাক হয়েছে, ঠিক যেন বিয়ে করা বউয়ের মত ব্যবহার পেয়েছে তার কাছ থেকে। এমন আন্তরিকতার স্পর্শ ও পায় যে তা নিয়ে রীতিমত ভাবতে হয় মানুষটার সম্বন্ধে। একদিন ত' মানুষটা বলেই বসেছিল ওকে তার মেয়ে যদি আজ খুব বড় না হোত তাহোলে সে পুটুকে বিয়ে করতে চাইত। অবিশ্বাস্য কথা কিন্তু পুটু অবিশ্বাস করতে পারেনি। এতদিনে মানুষটাকে যেটুকু জেনেছে তাতে অবিশ্বাস করা চলে না। ও শুধু প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছে তার মতো একটা মেয়ে যাকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় তাকে নিয়ে মানুষটা এভাবে ভাবে কী করে। প্রশ্ন শুনে চতুর্বেদী হেসেছে কিন্তু সহজে ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। এ প্রশ্নের উত্তর পুটুর না পেলে নয় তাই বার বার একই প্রশ্ন করে গেছে। কতদিন আর মানুষটা চুপ করে থাকবে তাই একদিন তাকে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়েছে। জানিয়েছে ওর অনেক কিছুই সে জানে এমনকি ওর কেন টাকার প্রয়োজন সেকথাও তার অজানা নয়। যে টাকা পুটুর প্রয়োজন তার থেকে বেশি ও কখনো চায়নি এবং দিলেও নেয়নি সুতরাং পয়সা দিয়ে যে মেয়েদের কেনা যায় তাদের দলে সে ওকে ফেলতে পারে না। যে আত্মত্যাগ ওর মধ্যে দেখতে পেয়েছে সে তা খুবই বিরল। চতুর্বেদী ব্যবসাদার মানুষ, অনেক মানুষের সঙ্গে তার মেলামেশা তাই মানুষকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তার, পুটুকে সে চিনেছে। পুটুও মানুষটাকে চিনেছে। ও চতুর্বেদীকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আর চঞ্চলকে আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখল! ও তার মত

করে বুঝল ছেলেটা জীবনের কোনো এক ভয়ংকর জটিলতায় পথ হারিয়ে বসে আছে। সঠিক পথ খুঁজে পেলে ও আর কোনোদিন তাদের মত মেয়েদের খুঁজে বেড়াবে না।

চঞ্চল তার বক্তব্য পেশ করার পর যদিও তখন উত্তর পায়নি তবু আশা করে ছিল দেরি হোলেও পুটুর কাছ থেকে উত্তর আসবে, অনেকক্ষণ ধৈর্যের পরীক্ষা দে'য়ার পরও উত্তর না পেয়ে বলল, চুপ করে আছ কেন? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

আমাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন বলত?

তোমাকে আগেই জানিয়েছি আমি সীমাতিরিক্ত খারাপ কাজ করে বসে আছি যা করা উচিত হয়নি, এও জানিয়েছি যে যদি ওরকম কিছু আমাদের মধ্যে ঘটে না যেত তাহোলে তোমাকে আমি দিদি বলে ভাবতে পারতাম, এখন আর তা সম্ভব নয় কিন্তু একটা সম্পর্ক আমাদের মধ্যে থাকতে পারে আমরা পরস্পরের বন্ধু হোতে পারি, সত্যিকারের বন্ধু—কী হোতে পারি না?

মনে হয় না।

কেন?

পুটু বাসে উঠে আসার পর স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলতে শুরু করেছিল হঠাৎ ঝুমরির সতর্ক বাণীটি মনে পড়ে গেল, মনে পড়তেই ও গলার স্বর নামিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুটু এবং চঞ্চল বুঝতে পারল তাদের সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই কারণ তাদের পাশের আসনগুলোতে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে একজনও বাঙালি নয়। সম্ভবত একই পরিবারভুক্ত দশ-বারজন অবাঙালি গ্রাম্য মানুষ তারা। ওদের বচন শুনে যখন বুঝতে পারল পুটু কোনো ভাবেই ভাবা চলে না যে তারা বাংলার বিন্দু-বিসর্গ বোঝে তখন বেশ কিছুটা চড়া সুরে চঞ্চলের প্রশ্নের জবাব দিল, তুমি কি মনে কর এই দু'দিনের কথা ভুলে যাবে! অসম্ভব, যখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে যাবে তখনই তোমার মনে পড়বে এই দু'দিনের ঘটনা সুতরাং বন্ধু হই কী করে আমরা?

আমি চেষ্টা করব এ দু'দিনের ঘটনাগুলো ভুলে যেতে দেখি না পারি কিনা!

পুটু জানে কখনই ভোলা সম্ভব নয়। এক অপরিণত পুরুষের পক্ষে কোনো ভাবেই মনের ভেতরে যে ছবি আঁকা হোয়ে গেছে তাকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। নারীর নিরাবরণ শরীরের আকর্ষণ এবং তার সান্নিধ্যে আসার ফলে যা মনে ঠাঁই নিয়েছে তাকে ভুলে যাওয়া সহজ কথা নয়, যদিও বা কখনো সম্ভব হয় কিন্তু যখনই সেই নারী তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখনই তার মনের ভেতরে যে ছবি আঁকা হোয়ে আছে তার উপর থেকে পর্দা সরে যাবেই। এ কথা পুটু ভাল ভাবেই জানে তবু ও বলল, দেখ।

এভাবে কথার পৃষ্ঠে কথা আসতে থাকল, পরস্পরের মধ্যে কথার বাজনা যেন বেজেই চলল এক নাগাড়ে। ঐ ভাবে কথা বিনিময় করতে করতে ওরা কলকাতায়

এসে পৌঁছল রাত আটটায়। পৌঁছেই পুটু চঞ্চলের কাছে বিদায় নিয়ে একটা দক্ষিণ কলকাতার দিকে আগত বাসে উঠে পড়ল।

।। ছয় ।।

মন্দিরা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট কুড়ি পূর্বে লেকগার্ডেন্স থেকে বেরিয়ে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের উপর যে বাস স্টপ থেকে ওরা বাসে ওঠে প্রতিদিন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল সর্বশেষ পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়ার পর পাঁচটা দশ-পনেরর মধ্যে ওরা দু'জন এখানে দেখা করবে প্রথম তারপর ঠিক করবে কোথায় যাবে। আজ পর্যন্ত দূরে কোথাও যায়নি ওরা যখনই নিভৃতে বসতে চেয়েছে তখনই লেকে চলে এসেছে। দু'জনেরই বাড়ির কাছাকাছি এমন একটা জায়গা থাকতে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি কিন্তু আজকাল মন্দিরা ভয় পেতে শুরু করেছে। ওর মনের সংবাদ বাড়ির মানুষদের কানে উঠে যাওয়ার পর থেকে ও সতর্ক হয়েছে। ঠিক করেছে এখন থেকে লেকে আর বসবে না দূরে কোথাও যাবে। একটু সতর্কতা অবলম্বন করবে কয়েকটা মাস। এরজন্যই ও ইন্দ্রকে বলেছিল বাস-স্টপে আসতে। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসার সময় ও মনে মনে একটা নিরাপদ জায়গার সন্ধান করে যাচ্ছিল। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত কোথায় যাবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। ওর যে সব জায়গাগুলো নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল সেগুলোই পরে ততটা নিরাপদ মনে হচ্ছিল না, এই ভাবে নিরাপদ জায়গার সন্ধান করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হোলো। কোথায় যাবে ভাবছিল ঠিকই সেই সঙ্গে ইন্দ্রর দেরি হোচ্ছে দেখে ক্রমশই ধৈর্য হারাচ্ছিল। ঘন ঘন ঘড়ির উপর চোখ রাখছিল। পনের মিনিটের উপর দাঁড়িয়ে থাকার পর ইন্দ্রর উপর রাগ হোতে থাকল। নিজের মনে মনে বলল, পাঁচটা দশ-পনের বলে কী পাঁচটা দশ-পনেরতেই আসতে হবে দু'দশ মিনিট আগে আসলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যাবে! তৃতীয়বার যখন ও ঘড়ির উপর থেকে চোখ তুলল তখন ইন্দ্রকে দেখতে পেল। ও রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। মন্দিরা ধৈর্য হারিয়ে ভাবছিল কী ভাবে ইন্দ্র আসলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তার দেখা পেতেই ওর মনের উত্তাপ হ্রাস পেল, ও শুধু বলতে পারল, একা একটা মেয়ে এভাবে কতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? একটু আগে কী আসা যায় না?

বিশেষ একটা কারণে দেরি হয়েছে, কেন দেরি হয়েছে তুমি শুনবে?

না। একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি যতক্ষণ বাস না আসছে ততক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে কথা বোল না, যেন চেনই না সেভাবে দাঁড়িয়ে থাক।—বলে মন্দিরা

সরে দাঁড়ালো। দু'তিন মিনিট ঐ ভাবে অপেক্ষা করার পর বাস পেয়ে গেল। বাসে যেতে যেতে ইন্দ্রর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজে বার করার নির্দেশ জানালো।

থিয়েটার রোড আর চৌরঙ্গী রোডের ক্রশিং-এর কাছে বাসটা দাঁড়াতেই ইন্দ্র মন্দিরাকে নেমে আসতে বলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। নেমে আসার পর মন্দিরা কিছুটা বিস্মিত হোয়ে বলল, এখানে নিরাপদ জায়গা তুমি কোথায় পাচ্ছ ?

আছে, শহীদ ভগৎ সিং পার্কে গেছ কখনো ?

সেটা কোথায় ?

মিণ্টু পার্কে। ওখানে কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। চল এখান থেকে হেঁটে যাই, কী হেঁটে যাবে ত' ?

হাঁটা ছাড়া উপায়ই বা কী বল অফিস থেকে ফেরার সময় মানুষজন বাদুড়-ঝোলা হোয়ে ফিরছে—যা ভিড় তাতে বাসে পা রাখাই দায়।

তাহোলে আর কেন চল হাঁটতে শুরু করি।—বলেই ইন্দ্র ফুটপাথ ধরে এগোলো।

ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল মিণ্টু পার্কের দিকে।

ইন্দ্র এক সময় বলল, আজ তোমার অবস্থা দেখ মন্দিরা এমন একজনকে ভাল-বাসলে যে তার সঙ্গে সর্বত্র একসঙ্গে বসতে পর্যন্ত পারছ না। আমি এ ভয়ই করছিলাম।

ভুল। আমি আগেও তোমাকে জানিয়েছি কোনো কিছু লুকিয়ে করি না আজও সেকথা বলব, ভয় আমার জন্য নয়।

তবে ?

তোমাকে নিয়েই আমার যত ভয়। আমার বাড়ির লোক যদি তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে তাহোলে তারা তোমাকে অপমান করতে পারে ভেবে আমি সাবধান হোতে চাইছি। যতদিন না তুমি পাশ করে বেরোচ্ছ ততদিন পর্যন্ত এভাবে আমাদের চলতে হবে। অবশ্য বাড়ির মানুষদের মধ্যে একজন তোমার কথা জানে, একমাত্র বৌদি আমাদের কথা জানে।

তার অভিমতটা জানতে পারা যাবে ?

ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তবে তার তরফ থেকে ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তোমার বাড়ির আর কেউ কিছুই জানে না ?

জানে। আমি একজনকে ভালবাসি একথা তারা জেনেছে।

কিছু বলেনি তারা ?

হয়ত বলত কিন্তু তারা যেহেতু জেনেছে যে ছেলেকে আমি ভালবাসি সে কিছু-দিনের মধ্যে চাটার্ড অ্যাকাউণ্টটেণ্ট হোয়ে যাবে এবং যেহেতু ছেলেটা আমাদের পাল্টি ঘরের ছেলে সেহেতু তারা কিছু বলেনি। এরকম একটা ছেলেকে জামাই করতে চাইবেনা এমন বাবা-মা বোধহয় বাংলাদেশ খুঁজলে একজনও মিলবে না।

অর্থাৎ আমার কথা তারা জানে না।

যা বললাম তা কী তোমার কথা নয় ?

না।

তবে কার কথা ?

তুমি এ প্রশ্নের উত্তর জান মন্দিরা।

কী উত্তর ?

তোমার বাবা-মা দ্রোণাচার্যের মত অর্ধেক কথা শুনেছেন। 'অশ্বত্থামা হত'র মতনই তোমার ভালবাসার কথা শুনেছেন এবং যে তোমাকে ভালবাসে তার কথাও শুনেছেন কিন্তু আমার কথা অর্থাৎ ইন্দ্র ঘোষের কথা তাদের কর্ণগোচর হয়নি।

মন্দিরা ওর কথার উত্তরে কী বলবে খুঁজে পেল না।

ইন্দ্রই আবার বলতে শুরু করল, দ্রোণাচার্য 'অশ্বত্থামা হত' শুনেই প্রাণ ত্যাগ করেছিল কিন্তু তোমার বাবা-মা'র ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই সুতরাং দু'দিন পরে হোলেও আমার কথাটা শুনবেন।

শুনুক তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র ভয় ভাবনা নেই শুধু এ মুহূর্তে তারা না জানুক এটাই আমার কাম্য।

আমার নিজের উপর এক এক সময় রাগ হয় ভাবি আমি লেখাপড়া শিখতে গেলাম কেন না শিখলে কোনো সমস্যাই থাকত না।

এখন তোমার কী সমস্যা ? অশিক্ষিত হোয়ে থাকলে ভাল হোত ?

শিক্ষিত না হোলে জগৎটা অনেক ছোট থাকত, কলকাতার কোথায় নিরাপদ স্থান আছে তা নিয়ে ভাবতে হোত না মন্দিরা মিত্রকে।

মন্দিরা রাস্তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে ইন্দ্রর মুখের উপর এনে বলল, দাঁড়াও। —বলেই নিজেও দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর চারপাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে কী যেন খুঁজতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ ওর চোখ ছুটে বেড়ালো রাস্তার এপাশে-ওপাশে তারপর যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল। একটা খালি ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, উঠে পড়। —বলেই নিজে উঠে পড়ল ট্যাক্সিটাতে।

ইন্দ্র কিছু বুঝতে না পেরে ট্যাক্সির দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে বলল, কী হোলো মন্দিরা কী করতে চাইছ তুমি ?

উঠে এসো যথাসময়ে জানতে পারবে।

ইন্দ্র উঠে এলো কিন্তু ওর চোখে বিস্ময় তখনো জাঁকিয়ে বসে আছে। ও কী করতে চাইছে কিছুই বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারল না বলে ট্যাক্সিতে উঠে আসার পর প্রশ্ন করল, তুমি আমার উপর যে খুবই চটেছ তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোচ্ছে না তবু বলি আমার অনুমান ঠিক ত' ? যদি ঠিক হয় তাহোলে জানতে চাইব এখন আমার কী করা উচিত।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ জানিয়ে মন্দিরা চোখের কোণ দিয়ে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, চটেছি ! না তোমার অনুমান ঠিক নয়।

তাহোলে ?

আমি তোমাকে যে কথা বলেছিলাম তা তুমি বিশ্বাস করনি এটা প্রমাণিত হয়েছে, এখন আমি তোমার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য প্রয়াস চালাব।

কী বিশ্বাস করিনি মন্দিরা ? বিশ্বাস অর্জন করবার জন্যই বা কী ভাবে প্রয়াস চালাবে ?

আমার বাড়ির মানুষ আমাদের ব্যাপারটা জানলে তোমাকে অপমান করবে এ কথা ভেবে নিরাপদ জায়গার সন্ধান করছিলাম একথা তুমি বিশ্বাস করনি। এবার বলি বিশ্বাস অর্জন করবার জন্য কী করতে চাইব আমি, এখন থেকে কোনো কিছুই আর গোপন থাকবে না, দূরে কোথাও যাব না। শুধু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি যদি এ কাজের জন্য আমাকে বাড়ি ছাড়তে হয় তাহোলে তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দে'য়া ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় থাকবে না। তুমি প্রস্তুত থেকো।

আমি কখনই অবিশ্বাস করিনি তোমাকে তুমি যেরকম আমার কথা ভেবে নিরাপদ কোথাও যাবার কথা ভেবেছ সেরকম আমিও তোমার কথা ভেবে কথাটা বলেছি। মন্দিরা মিত্রর প্রেম নিখাদ না হোলে ইন্দ্র তার দিকে এগোত না। এতটা নির্বোধ ভেব না আমাকে। যে মেয়ে আমার মত সর্বহারার জন্য হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে তাকে অবিশ্বাস করে কতটা নির্বোধ প্রতিপন্ন করে বসব নিজেকে ভাব ত' একবার !

হয়েছে আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। এখন বল ড্রাইভারকে যে জায়গায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম সেখানেই যাব ত' ?

ইন্দ্র মন্দিরার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল আউট্রাম ঘাটের দিকে গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। নির্দেশ জানাবার পর ঘুরে মন্দিরার কিছুটা মুখোমুখী হোয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি আজ তোমাকে বাদ দিয়ে আমি এত নিঃস্ব যে এক সর্বহারা সমাজের এক সর্বহারা পরিবারে জন্মেও এতটা নিঃস্ব মনে হয় না নিজেকে, সেই আমি বলছি তোমাকে এতদিন পুরোপুরি চিনিনি, প্রতিবারেই তুমি যেন তোমার এক একটা অজানা দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ আমাকে।

ইন্দ্র ও কী আমাদের কথা বুঝতে পারছে ?—ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে কথাটা বলে মন্দিরা চোখের মণি কোণের দিকে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রর দৃষ্টি ওর দিকে আকর্ষণ করলো।

মনে হয় পারছে না।

তাহোলে যে কথা জানাব ভাবছি তা জানানো যেতে পারে কী বল ?

কী কথা ?

আমি যে যথেষ্ট নির্লজ্জ সেভাবে বোধহয় তোমাকে এখনো চেনাইনি নিজেকে।

খুলে বল।

আমার মনের ভেতরের একটা সুপ্ত ইচ্ছের কথা তোমাকে জানাই তাহোলেই

বুঝতে পারবে আমি কতটা নির্লজ্জ। এখন আমার ইচ্ছে তোমার বুকে আশ্রয় নিয়ে থাকি অনন্তকাল ধরে, তুমি তোমার অধর ছুঁইয়ে রাখ আমার ঠোঁটদ্বয়ের উপর। এরপর তুমি পাশ করে বেরোলেই আমি হাত বাড়িয়ে দেব সঙ্গে সঙ্গে, বলব, এভাবে আর নয় এবার আমাকে গ্রহণ কর। তারপরই আমরা আনব একজনকে যাকে শেখাব মানুষের অধিকার আদায় করে নেবার মন্ত্র। বিত্তের মাপকাঠিতে মানুষকে না মাপার কথা শেখাব এবং তিনজন মিলে অন্য এক স্বর্গ সংযোজন করার প্রয়াস চালাব। আমার কথা শুনে আমাকে কী খুবই নির্লজ্জ মনে হোচ্ছে ইন্দ্র ?

এক বিন্দুও নয়। তোমার কাছ থেকে একথা আশা করা যায়ই কারণ তোমার মত দুর্জয় সাহস ক'জনের আছে বলতে পারব না, কারো আছে কিনা তাও জানা নেই যদি থাকেও তা এত মানুষের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। ভালবাসা যখন অভ্র-স্পর্শী হয় তখন কোনো কিছুই লুকোবার প্রয়োজন হয় না, যে কোনো কিছুই খুব সহজ ভাবে বলা যায়। তোমার ভালবাসা দুর্লভ। আমার কী মনে হোচ্ছে জান ?

কী ?

তোমার ভালবাসা যে মানুষ পেয়েছে তার আর কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা থাকতে পারে না। সে যাক এবার তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি আমিও চাই তোমাকে বুকে নিয়ে অনন্তকাল বসে থাকি, তোমার দুটো পাপড়ি থেকে শুষে নি সমস্ত সঞ্চিত সুধা। বিশ্বাস কর মন্দিরা যতক্ষণ তোমাকে ছুঁয়ে থাকি আমি ততক্ষণ মনে হয় যেন ভরে আছি। এমন পূর্ণ হয়ে উঠি যে তখন কিছুতেই মনে হয় না আস্তাকুঁড়ের ভেতর…

মন্দিরা ইন্দ্রর বক্তব্য শেষ করতে দেয় না ওর একটা হাত দিয়ে ইন্দ্রর ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বলে, এ কথা আর কখনো তুমি বোল না, যে কোনো মানুষের থেকে তোমার যোগ্যতা অনেক বেশি, অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যেভাবে বড় হোয়ে উঠেছ তা প্রত্যেক মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। এমন প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও যে জায়গায় তুমি এসেছ সে জায়গায় আসা যায় এ কথা ভাবাই যায় না। মানুষ তোমার সম্বন্ধে কী ভাবে তা আমি জানি না তবে আমি কী ভাবি শুনবে ?

বল।

তুমি আমার গর্ব, বার বার শুধু একটা কথাই ভাবি ইন্দ্র ঘোষ একটাই আর সেই একজন শুধু আমারই। যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে তাহোলে যেন পরের জন্মে তোমাকেই পাই এ প্রার্থনা ঈশ্বরকে জানিয়েই চলেছি আমি। আর যদি একটাই জীবন হয় তাহোলে শুধু তোমাকে নিয়েই প্রতিটা মুহূর্তে আমি ভরে উঠব। আত্মীয়-স্বজনই বল আর বন্ধু-বান্ধবই বল সকলেই যদি আমাদের স্বীকার করতে না চায় তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।

ইন্দ্র উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল এতক্ষণ এবার মন্দিরার কথা শুনে ওর দিকে চোখ এনে বলল, আমরা ক্রমান্বয়ে পরস্পরের দিকে

যে ভাবে সরে আসছি তাতে বলতে পারি এখন আমি তোমার জীবন থেকে কোনো ভাবেই আর সরে যেতে পারব না এবং তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি তুমিও আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারবে না তা সত্ত্বেও একটা কথা না বলে পারছি না, আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে তুমি কী কী হারাবে তা সঠিক ভাবে ভেবে দেখেছ ত' মন্দিরা।

যে মানুষ নৌকায় চেপে নদীর পাড় ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে তাকে ঝড়ের ভয় করলেও চলে না ডুবে যাবার ভয় করলেও চলে না। কোনো কিছুতেই ভয় থাকে না তার।

তোমার আত্মীয়-স্বজনদের হারাতে হবে সমস্ত জীবনের জন্য।

তুমি ত' থাকবে তাহোলেই হোলো আর কাউকেই প্রয়োজন নেই আমার।

ইন্দ্র আর মন্দিরা কথা বলতে বলতে এসে পেঁছিল আউট্রাম ঘাটে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওরা এসে বসল গঙ্গার ঘাটে। একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ইঁট-সিমেন্ট বাঁধিয়ে বসার জায়গা করা আছে ওরা ঐখানে এসে বসল। গাছের ডালপালা আর পাতা যেভাবে ঝুলে আছে তাতে কেউ দেখবার চেষ্টা না করলে ওদের দেখতে পাবে না। তাছাড়া এখনো জায়গাটার আশেপাশে জনসমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েনি। আঁধার আকাশ চুঁইয়ে সবে নেমে আসতে শুরু করেছে। গঙ্গাব বুকে যখন আঁধার নামে তখন তা ইন্দ্র দু' চোখ মেলে দেখে। এরকম একটা দৃশ্য ওকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করে। মন্দিরারও ভাললাগে। এ মুহূর্তে আরো বেশি ভাল লাগল। ওর মনে হয় ইন্দ্র পাশে থাকলে সব কিছু ভাল লাগে। মন্দিরা বুঝে উঠতে পারে না কখন ইন্দ্রকে ও ভালবাসতে শুরু করেছে। সে সময়টা ও আজও খুঁজে বের করতে পারে না শুধু জানে সে সময় থেকে প্রতিটা মুহূর্তে ওর কাছে ও সরে সরে আসছে। এখনও ইন্দ্রর অভিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ইন্দ্রর কষ্ট হোলে ওর বুকেও তা বাজে। অনেক দিন পর আজই প্রথম ইন্দ্রকে একটু অন্য রকম মনে হোলো ওর। ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে কথা বিনিময়ের পর ওকে যেন অনেক দিনের একটা ধারণার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। তারপর থেকেই ও সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তার বড় প্রমাণ ও একটু আগেই রেখেছে। এখানে এসে খুব সন্তর্পণে মন্দিরাকে একটু কাছে টেনেছে এবং ওর ঠোঁট মন্দিরার ঠোঁটের উপর একবারের জন্য নেমে এসেছিল। ইতিপূর্বে মন্দিরা তাকে দেখেছে অন্য আরেক রূপে। ও সহজ হোতে পারছিল না এতদিন। গভীরভাবে মন্দিরাকে কাছে টানতে পারছিল না। একটা ব্যবধান যেন থেকেই যাচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। কোনো এক কাচের প্রাকারের দু'পাশে যেন থেকেছে দু'জন। ইন্দ্র সে প্রাকার ভেঙে ওকে কাছে টানতে পারছিল না। যদিও ওর ভালবাসার শেকড় মনের গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল তবু ও অনেক দিনের একটা ব্যবধানকে সহজে অতিক্রম করে আসতে পারছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজ আর তাদের সমাজের মধ্যে যে আকাশ আর ভূমির পার্থক্য ও ছোটকাল থেকে দেখে আসছে তাকে পেরিয়ে আসা সহজ

নয়। এরই জন্য ও মন্দিরার কাছে এসেও সরে সরে থাকছিল। মন্দিরাও এ ব্যবধান সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সচেতন ছিল প্রথম দিকে, সেজন্যই ও ভেবে রেখেছিল একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত এগোবে তার বেশি নয়। এই কারণে বৌদি আর সন্ধ্যাকে বার বার জানাতে পেরেছিল ইন্দ্র আর তার মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠবে না যাতে ওরা বিশেষ করে বৌদি চিন্তিত হোতে পারে। শেষ পর্যন্ত হেরে গেছিল। ইন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে ও নিজেকে হারিয়ে বসেছিল। বার বার ওর মনে হয়েছিল এমন এক পুরুষ তাকে সম্পূর্ণ করে দিতে পারে। এমন এক পুরুষকেই ত' চেয়েছিল সে, কী করে তার কাছ থেকে দূরে থাকবে! তবু ও সহজে ধরা দিতে পারেনি, মনে সংশয় ছিল, অনেক দিনের ধ্যান-ধারণা থেকে সরে যাওয়া সহজ কথা নয়, তাই ও ইন্দ্রকে কাছে টানতে গিয়েও টানতে পারছিল না। না পারার যন্ত্রণা ছিল ওর মধ্যে। নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হোয়ে উঠেছিল ও। মনের ভেতর সংঘর্ষ চলছিল। নিজের মনে মনে বার বার ইন্দ্রকে উদ্দেশ্যে করে বলেছে, তুমি আমার শুধু আমারই তুমি, তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্র। কিন্তু এ কথা তার কাছে এসে বলতে পারেনি, বলতে যখনই গেছে তখনই কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে উঠেছে। কেন এমন হোয়েছিল ভেবে পায়নি, ভেবেছে মেয়ে হোয়ে জন্মানোর ফলে কিছু অসুবিধা ওর আছে, সব মেয়েরই থাকে, নিজের মনের গোপন কথা সহজে প্রকাশ করা যায় না। ভেবেছিল মনের কথা মেলে ধরতে পারছে না এর জন্য। পরে বুঝেছিল তা নয় আসল কারণ অন্য, তাদের সমাজের একজন যদি ইন্দ্র হোত তাহোলে মনের খবর তাকে জানাতে এত দ্বিধা থাকত না। আরো ক'দিন পরে ও বুঝেছিল ইন্দ্র ব্যতীত ওর জীবন অর্থহীন হোয়ে পড়বে। সর্বক্ষণ রক্তের অণু-পরামাণুতে যেন একটা নাম ধ্বনিত হোয়ে চলেছে—ইন্দ্র আর ইন্দ্র। সমস্ত দ্বিধা কুয়াশার মত আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছিল। তখন আর তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সেই থেকে ও বুঝতে পেরেছে ইন্দ্র তার পাশে থাকলে ওর জীবন-তরী সুখের সাগরে ভাসতে থাকবে। আজ তাই ও ইন্দ্রের কথার উত্তরে বলতে পারল, তুমি ত' থাকবে তাহোলেই হোলো আর কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই।

আউট্রাম ঘাট থেকে ওরা যখন ফিরল তখন অনেক রাত। মন্দিরা বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ঘড়ি দেখল। মাত্র বারো মিনিট বাকি দশটা বাজতে। এত রাত্রে ইতিপূর্বে কখনো ও বাড়ির বাইরে থেকেছে কিনা তা মনে করতে পারল না। ভয় হোলো, ভেতরে ভেতরে যেন কাঁপ ধরল ওর। ইন্দ্র অনেকবার বলেছিল রাত গড়াচ্ছে মন্দিরার দেরি করা উচিত নয় কিন্তু যাকে বলা তার কোনো হুঁস ছিল না। মন্দিরার ইন্দ্রকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছেই হচ্ছিল না। রাত ন'টা কুড়ির সময় ইন্দ্র ওকে প্রায় জোর করে ওঠালো, বলল, মন্দিরা আর নয় এবার চল ফিরি।

ফিরতে ইচ্ছে করছে না, তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা ইন্দ্র যদি না ফিরে যাই বাড়ি? তুমি একবার আমাকে থেকে যেতে বলে দেখ-না ইন্দ্র।

—মন্দিরা কথা বলতে বলতে ইন্দ্রর হাতের উপর হাত রাখল, রেখে আরো একবার বলল, বল-না ইন্দ্র।

যদি বলি থেকে যাও ?

বলেই দেখ-না তাহোলেই ত' বুঝতে পারবে থাকব কিনা।

এরকম ভয়ঙ্কর কিছু করে বসতে পার তুমি ?

পারি।—কথাটা বলেই মন্দিরা মিটিমিটি হাসতে থাকল।

এর পরিণাম তুমি ভেবে দেখেছ ? ভেবে দেখেছ কী হবে তোমার ?

বিশেষ কিছু হবে না যা দু'দিন বাদে হবেই তা আজ হবে।

অর্থাৎ ?

বাড়ির দরজা আমার জন্য বন্ধ হবে চিরকালের জন্য। এরজন্যই কী তুমি ভাবছ, না এক কুমারী মেয়েকে কোথায় তুলবে সেকথা ভাবছ ? নাকি আমার কপালে কলঙ্কের তিলক আঁকা হোয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছ ?

এর কোনোটাই ভাবছি না।

ভাবছ না ! আমাকে নিয়ে ভাবছই না ?

সত্যি যদি তুমি থেকে যাও অর্থাৎ আমি তোমাকে বার বার বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করব সেই অনুরোধ যদি তুমি না রাখ তাহোলে আজ এই রাত্রেই পুরুৎ খুঁজে বার করে হিন্দু শাস্ত্র মতে তোমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে হবে। সত্যি যদি সেরকম কিছু করতে হয় তাহোলে আমি আর এগোতে পারব না, ফাইন্যাল আর দে'য়া হবে না। এর থেকেও বড় ব্যাপার তুমি কখনই আমাদের বস্তিতে গিয়ে থাকতে পারবে না, থাকা যায় না। তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি কখনই আমি চাইব না তোমাকে আমাদের ঝুপড়িতে নিয়ে যেতে; আই অ্যাম নট এ ম্যান অফ ইমপাল্‌স্‌। এবার বল আমার অনুরোধ তুমি রাখবে ?

মন্দিরা বলল, এরপর না বলি কী করে।

তাহোলে আর নয় এবার একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরি। এবারের ভাড়াটা আমি দেব।

দিও তবে পুরো ভাড়াটা তোমার কাছ থেকে নিতে পারব না। আমার কাছে যা টাকা আছে তাতে মনে হয় ট্যাক্সির সম্পূর্ণ ভাড়া দে'য়া সম্ভব হবে না হোলে তোমার কাছ থেকে নিতাম না। এ কথার অন্য অর্থ দাঁড় করিও না, সি-এ পড়ার খরচ অনেক সুতরাং বেহিসেবী হোও না।—মন্দিরা কথা বলতে বলতে দৃষ্টি রাস্তার উপর বিছিয়ে রেখে অনিচ্ছুক শরীরটাকে যেন টেনে নিয়ে চলল। কিছুটা ঐ ভাবে হেঁটে আসার পর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ওরা দু'জন একসঙ্গে প্রিন্স আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত আসল। নবীনা সিনেমার কাছে ইন্দ্র নেমে গেল। নেমে জানালা গলিয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ওটা থাক যা বাঁচবে পরে নেব।—বলেই হন হন করে হেঁটে ফুটপাথে উঠে এলো।

মন্দিরা বাড়ির কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ঘড়ি দেখল, দেখে বুঝল তার

কপালে আজ কী জুটবে। যতক্ষণ ইন্দ্র ওর সঙ্গে ছিল ততক্ষণ বাড়ির কথা ভাবেইনি ও। বিন্দুমাত্র ভয় ওর বুকে বাসা বাঁধেনি তখনো কিন্তু ইন্দ্র ট্যাক্সি থেকে নেমে যাওয়ার পর থেকেই ও বাড়ির কথা ভাবতে শুরু করেছিল। আর তখন থেকেই ও রীতিমত ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছিল। সেই সকালে পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আর এই ফিরছে সুতরাং কী কী বিশেষণ তাকে শুনতে হবে তা অনুমান করবার চেষ্টা করতে করতে বাড়ির দরজার গায়ে লাগানো কলিংবেলের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে মৃদু চাপ দিল। সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর দরজা খুলে গেল। দরজা খোলার পর মন্দিরা বাড়িতে তাকে নিয়ে ঝড় উঠেছে কিনা তা তপতীদেবীর চোখমুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করল, তার মুখ দেখে কিছুটা ভয় তাড়াতে পারল তবু তপতীদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, আসবার সময় মায়ের হাতে ঝাঁটা দেখে আসনি ত' ?

না, আমি ম্যানেজ করেছি তবে এরপর দেরি করলে তোমার কপালে ঝাঁটাই জুটবে। ভেতরে এসো আগে তারপর শুনব কেন এত দেরি হোলো ?

মন্দিরা ভেতরে ঢুকেই তপতীদেবীকে জড়িয়ে ধরল।

তপতীদেবী বললেন, তোমার গা থেকে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি মনে হোচ্ছে ?

অসম্ভব, ইন্দ্র সিগারেট খায় না।—কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মন্দিরার।

তপতীদেবী হেসে ফেললেন, বললেন, প্রেমে পড়লে মন্দিরার মত বুদ্ধিমতী মেয়েরাও কতটা বোকা হোয়ে যেতে পারে দেখলে ত'। বুঝলাম এতক্ষণ তুমি ইন্দ্রর সঙ্গে ছিলে এবার বল তুমি এ বিশাল পৃথিবীতে শুধু ওকে নিয়ে থাকতে পারবে ত' ? আমি জানি ওকে জীবন-সঙ্গী করলে তুমি শুধু আত্মীয়-স্বজনই নয় তোমার বন্ধু-বান্ধবদেরও হারিয়ে বসবে। তখন একাকিত্বের জন্য তুমি কতটা অসহায় বোধ করবে তা ভাবতে পারছ না এখনো। আমি তোমাকে বলছি ইন্দ্র যতই ভাল ছেলে হোক তুমি আরো একবার ভাব।

মন্দিরা তপতীদেবীকে দু'বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ রেখেই বলল, আমার ভালবাসাকে সন্দেহ কোর না বৌদি। একটা জীবন ঐ একটা মানুষকে নিয়েই দিব্বি কাটিয়ে দিতে পারব।

ওর কথার পর তপতীদেবী বললেন, ঠিক আছে এবার আমাকে ছাড় আর কেন তিন-চার ঘণ্টা ধরে ত' অনেক হয়েছে।

কী ?—মন্দিরা কথাটা বুঝে উঠতে না পেরে প্রশ্নটা করে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তপতীদেবী চোখের মনি নিচের দিকে নামিয়ে ওর বাহুদ্বয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করায়।

এবার ওর বুঝতে অসুবিধা হয় না, বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, তুমি ভারি অসভ্য বৌদি।

তপতীদেবী ওর কথার পৃষ্ঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার ঠোঁট থেকে কথা খসার আগে সুদেষ্ণাদেবীর গলার স্বর ভেসে এলো ওপর থেকে।—বৌমা মন্দিরা এসেছে—না? এতক্ষণ তোমরা নিচে দাঁড়িয়ে কী করছ?

যাই মা।—তপতীদেবী গলা চড়িয়ে সুদেষ্ণাদেবীর কথার জবাব দিলেন। দিয়েই মন্দিরাকে বললেন, আর নয় চল-চল উপরে যাই আরো দেরি করলে মা হয়ত নিচে নেমে আসতে শুরু করবেন।—বলেই সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন।

ওরা উপরে উঠে আসার পর সুদেষ্ণাদেবী মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এত রাত করিস কেন দিনকাল ভাল নয়, এই ত' একটু আগে ছোটলোকগুলো যা করছিল—এক এক সময় মনে হয় বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলি তোর বাবাকে।—এ পর্যন্ত বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে আসলেন, বললেন, বাড়িতে একটু বলে-টলে যেতে পারিস ত', এত রাত করলে চিন্তা হয় না! তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই রূপকুমার ছিল? ওকে ত' একদিন এখানে নিয়ে আসতে পারিস?

মন্দিরা এটা-সেটা বলে কোনো রকমে কথাটা পাশ কাটিয়ে ওর ঘরে চলে এলো। এরপর পোশাক পরিবর্তন করেই সোজা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। পাঁচ-দশ মিনিট যেতে না যেতেই তপতীদেবী এসে হাজির ওর ঘরে। ওকে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, কী ব্যাপার তুমি শুয়ে পড়লে যে, খাবে না? নাকি ইন্দ্রর সঙ্গে ঘুরেই পেট ভরে গেছে?

ও যে ভাবে শুয়েছিল সেভাবে শুয়ে থেকে বলল, বাজে কথা রাখ, খাবার ইচ্ছে নেই তাই খাব না। আচ্ছা বৌদি ওরা কী করছিল একটু আগে?

ওরা কারা?

মা যাদের কথা বলল।

আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিল। আমাদের বললাম বটে তবে ঠিক আমাদের নয়—রায়বাবুদের।

কেন?

আজ সকালে তরুণের বৌ কাজের লোককে তার একটা দুল খোয়া যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চোর-টোর বলেছিল, পরে ওটা পেয়েছিল। চাদরের এক কোণে আটকে ছিল। সেই ব্যাপার নিয়ে ওরা দল বেঁধে রায়বাবুদের যা-তা বলে গেছে।

কী যা-তা বলেছে?

কী বলতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হোচ্ছে তোমার? তুমি জানো না ওরা কী বলতে পারে? ওদের কথা আমাদের মুখ থেকে বেরোবে না। তুমি মানদার মুখে খারাপ কথা শুনেছ কখনো? আমি ত' ভাবতেই পারিনি তার মুখ দিয়ে এত খারাপ কথা বেরোতে পারে। কী বলেছিল শুনবে?—তপতীদেবী প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করলেন, বলে কিনা সমস্ত রাত স্বামী-স্ত্রী দস্যিপনা করবে কানে দুল থাকবে কী করে। না পেলেই যত দোষ

ধাড়ির ঝিয়ের ঘাড়ে এসে পড়বে। পেটের দায়ে বাড়ি বাড়ি গতর খাটিয়ে খাই তাই বলে বাবুরা আমাদের যা খুশি বলবে!

অন্যায় ত' কিছু বলেনি।

তপতীদেবী বললেন, তুমি ত' এখন বলবেই এ কথা।—বলেই বললেন, তুমি সত্যি কিছু মুখে দেবে না?

না। তুমি যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেও, দরজাটাও টেনে দিও।

ইন্দ্রর ধ্যান করতে অসুবিধা হোচ্ছে? ঠিক আছে যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে দিয়েই যাচ্ছি।—তপতীদেবী কথাটা শেষ করেই ঘরের সুইচ নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তপতীদেবী বেরিয়ে যাবার পর মন্দিরা ওর ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছবি এঁকে চলল নিজের মনে মনে। যদিও ও বার বার বলে আসছে শুধুমাত্র ইন্দ্রকে নিয়ে কাটিয়ে দেবে জীবনটা তবু ওর মনের ভেতর অন্য একটা ছবি আছে। ওর ধারণা একদিন না একদিন ইন্দ্র তাদের সমাজে ঠাঁই পাবে। ওর মত এমন একটা অসাধারণ ছেলের দিকে মানুষ ক'দিন আর মুখ ফিরিয়ে থাকবে! হয়ত তার বাবা-মাও একদিন তাদের কাছে টেনে নেবে। এরকম একটা সুপ্ত আশা ওর মনের কোণে মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যায়। পাঁকে জন্মেও যদি পঙ্কজ দেবতার পায়ে ঠাঁই পায় তাহোলে ও কেন এত অবহেলিত হোয়ে থাকবে! ইন্দ্রকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে কোনো এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন ভোর হোতে না হোতেই বৌদি ওকে ডেকে তুলল। তুলেই বলল, মন্দিরা তাড়াতাড়ি উঠে পড় তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারি কথা আছে। জল অনেক দূর গড়িয়েছে।

কী ব্যাপার বৌদি?—মন্দিরা তপতীদেবীর কথা এবং কণ্ঠস্বর শুনে বোঝে কিছু একটা হয়েছে, কিছু না হোলে সাত-সকালে বৌদির কণ্ঠে উৎকণ্ঠার আভাষ পাওয়া যেত না। বুঝেই প্রশ্ন করতে করতে লাফিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে।

তোমরা কাল কোথায় গিয়েছিলে?

মন্দিরা জানালো কোথায় গিয়েছিল।

শুনে তপতীদেবী বললেন, তাহোলে তোমার দাদা তোমাদেরই দেখেছিল।—এরপরই কখন কোথায় ওদের দেখেছে জানালো। থিয়েটার রোড আর ক্যামাক স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। উনি তখন চলন্ত বাসের জানালার কাছে। যেহেতু জানালার কাছে থাকলেও দাঁড়িয়ে ছিলেন সেহেতু বাইরের সব কিছুর উপর তার নজর পুরোপুরি পড়ছিল না বলেই খুব ভালভাবে ওদের দেখেছেন এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না, মনে একটু সংশয় আছে। মন্দিরাকে উনি স্পষ্ট দেখেছেন কিন্তু ইন্দ্রকে নিয়ে তার মনে একটু সংশয় আছে। আসলে যেহেতু উনি ভাবতেই পারছেন না ব্যাপারটা তাই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না ছেলেটা ইন্দ্রই ছিল। উনি তপতীদেবীকে জানিয়েছেন তার মনে হোলো মন্দিরা বচ্ছিরই একটা ছেলের সঙ্গে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মনে সংশয় ছিল বলে

বললেন, এতই ভুল দেখলাম !—তপতীদেবী সুভাষবাবুকে বুঝিয়েছেন তিনি ভুলই দেখেছেন, যাকে দেখেছেন সে রূপকুমার হোতে পারে। এ কথা তাকে জানালেও তার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বুঝেছিলেন ইন্দ্রকেই দেখেছেন।

মন্দিরা মনে মনে ভাবতে থাকল বৌদির কথায় যদি ধরে নেয় সে ভুল দেখেছে তাহোলে এখন ঐ ব্যাপার নিয়ে কিছু হবে না কিন্তু তার মনে যদি সন্দেহ জমা হোয়ে থাকে এখনো তাহোলে দাদা তার উপর নজর রাখতে শুরু করবে। তার পক্ষে যদি কিছু জানা সম্ভব হয় তাহোলে এ বাড়িতে তার আয়ু যে আর বেশি নয় তা অনুমান করতে কষ্ট হোলো না।

কী করবে মন্দিরা ?—প্রশ্ন করলেন তপতীদেবী।

কী আবার করব তুমি যাকে রূপকুমার বলে পরিচয় করিয়ে আসলে তার সত্যি-কারের নামটা দাদা যদি জানেন তাহোলে তখন আমি ভাবব কী করব, এখন তা নিয়ে ভেবে মাথা ধরাতে পারব না।

তোমার ভয় করছে না ?

ভয় ! ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ যে কাজকে অন্যায় বলে ভাবতে পারি না সে কাজের জন্য ভয় পাব কেন !

বেশ মানলাম তোমার ভয় নেই কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হোয়ে গেলে কী করবে তুমি ভেবে দেখেছ ?

এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে এই সহজ কথাটা অনুমান না করতে পারার কথা ত' নয় বৌদি। তুমিও জানো কী হবে আমিও জানি কী হবে।

কোথায় যাবে ? ওর কোর্স কমপ্লিট হওয়ার আগেই যদি বিয়ে করতে হয় তোমাদের তাহোলে আমি বুঝে উঠতে পারছি না কী করে চলবে, কী হবে তোমাদের !

জানি না। যা হবার হবে ও নিয়ে তুমি আর ভেব না বৌদি।

মন্দিরার কথায় বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হোতে পারলেন না তপতীদেবী। দুশ্চিন্তার রেখা ঘন হোয়ে পড়ল তার কপালে। দু'চোখে তার ভয়ের আভাষ। চিন্তার জালে জড়িয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ নিজেকে তারপর যেটা তার মনে এলো সেটা শোনালেন, ওকে, তুমি এক কাজ কর মন্দিরা ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন মেলামেশা বন্ধ রাখ। যদি তোমার দাদা জেনেও ফেলে তাহোলে আমি তাকে বলে দেব ওর সঙ্গে এখন আর তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

না, আর যাই বল কখনো একথা বোল না। ইন্দ্রর কথা আমি জানাতে চাই না এখনই একথা ঠিক কিন্তু ওর কথা উঠলে আমি অস্বীকার করতে পারব না। যা হবার হবে তা নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।—বক্তব্য শেষ করে মন্দিরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এরপর ও প্রতি মুহূর্তেই অপেক্ষা করে থেকেছে একটা ডাক শোনার জন্য। ভেবেছিল ওর দাদা ক্যামাক স্ট্রীটে যে ছেলেকে দেখেছিল সে ইন্দ্র কিনা জানতে চাইবে ওর কাছ থেকে। দিন দুয়েক অপেক্ষা করে থাকার পর

বুঝল এবার বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল। বিপদের হাত থেকে সাময়িক ভাবে রক্ষা পেলেও ও বুঝতে পারল যে কোনোদিন তাদের ব্যাপারটা বাড়ির মানুষদের গোচরে আসতে পারে। বাড়ির লোক জানলেই ঝড় উঠবে। এ কথা ভেবে ও এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হোতে থাকল এবং ইন্দ্রকেও প্রস্তুত থাকতে বলল। সত্যি মাস চারেক যেতে না যেতেই ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের দাপটে ও বাড়ির বাইরে।

সুভাষবাবু ওকে আবার একদিন দেখে ফেললেন ইন্দ্রর সঙ্গে। এবার আর কোনো সংশয় থাকল না দেখেই বুঝলেন মাস চারেক আগে ঐ বস্তির ছেলেটার সঙ্গেই মন্দিরাকে দেখেছিলেন। বাড়িতে এসেই প্রথমে তপতীদেবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তুমিও শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে ?

যে ভাবে সুভাষবাবু কথাটা বাড়ি ফিরেই তপতীদেবীকে বললেন তাতে তিনি বুঝতে পারলেন না ঝড়ের উৎস স্থানটা কোথায় ? কী বলতে চাইছেন বুঝতে না পেরে বললেন, তুমি কী বলতে চাইছ যদিও তার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না তবু বলি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা সকলকেই বলতে হয়।

চুপ কর তুমি আর কথা বলতে এসো না, মানুষ প্রয়োজনে মিথ্যে বলে ঠিকই তাই বলে এত বড় মিথ্যে বলতে কেউ পারে তা ভাবাই যায় না ! রূপকুমার না কী যেন নাম বলেছিলে সেই ছেলেটার যার সঙ্গে মন্দিরাকে চার মাস আগে ঘুরতে দেখেছিলাম সেই যে ইন্দ্র এ কথা তুমি জানতে, বল জানতে কিনা ?

তপতীদেবী কী বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নত করে বসে থাকলেন।

চুপ করে থেকো না তপু বল জানতে কিনা ?—সুভাষবাবুর কণ্ঠ থেকে যেন ফুটন্ত প্রশ্নটা আছড়ে পড়ল তপতীদেবীর মুখের উপর।

তপতীদেবী বুঝলেন এখন আর কোনো ভাবেই চুপ করে থাকা চলে না তাই বললেন, জানতাম। ওরকম একটা বস্তির ছেলের সঙ্গে মন্দিরা মিশছে জেনেও তুমি মিথ্যে বলতে পারলে ! আমার বোনের এত বড় ক্ষতি করার অধিকার তোমায় কে দিল ?

ইন্দ্র বস্তিতে জন্মালেও অশিক্ষিত নয়, ও সি-এ করছে।

ইমপসবল্।

কয়েক পা দূরেই ত' ও থাকে খোঁজ নিয়ে দেখই না কথাটা মিথ্যে না সত্যি।

সুভাষবাবু এবার আর কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলেন না, না পারলেও একটা বস্তির ছেলের সঙ্গে তার বোন মেলামেশা করুক এটা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। রাগে কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। তপতীদেবী একটু আগে ঘর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই তাকে না পেয়ে এখন কাকে তার রাগের আঁচে পোড়াবেন ভেবে পেলেন না। মন্দিরাকে যে কিছু বলবেন এখন তার উপায়ও রেখে যায়নি তপতীদেবী। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে জানিয়ে গেছিলেন এই রাত্রে যদি সুভাষবাবু মন্দিরাকে ডেকে অশান্তি বাধান তাহোলে আজই এই

রাত্রে তিনি এক কাপড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবেন। যা বলবে তা যেন সকালের পূর্বে না বলা হয়, এই নির্দেশ দিয়ে তবেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। রাত্রে সুভাষবাবু কিছু না বলতে পারলেও ভোর হোতেই তার ভারি কণ্ঠস্বরে যেন সমস্ত বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

মন্দিরা আগের দিনই পাশের ঘর থেকে দাদা বৌদির কথোপকথন শুনেছিল। এরপর যখন মেঘের গর্জনের মত দাদার কণ্ঠস্বর গমগম করতে শুরু করল তখন ওর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোলো না ঐ ভাবে তাকে কেন ডাকা হোচ্ছে। কী কথা ওকে শুনতে হবে তা ও ভাল ভাবেই অনুমান করতে পারল। ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল বলে কালবিলম্ব না করে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো সুভাষবাবুর ঘরের চৌকাঠের কাছে।

সুভাষবাবু ওকে দেখেই যেন ফেটে পড়লেন, তুই ভদ্রঘরের মেয়ে হোয়ে একটা লোফারের সঙ্গে···

নিজেকে সংযত কর দাদা, যাকে তুমি লোফার বলছ তার মত ভদ্র আমরা কেউ নই, তুমিও নও।—ধাতব কোনো কিছুর মধ্যে সজোরে আঘাত করলে যে ভাবে বেজে ওঠে সেভাবে যেন বেজে উঠল মন্দিরা। কঠিন কণ্ঠে সুভাষবাবুর কথার প্রতিবাদ জানালো ও।

কী—ই-ই!—একটা ছোট্ট কথার মধ্যে আটকে গেলেন সুভাষবাবু। ঐ একটা কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না।

মন্দিরাই আবার কথা বলে উঠল, শুধু তাই নয় ও আমাদের প্রত্যেকের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত হোয়ে উঠছে। সহ্য করতে না পারলেও একটা সত্যি কথা শোন আমাদের উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও ওর মত শিক্ষিত হোয়ে উঠতে পারিনি অথচ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে ও নিজেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা ত' দেখতেই পাচ্ছ।

শাট্-আপ্, তুই জানিস আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার পরিণাম কী হোতে পারে? আমাকে অপমান করার সাহস হোলো কী করে তোর!—মন্দিরার কথার পরেই যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হোলো। সুভাষবাবুর রাগে সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকল।

তোমাকে অপমান আমি করিনি তুমি নিজেকে নিজেই অপমান করছ। পরিণামের কথা বলছ! পরিণাম আমার জানা, এ বাড়ির অন্ন কাল রাতেই শেষ খাওয়া হোয়ে গেছে। কথা শেষ করেই ঝড়ের মত তার ঘরে এসে সুটকেসটায় কয়েকটা জামা-কাপড় ভরে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সুদেষ্ণাদেবী আজ সকালে জানতে পারেন ঘটনাটা। জানার পর থেকে কী করবেন ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। ছোটলোকদের একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট হোয়ে উঠছে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এবং যেহেতু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সেহেতু তখন থেকেই কথাটার যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার

জন্য একে-তাকে বিস্তর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। ছেলের কাছে গেছিলেন কিন্তু কোনো কথাই তার বলা সম্ভব হয়নি। ছেলের মুখে যেন তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব, ভরসা পাননি মুখ খুলতে। এরপর যখন দেখলেন মন্দিরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে। ও যখন বাড়ির দরজা খুলে ফেলবে বলে ছিটকিনিটা নামাতে যাচ্ছে তখন তার খেয়াল হোলো ও বরাবরের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। খেয়াল হোতেই ছুটে ওর কাছে এসে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস ?

যেখানে আমার যাবার কথা।

ঐ বস্তিতে ?

মন্দিরা প্রশ্নের উত্তর দিল না, উত্তর না দিয়ে নীরবে সুদেষ্ণাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে যে ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল।

বাড়ি ছাড়ার আগে আরো একবার ভেবে দেখ, মেয়েরা বাড়ির বাইরে একবার পা রাখলে আর ফিরে আসার উপায় থাকে না। যার জন্য ঘর ছাড়ছিস সে শিক্ষিত হোলেও ছোটলোকের ছেলে, মোহের বশে তার দিকে ছুটে যাচ্ছিস বটে কিন্তু একদিন আফশোষ করতে হবে কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের কখনই···

এ নিয়ে এ সময় তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না মা, আর কিছু কী বলার আছে তোমার ?

সুদেষ্ণাদেবী যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে আরো দু'পা এগিয়ে প্রায় মন্দিরার গা ঘেঁষে ওর হাতটা ধরে বললেন, ওকে তুই ছেড়ে দে আমি কথা দিচ্ছি প্রয়োজন হোলে বাড়ি বিক্রি করেও তোর সঙ্গে কোনো ভাল ছেলের বিয়ে দেব।

এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই ত' মা ?—প্রশ্নটা করেই সুদেষ্ণাদেবীকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল মন্দিরা।

তুই তাহোলে ওকেই বিয়ে করবি ?

হ্যাঁ।

ওই তোর কাছে বড় হোলো আমরা তোর কেউ নই। দশ মাস দশ দিন গর্ভে নিয়ে বয়ে বেরিয়েছি হাজার কষ্ট সহ্য করে। তোর বাবা আর আমি মিলে তিলে তিলে একটা ছোট্ট রক্ত-মাংসের পিণ্ডকে বড় করে তুলেছি তার কী এই প্রতিদান!

ভুল বলছ মা তোমরা আমার কাছে কতটা তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। তোমরা একটা ভুল করছ, আমার জীবনটা আমারই সুতরাং ভালমন্দ যা কিছু বোঝার তা আমাকেই বুঝে নিতে হবে। আমার যদি শারীরিক অসুস্থতার জন্য কষ্ট পেতে হয় তা তুমি কিম্বা বাবা হাজার চেষ্টা করলেও নিজের শরীরে তা নিয়ে নিতে পারবে না। ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ সবই আমার নিজস্ব সুতরাং আমি যা করছি তা নিজের কথা ভেবেই করছি। সত্যি কথা বলতে কী তোমরা তোমাদের জায়গায় থাকবে ও ওর জায়গায় থাকবে। আরো একটা কথা শোন তোমাদের পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হোলেই যে আমি সুখী হব এ নিশ্চয়তা কোথায়!

নিশ্চয়তা আছে কারণ যে ছেলেকে আমরা ঠিক করব সে আমাদের সমাজেরই একজন হবে সুতরাং খুব খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম অন্তত তোর ঐ ছোটলোকের ছেলেটার থেকে অনেক ভাল হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

মা তুমি বার বার ওকে ছোটলোকের ছেলে কেন বলছ? গরীব হোলেই ছোটলোক হয় না, এ নিয়ে আর তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমাকে যেতে দাও। —মন্দিরা বুঝতে পারছিল ওর মা যত কথাই বলুক-না কেন যে সিদ্ধান্ত ওর দাদা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা তার নেই, শুধু মা'ই নয় এ বাড়ির কেউই তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। মন্দিরাও কোনো অবস্থাতেই তার সিদ্ধান্ত থেকে সরতে পারবে না সুতরাং এভাবে অজস্র কথার মালা গাঁথার কোনো অর্থই হয় না তাই ও এক টানে ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এরপর একই গতিতে পিচের রাস্তা পেরিয়ে ইন্দ্রদের ঝুপড়ির দিকে অগ্রসর হোতে থাকল।

পুটু ঝুপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁতে তামাক ঘঁষছিল হঠাৎ ওর চোখ পড়ল মন্দিরার উপর। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়ালো তার কাছে।—কী ব্যাপার মন্দিরা হঠাৎ কী মনে করে এত সকালে? হাতে স্যুটকেসই বা কেন? কোথাও যাচ্ছ?

না, এখানেই আসছি, এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না এখন সব কথা তোমাকে বলতে পারব না, ইন্দ্রকে ডেকে দেবে?

ইন্দ্রকে তুমি কোথায় পাচ্ছ এখন? সে সেই কাক-ডাকা ভোরে ঘর থেকে বেরিয়েছে, ফিরতে ফিরতে বিকেল হোয়ে যাবে।

তাহোলে? কী করি এখন?—মন্দিরা যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল।

পুটু স্যুটকেস হাতে ওকে দেখে কিছু একটা সন্দেহ করেছিল এখন প্রশ্ন শুনে বুঝল সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। ওর হাতে স্যুটকেস না দেখতে পেলে হয়ত ওর মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা হোত না। ও কয়েক পা এগিয়ে মন্দিরার খুব কাছে সরে এসে বলল, তোমাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল এখন তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি সাংঘাতিক কিছু হয়েছে, কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বল।

আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, না এসে উপায় ছিল না।

আমাদের বস্তির ভেতর তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাবার কথা বলতে আমার খুবই অস্বস্তি হোচ্ছে তবু না বোলেও পারছি না, এভাবে তোমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ত' আর রাখা যায় না।

আমি বরং আমার কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকি এ বেলা বিকেলে এসে না হয় ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা করব।

পুটু তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, যদিও তোমার খুব অসুবিধা হবে তবু তোমাকে আমি এখন ছেড়ে দিতে পারি না। ইন্দ্র

কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে না বলেই জানি কিন্তু এখন আমার মনে হোচ্ছে একবার অন্তত ও সত্যি কথা বলেনি। ও জানিয়ে ছিল তুমি ওর বন্ধু এর বেশি কিছু নয় অর্থাৎ আর কোনো সম্পর্ক তোমাদের মধ্যে নেই কিন্তু আমার মনে হোচ্ছে এই একটা মিথ্যে ও আমাকে বলেছে। তুমি ওকে ভালবাস এটা বুঝতে পারছি তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

মিথ্যে ও বলেনি, তুমি কবে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলে ?

পুটু মনে করার চেষ্টা করল, এর পর দিনক্ষণ মনে করতে না পেরে বলল, অত কী মনে আছে তবে বলে যে ছিল তা মনে আছে, মাস কয়েক হোয়ে গেছে, কেন বলত ?

তোমাকে যখন জানিয়েছিল তখন সত্যি ও আমার শুধুমাত্র বন্ধু ছিল, পরে আমরা পরস্পরের কাছে চলে আসি।

তুমি ওকে বিয়ে করবে ?

মন্দিরা মাথা ঝাঁকিয়ে পুটুর কথার উত্তর দিল।

মন্দিরার মতামত জানতে পেরে পুটু যে যথেষ্টই খুশি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। খুশি হোলেও ও মন্দিরার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চাইল, বলল, বেশ ভাল কথা কিন্তু আমার একটা ইচ্ছে অপূর্ণ না থাকে তার জন্য তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মন্দিরা পুটুর দিকে তাকাল কিন্তু কী কথা দিতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করল না।

আমার ইচ্ছে ও পড়াটা শেষ করুক।

আমারও ইচ্ছে, উপায় থাকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম না এখনই।

আর একটা কথা বলার আছে তোমাকে, তুমি যেখানে জন্মেছ তাতে আমাদের সঙ্গে কোনোদিনও থাকতে পারবে না, থাকা যায় না। আমি চাইব তোমরা বিয়ে করার পর অন্য কোথাও গিয়ে ওঠ। ভাল কোথাও বাড়ি ভাড়া করে নেবে। যতদিন না ইন্দ্রর পড়া শেষ হোচ্ছে ততদিন তোমাদের যাবতীয় খরচ আমি চালাব।

আমি ইন্দ্রর কাছে শুনেছি তুমি ওর পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করছ এর উপর যদি আমাদের সংসার চালাতে হয় তাহোলে তোমাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আমার গলায় যেটা আছে সেটার ওজন খুব কম নয় ওটা বেচে যা পাওয়া যাবে তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। মনে হয় আর কয়েক মাস টানতে পারলে ওর পড়া শেষ হোয়ে যাবে তারপর ত' কোনো সমস্যাই থাকবে না।

তোমাকে অতশত ভাবতে হবে না আর আমার জন্যও এত চিন্তিত হোও না। ক'টা দিন আর একটু বেশি পরিশ্রম করলে হারিয়ে যাব না ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। যাক আর কথা নয় চল ঘরে গিয়ে বসি আগে তারপর ভাবা যাবে কী করা হবে। —পুটু যে হাতটা মুক্ত ছিল সে হাতটা দিয়ে মন্দিরার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাদের ঝুপড়ির দিকে।

॥ সাত ॥

মন্দিরাকে ঘিরে পুটু, যুধিষ্ঠির, লালি আর চাঁপা বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে ইন্দ্রও ছিল। পুটুর কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেছে মিনিট কুড়ি আগে। অনেকগুলো টাকা পুটু ওর হাতে তুলে দিতে ইন্দ্র একটু অবাক হয়েছিল। ভেবে পায়নি এত টাকা ওর কাছে থাকে কী করে। মডেলিং করে কত অর্থ উপার্জন হোতে পারে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোনো ধারণা ওর নেই। ও যদিও পুটুকে সন্দেহ করতে পারে না তবু এত টাকা এক সঙ্গে ওকে বার করতে দেখে চুপ করে থাকতে পারেনি, জানতেও চেয়েছে এত টাকা থাকে কী করে ওর কাছে। প্রশ্ন করেছে কিন্তু জেরা করেনি। প্রশ্ন শুনে পুটু বলেছে, আমি কী করি তা তুই জানিস তাহোলে এ প্রশ্ন কেন? সত্যি কথাটা বলত তুই কী আমাকে অবিশ্বাস করিস?

ইন্দ্র বুঝতে পারল প্রশ্নটা করে ও বিপদ পড়ে গেছে, পুটুকে সন্দেহ করে না অথচ যে প্রশ্ন করেছে তাতে সন্দেহ সে করে না তা প্রমাণ হয় না তাই ও বলল, না-না তা নয় আসলে এত টাকা একসঙ্গে দেখে কী বলতে কী বলছি বুঝে উঠতে পারি নি, এত টাকা তোর কাছে ছিল সেকথা জানতাম না বলেই…

ঠিক আছে, এখন আর কথা নয় সময় খুব কম তাতাতাড়ি যা হোক করে কাজটা মিটিয়ে ফেলতে হবে তুই আর দেরি করিস না।—এই মুহূর্তে পুটু ইন্দ্রকে তাড়াতে চাইল। যে প্রশ্ন ইন্দ্র করেছিল তার সত্যিকারের উত্তরটা জানাতে পারবে না। ও একজনের রক্ষিতা এ কথা ইন্দ্র জানতে পারলে ওর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে পড়বে। ও কতটা ছোট হোয়ে যাবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভীত নয়, শুধু ইন্দ্রর কথা ভেবে ওর জীবনের এই একটা স্বর্গ ও আড়াল করে রাখতে চায়। এতদিন শুধুমাত্র ইন্দ্রকে নিয়ে ভেবেছে এবং এখনো ভাবছে কিন্তু ইদানীং আরো একটা মানুষকে নিয়েও ওকে ভাবতে হোচ্ছে, সেই মানুষ তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ও প্রয়োজনের তাগিদে শরীর বেচে বসেছিল কিন্তু এখন চতুর্বেদীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক শুধু শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ও কতটা মন মানুষটাকে দিতে পেরেছে তা নিজেই জানে না তবে মানুষটা যে ওকে মনে ঠাঁই দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক একদিন ওর শরীর স্পর্শ না করেই মানুষটা রাশি রাশি টাকা ওর হাতে গুঁজে দেয়। পুটু টাকা নিতে রাজি না হোলে রীতিমত রেগে যায়। বলে, মানুষ একটা কিছু নিয়ে বাঁচে আমি তোমাকে নিয়ে বেঁচে আছি। বিশ্বাস কর পুটু শরীরের খেলা খেলব বলে একদিন একটা মেয়েকে চেয়েছিলাম কিন্তু তখনো বুঝিনি কখন কী ভাবে যেন শরীর নিয়ে খেলতে খেলতে শরীর অতিক্রম করে মন নিয়ে খেলার পালা শুরু হোয়ে গেছে। তুমি এখন আমার কতটা তা তোমাকে আমি কী ভাবে বোঝাব বুঝে উঠতে পারছি না।—পুটু একথা শোনার পর কী বলবে ভেবে পায়নি তবে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে মানুষটাকে আর কষ্ট দিতে চায়নি। মানুষটার কাছ থেকে অনেক টাকাই ও পেয়েছে, যা পেয়েছে তা জমিয়ে রেখেছে। অকৃপণ হাতে বাড়তি খরচ এক

পয়সাও করেনি। সব সময় ভেবেছে এই অর্থের যতটা ও রাখতে পারবে তা একদিন তার প্রয়োজন হবে। নিজের জন্য নয় ইন্দ্রকে এই নোংরা পরিবেশ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হোলে অনেক টাকার যে প্রয়োজন হবে তা ও জানে। এ কথা ঠিক ইন্দ্র এমন চাকরি পাবে যে তার বিন্দুমাত্র আর্থিক সমস্যা থাকবে না তবু চাকরি পাওয়ার পূর্বেই ওর টাকার প্রয়োজন হোতে পারে ভেবে পুটু পাই-পয়সার হিসাব করছিল। ওর একটা ভয় ছিল, ভয় মন্দিরাকে নিয়ে। ইন্দ্র যদিও ওকে জানিয়েছিল মন্দিরার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের তবু ওর মনে হয়েছিল আজ হোক কাল হোক ওরা পরস্পরের কাছে সরে আসবেই। মন্দিরা ইন্দ্রকে ভালবাসার পর বেশিদিন বাড়ির নিরাপদ চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে পারবে না। বাড়ি ছাড়তে হবেই ওকে। বাড়ি ছাড়ার সময়টা যদি ইন্দ্রর পড়া শেষ হওয়ার আগে হয় তাহোলে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী ভাবে এসে পড়বে। তার অনুমান আজ সত্যে পরিণত হোলো। এতদিন টাকা-পয়সা জমিয়ে রেখেছিল বলেই আজ অনেক-গুলো টাকা ইন্দ্রের হাতে তুলে দিতে পারল একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য। কুমারী অবস্থায় মন্দিরাকে এখানে আটকে রাখা যায় না তাই তাড়িঘড়ি করে ইন্দ্রর সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে চাইল পুটু। মন্দিরা বাড়ি ছেড়ে চলে আসায় ও খুশি হোয়েছে ঠিক কথা কিন্তু সেই সঙ্গে যে দুশ্চিন্তার মেঘ এসে জড়ো হোচ্ছে, তাদের চারপাশে সেটা ভাল মতনই অনুভব করতে পারছিল ও। মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধলে ওদের অস্তিত্ব কতটা বিপন্ন হবে তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারলেও কিছুটা অনুমান করতে পারছিল। সেই ভয়েই ও চাইছিল খুব তাড়াতাড়ি ওদের বিয়েটা হোয়ে যাক। বিয়ে হোয়ে গেলে মন্দিরার বাড়ির মানুষদের আর কিছু করণীয় থাকবে না, থাকলেও ওদের দু'জনকে এখান থেকে সরিয়ে দিলে যা কিছু ক্ষতি তারা করতে পারবে তাতে অন্তত ওদের দু'জনের গায়ে কোনো আঁচ লাগবে না। যা কিছু ক্ষতি হবে তা শুধুমাত্র পুটুদের। সে ক্ষতির ভয় ওর নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের বিয়েটা হোয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। মনে মনে ও ঠিক করে ফেলল যত কষ্টই তার হোক ইন্দ্র আর মন্দিরার সংসারটা গড়ে দেবে। যত দিন না ইন্দ্রর পড়া শেষ হোচ্ছে ততদিন ওদের সংসার টানবে। কয়েক মাস টানতে পারলেই ইন্দ্রর পড়া শেষ হোয়ে যাবে, তখন ওর আর কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না ওদের জন্য। এটাই ওর স্বপ্ন। এ ছাড়া আর কিছু চায় না ও, কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। কোনো কিছুই আর বাকি থাকবে না। মনে মনে ভাবে এরপর যদি তার কাছে মৃত্যুও এসে দাঁড়ায় তাহোলে ও বিন্দু-মাত্র বিচলিত হবে না। হাসিমুখে তা বরণ করে নিতে পারবে। এখন শুধু মন্দিরা আর ইন্দ্রকে ঘিরে যত দুশ্চিন্তা, ভয়-ভাবনা। ও মন্দিরার কাছ থেকে যা শুনেছে তাতে ওর ভয় হোচ্ছে মেয়েটার বাড়ির লোকজন এসে না ঝঞ্ঝাট বাঁধায়। এই ভয়ে ও স্থির থাকতে পারছিল না, কী করবে তা ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে বলল, কী হবে বলত যদি ওদের বাড়ির লোক পুলিশ নিয়ে

আসে। দেখ-না কিছু করতে পারিস কিনা।—যুধিষ্ঠিরকে বলার অর্থ পুটু জানে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইতিপূর্বেও কয়েকবার কিছু কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ আর ওর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। পরাজয় অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যুধিষ্ঠির এবং তার দলবলের হয়েছে। আজকাল পুলিশ ওকে বিশেষ ঘাটাতে চায় না। রাজনৈতিক এক নেতার হোয়ে কাজ করার পর থেকে পুলিশ ওর ক্ষেত্রে অনেক নিষ্ক্রিয় হোয়ে থাকছে। পুটু পুলিশের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সংঘর্ষ হোক এটা চায় না কিন্তু আজ নিরুপায় হোয়ে সরাসরি না হোলেও ওর কাছে সাহায্য চেয়ে বসল।

যুধিষ্ঠির বেশ কিছুদিন যাবৎ অনেক সংযত জীবনযাপন করছে। চুমকীর সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হওয়ার পর থেকে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে চায়নি। কিন্তু আজ ও আর চুপ করে থাকতে পারল না, পুটুর কথা শুনেই নিজের মাথার চুলের একপাশ চেপে ধরল। ও রেগে গেলেই এইভাবে চুল মুঠোয় চেপে ধরে। এটা পুটুরা জানে। যুধিষ্ঠিরকে চুলের একপাশ মুঠোয় চেপে ধরতে দেখেই পুটু বুঝল মন্দিরার বাড়ির লোকজনকে ও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। এরই মধ্যে ওদের বিয়েটা দিয়ে ফেলতে হবে।

ইন্দ্র ফিরল ছ'টার সময়। ফিরেই জানালো সেদিন ত' দূরের কথা দিন দুয়েকের আগে কোনো লগ্ন নেই সুতরাং আরো দুটো দিন মন্দিরাকে কুমারী থাকতে হবে। এই দুটোদিন এখানে মন্দিরাকে রাখা চলে না দুটি কারণে, প্রথম কারণ কুমারী অবস্থায় এখানে থাকা সম্ভব নয়। বিপদের সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কারণ এই পরিবেশে ও থাকতে পারবে না।

পুটুও ওর সঙ্গে একমত তাই ও বলল, ঠিকই কিন্তু এখন কী করা উচিত?

মন্দিরা ওর প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল, দুটো দিনের ব্যাপার ত' ও নিয়ে ভাবতে হবে না, আমার এক বান্ধবীর কাছে থেকে যাব দুটো দিন। শুধু একটাই ভয় আমার জন্য হয়ত ইন্দ্রকে বিপদে পড়তে হোতে পারে কারণ আমার বাড়ির লোকজনরা যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তারা এখানে আসবেই। আমাকে না পেলে ওকে অপমান করতে চাইবে।

যুধিষ্ঠির মন্দিরাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ দাদাকে অপমান করে যাবে কেউ এটা ভাববেন না। আমাকে ভয় পায় না এমন কেউ এ অঞ্চলে নেই।

ওর কথায় মন্দিরা নিশ্চিন্ত ত' হোলোই না বরং তার উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। যারা আসবে তারা শত হোলেও তার আপনজন, ইন্দ্রকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের অপমানিত করার কথা ও ভাবতে পারে না, তাই যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, কী বলছ তুমি! যারা আসবে তারা কারা ভেবে দেখেছ? ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমার বাপ-দাদাকে অপমান করবে?

সত্যি কথা, যারা আসবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নে'য়া যায় না। ওটা

যুধিষ্ঠির ভাবেনি। ভাবেনি বলেই বলল, খুব ভুল হয়ে গেছে, আপনি আমার উপর রাগ করবেন না। আসলে কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছি। আচ্ছা তারা যদি পুলিশ নিয়ে আসে? মিথ্যে কোনো চার্জ এনে দাদাকে থানায় নিয়ে যেতে চায়?

এ প্রশ্নের উত্তর মন্দিরার জানা নেই তাই ও বলল, কী বলব বুঝতে পারছি না শুধু একটা কথা বলতে পারি, চেষ্টা করবে ওকে যেন থানায় নিয়ে যেতে না পারে। উপায় না থাকলে যে কোনো ভাবেই হোক আমার কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে! আমি কোথায় থাকব তা তোমাদের জানিয়ে যাব।

এতক্ষণ নীরবে ইন্দ্র ওদের কথোপকথন শুনছিল। মন্দিরার কথা শুনে বলল, আমায় নিয়ে এত ভেব না, থানায় নিয়ে গেলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চল তুমি যেখানে যাবে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পুটু বাধা দিয়ে বলে উঠল, না তোকে এ সময় আর ওকে নিয়ে বেরোতে হবে না, ওদের চোখে পড়লে কিছু একট অঘটন ঘটে যেতে পারে। ভালায় ভালয় দুটো দিন কাটলে হয়!—এরপরই যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওকে তুই পৌঁছে দিয়ে আসবি। একটু সাবধানে যাস।

মন্দিরা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, পুটুর কথা শেষ হোতেই বলল, আমি আমার যে বান্ধবীর বাড়ি যাব বলে ঠিক করে রেখেছি তার বাড়ি এখান থেকে খুব দূরে নয় সুতরাং পৌঁছে দে'য়ার প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

সে তুমি পারবে যে তা আমি জানি কিন্তু এ সময় তোমাকে একা ছেড়ে দে'য়া যায় না।—পুটু তার বক্তব্য শেষ করেই যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। এই তাকানোটা নিরর্থক নয়।

যুধিষ্ঠির বুঝল তাকে কী করতে বলা হোচ্ছে। বুঝেই মন্দিরাকে বলল, আর রাত করবেন না চলে আসুন।

ওরা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার পর পুটু একই ভাবে একই জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল। ওর আশঙ্কা ছিল মন্দিরার বাড়ির মানুষ যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ নিয়ে তাদের বস্তিতে হাজির হোতে পারে। এ কথাই ভাবছিল বসে বসে। শুধু সে সময়ই নয় পরেও একই কথা ভেবেছে এবং এই ভয়েই ও একটা রাত ভাল মতন ঘুমোতে পর্যন্ত পারল না। পরের দিন ছুটে গেছে চতুর্বেদীর কাছে। বিস্তারিত ভাবে সমস্ত ঘটনা তাকে জানিয়েছে। শুনে চতুর্বেদী ওকে আশ্বস্ত করেছে। বলেছে, আমি ত' আছি ভয় পাচ্ছ কেন। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমাদের কেশাগ্র পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আমার বিশেষ বন্ধু।—এ পর্যন্ত বলার পর চতুর্বেদী ওকে বুকের কাছে টেনে ওর চোখের পাতায় ঠোঁট ছুঁইয়েছে। এরপর ওর কপালের উপর থেকে আঙুলের ডগা দিয়ে চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলেছে, এর আগে অনেকবার একটা কথা জানিয়েছি আজ আবার সেই কথাটাই আরো একবার বলতে চাই, ওখানে আর পড়ে থেকো না এবার চলে এসো তোমরা সকলেই। শ্যামবাজারে আমার একটা ফ্ল্যাট

খালি পড়ে আছে, আসবে?—পুটু কখনই বাড়তি বিশেষ কিছু নিতে পারেনি। বার বার ওর মনে হয়েছে তার যা প্রাপ্য তার বাইরে মানুষটা কিছু বাড়তি টাকা-পয়সা জোর করেই দিয়েছে এরপর আর কিছু নে'য়া উচিত নয়। যদিও ও জানে নিলে মানুষটা খুশিই হয় তবু ও পারেনি। আজ ইন্দ্র আর মন্দিরার কথা ভেবে বলল, আমাদের আসা সম্ভব নয় যেখানে আছি বেশ আছি তবে ইন্দ্রর জন্য ওটা যদি দিতে পারেন তাহোলে এবার আর না করতে পারব না। দিলে কিন্তু একটা শর্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে, ইন্দ্র যখন চাকরি করবে তখন ভাড়া নিতে হবে। না করতে পারবেন না।—চতুর্বেদী আহত হোলো শুনে। আহত যে হয়েছে তা বোঝা গেল তার কথা শুনে, বলল, পুটু তুমি এ কথা বলছ! বলতে পারলে! এ বিশ্ব-সংসারে মাত্র দু'জনকে নিয়ে আমি, একজন আমার মেয়ে আর একজন তুমি। তোমার ভাই যদি ভাড়া একান্তই কখনো দিতে চায় তাহোলে সে টাকা তোমার হাতেই তুলে দিতে হবে কারণ ঐ বাড়িটা আমি তোমাকে দিয়ে দেব বলে ঠিক করে রেখেছি।—পুটু কী বলবে ভাবতে থাকল। আসলে ও অন্য কিছু ভাবছিল। চতুর্বেদীকে ও ভালবাসে কিনা তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি বলে তার এই দান নেবার অধিকার ওর নেই, কিন্তু সে কথা মানুষটাকে জানায় কী করে তা নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ তারপর বলল, আমার মত একটা খারাপ মেয়ের জন্য এভাবে ধন-সম্পত্তি বিলোবেন না, যা আপনাকে দিয়েছি এতদিন তা কড়ায়-গণ্ডায় ত' মিটিয়ে দিয়েছেনই এমনকি তার থেকে বেশিই দিয়ে ফেলেছেন এরপর আমার কোনো প্রাপ্য···। চতুর্বেদী ওকে কথাটা শেষ করতে দেয় না একটা হাত ওর মুখে চেপে ধরে বলে, প্রায় চার-পাঁচ মাস আমি কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেখিনি, এরপর তোমার কী ভাবা উচিত বলত? তোমাকে ভালবাসি এ কথা তুমি হয় বিশ্বাস কর না, না হয় তুমি আমাকে ভালবাসতে পারছ না। এর কারণ তুমি ভাবছ যে মানুষ পয়সা দিয়ে মেয়েমানুষের শরীর কিনতে চেয়েছে সে মানুষ ভালবাসতেই পারে না, অথবা তাকে বিশ্বাস করাই যায় না—কী তাই ত'?—পুটু কথাটা শুনে স্থির চোখে চতুর্বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎ মানুষটার জামার বোতাম খুলে দিয়ে ওর নগ্ন বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে লবণাক্ত জলে চতুর্বেদীর বুক ভাসালো। এরপর মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি কখনই সেরকম ভাবিনি আপনাকে। আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনি আমাকে মন-প্রাণ উজাড় করে ভাল-বাসেন তা আমার থেকে কেউ বেশি জানে না। আমি বলব এ আপনার অন্যায়। কোনো একটা বস্তির মেয়ের জন্য কেন নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন?—চতুর্বেদী পুটুর বাহুসন্ধিস্থলদ্বয় ধরে বলল, এর উত্তর আমি তোমাকে দিতে পারব না কারণ আমি নিজেই জানি না, শুধু জানি তুমি আমার।—পুটু জানত মানুষটা ওকে ভালবাসে কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথা শুনে ও কেঁপে উঠল। এমন মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায় না তবু পুটু ভাবে মানুষটাকে ও ঠকাতে পারবে না। মানুষটার অনুপস্থিতিতে ও আরো একজনের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছিল। অপবিত্র

ফ্ল দিয়ে দেবতার প্জো হয় না। মান্ষটার সঙ্গে প্রতারণা করতে ও পারবে না। চতুর্বেদীর কাছ থেকে ফিরে এসে ঝ্মরিকে জানিয়েছিল মান্ষটা কী চায়, কী তার অন্তরে আছে। তার বিষয়-সম্পত্তি সমানভাবে দ্'ভাগ করে মেয়ে আর প্টুকে দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ও হাত প্রসারিত করে দিতে পারে না, তার প্রয়োজনীয় টাকার বেশি এক পয়সাও নিতে চায় না। নিতে না চেয়েও কিছ্ বাড়তি টাকা-পয়সা তাকে নিতে হয়ই, যা নেয় অর্থাৎ যা নিতে হয় তার অধিক কিছ্ আর নে'য়া সম্ভব নয়। ও অনেক ভেবেছে, নিজেকে নিয়ে ওর ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। আসলে কী ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তা ভাবতে গিয়ে শ্ধ্ ইন্দ্রর এগিয়ে যাওয়ার ছবিটাই বার বার চোখে পড়েছে। যত ও এগোচ্ছে ততই যেন বেঁচে উঠছে প্টু। শ্ধ্ তার সাফল্যই ওকে আনন্দ দেয় আর কিছ্ই যেন কিছ্ নয়। ঝ্মরিকে জানিয়েছিল মান্ষটার মনের ইচ্ছেটা। শ্নে ঝ্মরি অবাক। বলেছে, সেকি রে তুই কীরে প্টু এখনো চুপচাপ আছিস! এমন স্যোগ ক'জনের জীবনে আসে! —প্টু ওর কথা শ্নে মনে মনে হেসেছে। অর্থই জীবনের সব নয় এটা ও ব্ঝবে না। শ্ধ্ ও কেন প্রায় বেশির ভাগ মান্ষ টাকা টাকা করেই মরছে যেন টাকা দিয়ে সব কিছ্ কেনা যায়। যেন স্খ-শান্তি টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। কথাটা ভয়ংকর মিথ্যে। প্টু মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে। যদিও ও যে পরিবেশে জন্মেছে সেখানে টাকা সকলেরই ধ্যান-জ্ঞান তব্ তাদের মধ্যে থেকেও ও প্রোপ্রি অন্য রকম! ও এর ব্যতিক্রম কেন হোলো তা রীতিমত একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্ন প্রত্যেকের। এরকম প্রশ্ন অন্যদের ভাবিয়ে তোলে। অন্যদের ভাবিয়ে তুললেও যাকে নিয়ে এ প্রশ্ন তার কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই তা নিয়ে। কখনো মাথা ঘামায়নি এই ব্যাপার নিয়ে। ও জেনেছে স্খের সড়ক সকলের কাছে একটাই নয়, এক এক জন এক এক ভাবে স্খ পেতে চায়। ওর সমস্ত স্খ ইন্দ্রকে ঘিরে। তার সাফল্যে ও স্খী, তার ব্যর্থতায় ও অ-স্খী। আজ এই কারণেই ও ছ্টে গিয়েছিল চতুর্বেদীর কাছে। ইন্দ্রর যে পরিণতি ও চেয়েছিল তা হোতে চলেছে আর যা ও চায় না তাও হোতে চলেছে। মন্দিরা ওর জীবনে আস্ক এটা ও মনে-প্রাণে কামনা করত। ইন্দ্রর জীবনে কোনো অশান্তির আঁচ না লাগ্ক এর জন্য মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। যে অশান্তির ভয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রতি-নিয়ত প্রার্থনা করে যাচ্ছিল সেই অশান্তিই তাদের দ্বারে এসে উপস্থিত। এখন ও শ্ধ্ ভাবছে ভালয় ভালয় মন্দিরার সঙ্গে ইন্দ্রর বিয়েটা হোয়ে গেলে ও স্খের সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। অশান্তির হাত থেকে ইন্দ্রকে রক্ষা করার একটাই পথ ও দেখতে পাচ্ছিল, একমাত্র চতুর্বেদীই পারে বাঁচাতে তাই ছ্টে গিয়েছিল তার কাছে। তার কথা শ্নে আশ্বস্ত হোয়ে ও ফিরে আসল। আসার সময় পথে ঝ্মরির সঙ্গে দেখা। দেখা হওয়ার পর চতুর্বেদীর প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে প্টু ঝ্পড়িতে ফিরল। ঝ্মরি ওদের ঝ্পড়ির দোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। প্টু ঝ্পড়ির ভেতর পা রেখেই জানতে পারল মন্দিরার দাদা শাসিয়ে

গেছে ইন্দ্রকে। অবশ্য যুধিষ্ঠিরও ছেড়ে কথা বলেনি, সেও তাকে কম শাসায়নি। শুধু মন্দিরার অনুরোধ রক্ষা না করতে হোলে ও মানুষটাকে বুঝিয়ে দিত এখানে এসে ইন্দ্রকে শাসানোর পরিণাম কী হোতে পারত। যাই হোক পুটু সব কিছু শোনার পর ব্যাপারটা আবার চতুর্বেদীকে জানিয়ে আসবে কিনা ভাবতে থাকল। ভাবনা-চিন্তা করার পর ঠিক করল এখনই কিছু করতে যাবে না যদি আবার মন্দিরার দাদা আসে তাহোলে না হয় আরো একবার যাবে তার কাছে। এবার আসলে মানুষটা সম্ভবত একা আসবে না, সঙ্গে হয়ত পুলিশ থাকবে। কথাটা মনে হোতেই ও ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই এক কাজ কর ইন্দ্র আজ-কাল কোথাও কাটিয়ে আয়, ভালয় ভালয় বিয়েটা হোলে গেলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না।

ইন্দ্র ওর কথায় কোনো গুরুত্ব আরোপ করল না, যে কাজে ব্যস্ত ছিল সেই কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে শুধু বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মন্দিরা সাবালিকা সুতরাং ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই হবে না।—কথা বলতে বলতেই একটা লিস্ট লালির হাতে দিয়ে বলল, যা যা আনা হয়েছে মিলিয়ে দেখ বার বার আমার পক্ষে ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়। যদি কোনো কিছু বাদ পড়ে থাকে তা কিনে দিয়েই আমাকে পড়তে যেতে হবে।

আজ বাদে কাল বিয়ে এখনো তোকে পড়তে যেতে হবে? দু'চার দিন না গেলেই কী নয়?—লালির কণ্ঠে বিস্ময়।

ইন্দ্র বিরক্ত হোয়ে জবাব দিল, যা করতে বলছি কর, বিয়ে বলে পরীক্ষা পিছিয়ে থাকবে না।—এ পর্যন্ত বলার পরই বুঝল কথাটা খুব বেশি রূঢ় ভাবে বলে ফেলেছে তাই গলার স্বর নরম করে আগের কথার উপর প্রলেপ দে'য়ার উদ্দেশ্যে বলল, এখন ত' আরো বেশি মন দিয়ে পড়তে হবে দায়িত্ব ঘাড়ে চাপছে যে!

লালি ওর পূর্বের কথায় আহত হয়েছিল কিনা বোঝা গেল না, হোয়ে থাকলেও এখন ওর মধ্যে ইন্দ্রর কথায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল বলে মনে হোলো না, ও স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তুই দুটো দিন যদি নাও পড়িস পাস করে যাবি। তোকে ফেল করাবে এমন সাধ্য কার।

কী বলছিস চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষা এত সহজ ভেবেছিস? এ পরীক্ষায় পাশ করা সহজ নয়।—লালির কথার জবাব দিয়েই ইন্দ্র পুটুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, একটা ব্যাপার আমার ভাল লাগছে না অথচ এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে অন্য কিছু ভাবার সুযোগও নেই।

কী ব্যাপার? খুলে বল।

তোর বিয়ে না দিয়েই নিজে বিয়ে করে ফেলছি কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার বলত! আমি ভেবেছিলাম পাশ করে বেরোবার পর চাকরি একটা পাব, পেয়েই আগে তোর বিয়ের কথা ভাবব তারপর তোর বিয়ে হোয়ে যাওয়ার পর আমি বিয়ে করব কিন্তু তা আর হোলো কৈ।

তোকে একটা কথা জানানো হয়নি।

কী কথা ?

আমি বিয়ে করব না বলে ঠিক করে রেখেছি।

বিয়ে করবি না ! কেন ?

কেন আবার কী অনেকেই ত' বিয়ে করে না। বিয়ে যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই।—এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় তা না হোলে ওকে বলতে পারত কেন বিয়ে করা সম্ভব নয়। পুটুর কাছে আজ বিয়ে একটা অর্থহীন ব্যাপার। চতুর্বেদী ব্যতীত অন্য পুরুষ ওর মনে কখনই দাগ ফেলতে পারবে না। যদিও ও আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না তবু এক এক সময় মনে হয় ও ঐ মানুষটাকে ভালবাসে। আসলে ভালবাসা কী সে সম্বন্ধে ওর কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই। আজ যখন ও মানুষটার বুকের জামা সরিয়ে নগ্ন বুকের উপর চোখের জলের বন্যা নামিয়েছে তখন মনে হচ্ছিল মনের ভেতরটা ভীষণ হাল্কা হোয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল এমন শান্তি বুঝি ইতিপূর্বে ও কখনো পায়নি। এটাই কী ভালবাসা ! এ প্রশ্নের ঢেউ বার কয়েক ওর মনের তটে আছড়ে পড়েছিল। একবার মনে হয়েছিল মানুষটাকে বলে ফেলে, ভালবাসা কী আমি জানি না তবে আপনার বুকে মুখ ডুবিয়ে কাঁদতে পারলে এমন শান্তি পাই যখন, তখন হয়ত এটাই ভালবাসা। এই যদি ভালবাসা হয় তাহোলে আপনাকে আমি ভালবাসি। আপনি ত' অনেক বড়, অনেক কিছু জানেন, বলুন-না এটা ভালবাসা কিনা ! যদি হয় তাহোলে দেহ ত' আপনাকে আগেই দিয়ে বসে আছি এবার মনটাও দিয়ে দিলাম।—হয়ত বলেও ফেলত কথাটা কিন্তু যে মুহূর্তে মনে হয়েছে আরো এক পুরুষের শারীরিক ভাবে সান্নিধ্যে এসেছে সে মুহূর্তে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি।

অশিক্ষিত এক মহিলার মধ্যে এমন পরিণত রূপ থাকার কথা নয়, যদিও পুটু বরাবরই একটু স্বতন্ত্র তবু এতটা পরিণত হোত না ইন্দ্রর সাহায্য না পেলে। তার সংস্পর্শে থেকে ও আজ নিরক্ষর নয়। বই-টইয়ের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বইয়ের বাইরেও অনেক কিছু জেনেছে ইন্দ্রর কাছ থেকে, অনেক কিছু শিখেছে। পরে চতুর্বেদীর সান্নিধ্যে এসে আরো মার্জিত হয়েছে। এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে, অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে। এমনিতেই মনের ভেতরে ভালমন্দর জ্ঞানটা প্রখর এবং ওটা ওর জন্মগত। এই একটা জিনিস এক এক জনের থাকে। আবার অনেক উচ্চ শিক্ষিতেরও এ জ্ঞান থাকে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস উচ্চ শিক্ষিত ত' দূরের কথা শিক্ষিতই ছিলেন না তবু তাঁর মধ্যে কী ছিল তা সর্বজন-বিদিত। তাঁর রিয়েলাইজেশনকে ছোট করে দেখা চলে না। এমন উপলব্ধি ক'জনের থাকে ! খুব বেশিজনের যে থাকে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই যে চতুর্বেদীকে কাছে টানতে গিয়েও টানতে পারছে না এ তার মনের ভেতরের সেই উপলব্ধির জন্য নয় ত' আর কি ! মনের ভেতর যে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বলছে তারই বিচ্ছুরণ। এ সবই পারসেবিলিটি, উইসডম্, রিয়েলাইজেশন। চতুর্বেদীর অজ্ঞাতে একজনকে শরীর বিলিয়েছে বলে তাকে কাছে টানতে পারছে না, ওর ভালত্ব ওকে

বাধা দিচ্ছে। ইন্দ্র বড় হোয়ে উঠবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে এ ভাবনা ত' সেই দীপ-শিখারই আলো। সে যেভাবে বেঁচে থাকতে চায় তাও ত' সেই একই। পুটু মনে মনে ভাবে যদি সত্যি ও বিয়ে করতে পারত তাহোলে চতুর্বেদীর গলায় মালা পরানো ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় থাকত না। তা সম্ভব নয় তাই ওকে ইন্দ্রর কথার উত্তরে বলতে হোলো, বিয়ে যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই।

ওর বক্তব্য শুনে ইন্দ্র অবাক। বলল, তুই বিয়ে করবি না! কুমারী হোয়ে থাকবি সারা জীবন?

হ্যাঁ, আমার সুখ-আহ্লাদ ত' তোদের ঘিরে ইন্দ্র, তোরা সুখে থাকলে আমি সুখে থাকব আর কিছু চাই না। বিশ্বাস কর তোদের সুখই আমার সুখ। তোদের ছেলেপিলে হবে তাদের নিয়ে দিব্বি কাটিয়ে দেব জীবনটা, তাছাড়া এখনো কত কাজ বাকি বলত? লালির বিয়ে দিতে হবে, যুধির বিয়ে দিতে হবে। মা-বাবাকে ত' দেখতেই পাচ্ছিস শুধু আমাদের টাকার দিকে চোখ রেখে বসে আছে। এতদিন আমার টাকার দিকে চেয়ে বসেছিল এবার তোর আশায় রয়েছে। দিতে পারলেই ভাল না পারলেই খারাপ। একজন নেশা করে ঝিমোয় আর একজন অন্য লোকের কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে দিব্বি আছে।

তা হোক তোর বিয়ে না করার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।

আমি তোর মত শিক্ষিত হইনি আবার শিক্ষিত না হোয়েও তোর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যা শিখেছি তার সার্টিফিকেট না থাকলেও এ কথা ঠিক তার জন্য এখন আর যার-তার গলায় মালা দিতে পারব না। আমাদের সমাজের মানুষদের ত' হাড়ে-হাড়ে চিনি—কাকে বিয়ে করব? চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ আর মাতাল-লম্পটে ভর্তি, বিয়ে করতে হোলে এদেরই একজনকে করতে হবে, বল এখন কী আর তা সম্ভব? এমন মানুষদের একজনের সাথেও আমি ঘর বাঁধতে পারব না, আবার এদের ছাড়া অন্য কেউ আমাকে বিয়ে করতেও আসবে না, সুতরাং বিয়ে আর করি কী করে। থাক এ কথা তুই লালির কাছ থেকে জেনে নে কী বাকি রয়ে গেছে, যা বাকি আছে আমাকে জানিয়ে তুই পড়তে চলে যা। আমি কিনে-টিনে রেখে দেব।—পুটু বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আসলে ও পালিয়ে এলো। যে প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল সে প্রসঙ্গে কথা হোতে থাকলে যে কথা এসে পড়তে পারে অর্থাৎ যে কথা এসে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভাবছে তার সম্মুখীন হোতে চাইছিল না বলে পালিয়ে এলো।

অন্য দিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তপতীদেবী ভাবছেন মন্দিরার কথা। তার দৃষ্টি ইন্দ্রদের ঝুপড়ির উপর। মেয়েটা এখন ওখানে কী অবস্থায় আছে তা নিয়ে ভেবে চলেছেন ও বাড়ি ছাড়ার পর থেকে। ও চলে যাবার পর থেকে তার মনটা খারাপ হোয়ে আছে। তার বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে। সে সময় মন্দিরার বয়স তেরো। তেরো বছর বয়স থেকে যে মেয়েকে দেখছেন সেই মেয়ে যে তার মনে

ঠাঁই পাবে তাতো জানা কথা, তার উপর মন্দিরা অন্য রকম। ননদ-বৌদির সম্পর্ক অনেক সময় ভাল হয় না কিন্তু মন্দিরার সঙ্গে তার সম্পর্ক সে রকম নয়। হয়ত ওকে খুব ছোট থেকে দেখছেন বলে সেরকম সম্পর্ক হয়নি। তপতীদেবীর মতে মন্দিরার মত মেয়ের সঙ্গে কারো খারাপ সম্পর্ক থাকতেই পারে না; ওর মত ভাল মেয়ে ঘরে ঘরে থাকে না। বিয়ের পর থেকে মন্দিরাকে বিশেষ কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেননি, তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ইনি বললে চলে। তাছাড়া সে তাকে ভালবাসে। এরই জন্য তার মন আজ বিক্ষিপ্ত, অশান্ত। ও চলে যাবার পর থেকেই তার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এর উপর যখন শুনেছেন তার স্বামী থানায় গিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ইন্দ্রকে হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র করছে তখন থেকে এক মুহূর্তও এক জায়গায় স্থির হোয়ে থাকতে পারছেন না। বারবারই মনে হোচ্ছে কোনোভাবে যদি মন্দিরা বা ইন্দ্রর দেখা পেয়ে যান তাহোলে তাদের অন্য কোথাও সরে পড়ার কথা বলবেন। এখন যে তিনি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তার মূল কারণ এটাই। গতকাল তার স্বামী অফিস থেকে বা অফিস যদি না গিয়ে থাকেন তাহোলে যেখানে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে এসে তাকে জানিয়েছিলেন, তপু ব্যবস্থা একটা করে আসলাম বিয়ে আর করতে হবে না বাছাধনদের, যা ব্যবস্থা করে এসেছি তাতে ছোড়ার বিয়ে করার সাধ জন্মের মত ঘুচে যাবে। বামন হোয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো। তুমি দেখ তপু মন্দিরা সুড়সুড় করে ঘরে ফিরল বলে।— তপতীদেবী জানেন এই মানুষটাকে থামান যাবে না এখন। থামাতে গেলে হিতে বিপরীত হবে তাই কিছু বলতে না পেরে কিছুক্ষণ নীরব শ্রোতা হোয়েছিলেন, তারপর সুযোগ বুঝে সরে পড়েছেন অন্যত্র। আজ আবার একটু আগে মানুষটাকে থানায় যেতে দেখেছেন, থানায় যাচ্ছেন বলেই জানিয়ে গেছেন তাকে। নিঃসন্দেহে কোনো মিথ্যের জালে ছেলেটাকে জড়াবার ষড়যন্ত্র আঁটছে। সেই থেকে উনি চিন্তিত! তপতীদেবী খুব ভাল করেই জানেন মন্দিরাকে এভাবে কখনই ফিরিয়ে আনা উচিত নয়। ও যদি ইন্দ্রকে বিয়ে করে সুখী হয় হোক। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র কিম্বা মন্দিরার প্রতিক্ষায় থেকে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে ভেবে চলেছেন। প্রায় কুড়ি মিনিট পর দেখলেন তার স্বামী ফিরছেন। তাকে ফিরতে দেখে জানালার কাছ থেকে সরে আসলেন।

সুভাষবাবু ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তপতীদেবী বুঝলেন এখনই তার ডাক পড়বে। অপেক্ষা করতে থাকলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তার ডাক আসল না তখন তিনি নিজেই এগোতে শুরু করলেন তাদের ঘরের দিকে। ঘরে এসে দেখলেন মানুষটা দু'হাতের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে আছে। এভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে বুঝে উঠতে পারলেন না হঠাৎ ভগ্নস্তূপের মত মানুষটার বসে থাকার কারণটা। বুঝতে পারলেন না বলে সুভাষবাবুকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইলেন কী ঘটেছে এই অল্প সময়ের মধ্যে।

তার প্রশ্ন শুনে সুভাষবাবু আস্তে আস্তে মাথা তুললেন। অসহায় দৃষ্টি তার

চোখে। পরাজিত সৈনিকের মত ক্লান্ত মুখটা একবার বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে আবার ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে নিয়ে আসলেন। এভাবে বার কয়েক মাথাটা দোলাবার পর বললেন, আজ পুলিশ আমাকে নিরাশ করল অথচ গতকাল তাদের কণ্ঠে অন্য সুর ছিল। বলেছিল, ভাববেন না মশাই ওদের কীভাবে টিট করতে হয় তা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, ছেলেটার এগেইন্সটে একটা ফল্‌স্‌ অ্যালিগেশন এনে থানায় নিয়ে এসে দু'ঘা দিলেই দেখবেন ঘাড় থেকে বিয়ের ভূত ছেড়ে পালাবে। সে না হয় হবে কিন্তু তার আগে বলুন ত' আপনার বোনই বা কেমন মেয়ে, একটা বস্তির ছেলের সঙ্গে লটর-বটর করতে গেছিল কেন? সেই পুলিশের কণ্ঠে আজ সম্পূর্ণ বিপরীত সুর, কী বলল জান?

কী?

বলে কিনা আপনার বোন সাবালিকা সুতরাং তার যাকে ইচ্ছে বিয়ে করার অধিকার আছে, তাছাড়া যে ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হোচ্ছে সে যথেষ্ট শিক্ষিত বলেই শুনেছি সুতরাং ওরকম একটা ছেলের বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারব না। গেলে রিপোর্টাররা আমাদের কাছা খুলিয়ে ছাড়বে। আমাদের উপদেশ যদি শোনেন তাহোলে বলতে পারি বোনের সঙ্গে ছেলেটার বিয়ে দিলে ভালই হবে। সত্যি বলতে কী যা শুনেছি তাতে বলা যায় ওরকম ছেলে আপনারা চেষ্টা করে জোটাতে পারবেন না।

তপতীদেবী শুনে খুশি হোলেন কিন্তু তা যাতে সুভাষবাবু ধরে না ফেলতে পারেন তার দিকে খেয়াল রেখে বললেন, এবার কী করবে?—প্রশ্নটা করার একটাই কারণ, মানুষটা এরপর কী করতে চায় তা জেনে নে'য়া।

একটা কিছু করতেই হবে।—বলতে বলতে চুলের মধ্যে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুলকে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু একটা নিয়ে ভাবতে থাকলেন। বেশ কিছুক্ষণ এরপর নীরব হোয়ে থাকলেন। তপতীদেবী এক সময় উঠে পড়ছেন দেখে বললেন, হঠাৎ পুলিশের সুর পাল্টে গেল কেন বুঝতে পারছি না, মনে হয় ছেলেটা কোনো ইনফ্লুয়েনশিয়াল কাউকে ধরেছে-ঠরেছে। ধরুক আমিও সহজে ছাড়ছি না। আই উইল গো টু দ্য লাস্ট।

কী করবে তুমি?—তপতীদেবীর চোখে আবার ভয়ের ছায়া দেখা গেল। প্রশ্নটা করার সময়ও গলার স্বর সামান্য কেঁপে উঠল।

সুভাষবাবু সেটা ধরতে পারলেন না। তপতীদেবীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে কিছু টাকা বার করে দাও, এই তিন-চার শ'র মত।

টাকা দিয়ে তুমি কী করবে?

ক্লাবের ছেলেদের দিতে হবে, ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ওরা বিয়েটা বন্ধ করবে।

তুমি ইন্দ্রর ভাইকে চেন?

কে ইন্দ্রর ভাই?

যুধিষ্ঠির। শুনেছি তার ভয়ে এ তল্লাটের সকলেই কাঁপে।

ও সেজন্যই ক্লাবের ছেলেরা বলছিল একাজ শুধু তাদের দ্বারা হবে না ছেনোকে ডাকতে হবে। এখন শ' তিন চার দেব পরে ওরা ছেনোকে আনলে আরো শ' পাঁচেক দিতে হবে। ছেনোকে চেন ?

নাম শুনেছি।

ওর কাছে তোমার যুধিষ্ঠির না ফুধিষ্ঠির নস্যি, ছ' সাতটা মার্ডার করেছে ও। ও আসলে ইন্দ্রর হালটা কী হবে বুঝতে পারছ ?

এতগুলো মার্ডার করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেনি কেন ?

তুমি আমাকে হাসালে তপু ও পরবে ফাঁসির দড়ি!

কেন! পরবে নাই বা কেন ?

আরে ওদের বাঁচাবার জন্য রাজনৈতিক দাদারা আছে এ কথা তুমি জান না ? পুলিশকে ওদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দিলে তবেই দড়ি পরার প্রশ্ন কিন্তু তাদের সে উপায় কী আছে! রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছে সেই সঙ্গে ছেনোদেরও।

আমরাও গুন্ডাদের কাজে লাগাব এটা কী ঠিক ? কী দরকার এসব করার, আমার একটা কথা শুনবে ?

বল শুনছি।

গুন্ডাদের একবার টাকা দিলে জেনে রাখবে তারা তোমাকে সহজে ছেড়ে দেব না, বার বার টাকা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

ঠিক আছে তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না টাকাটা বার করে দাও। মন্দিরাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারি আর না পারি ঐ ছেলের সঙ্গে ওর যাতে বিয়ে না হয় তার ব্যবস্থা করবই। ওর সঙ্গে বিয়ে হোলে এখানে আর আমাদের থাকা যাবে না।

তপতীদেবী বুঝলেন মানুষটা এখন কোনো কথাই কানে তুলবে না তাই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাটা বার করে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এরপর সুভাষবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পরই খুব সন্তর্পণে বাড়ি থেকে বেরোলেন তিনি। বেরিয়ে ঘোমটা টেনে মুখটা এমনভাবে আড়াল করলেন যাতে কেউ দেখে ফেললেও চিনতে না পারে। লোকজনের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ইন্দ্রদের ঝুপড়ির দিকে এগোতে শুরু করলেন। ওদের ঝুপড়িটার কাছে এসে কী ভাবে ইন্দ্র কিম্বা ইন্দ্রর বাড়ির লোকের সাক্ষাৎ পেতে পারেন তা নিয়ে ভাবতে থাকলেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তখন পুটু কোনো প্রয়োজনে ঝুপড়ির বাইরে এলো। ওকে দেখেই ঘোমটাটা সামান্য সরিয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে তার স্বামী কী করতে চাইছে তা দু'চার কথায় জানালেন। জানিয়েই আবার ঘোমটাটা টেনে নামিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফিরে আসলেন তাদের বাড়িতে।

পুটু শুনে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে প্রায় ছুটতে ছুটতে একটা মেডিক্যাল স্টোরে এসে চতুর্বেদীকে ফোন করল। সাধারণত এ সময় তাকে পাওয়া যায় না

কিন্তু আজ ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই তাকে পেয়ে গেল। যা তপতীদেবীর কাছে থেকে জানতে পেরেছে তা জানালো তাকে। ও পাশ থেকে চতুর্বেদী ওকে আশ্বস্ত করল। ও অনেকটা নিশ্চিন্ত হোয়ে ঝুপড়িতে ফিরে আসল। এর ঠিক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক ভ্যান বোঝাই পুলিশ এসে হাজির ওদের ঝুপড়ির কাছে। সাব-ইন্সপেক্টর গাড়ি থেকে নেমে একজনকে জিজ্ঞেস করে পুটুদের বস্তিটায় এসে পুটুর খোঁজ করল। লালির মারফৎ খবরটা পুটু পেল, পেয়েই বেরিয়ে আসল ঝুপড়ি থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর ওর পরিচয় পাওয়ার পর জানালেন কেন এসেছেন তিনি। ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না আমরা আছি। কোনো বিপদে যাতে না পড়তে হয় তার জন্য বেশ কিছু পুলিশ রেখে যাচ্ছি। যখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত মনে করবেন নিজেদের তখন বলবেন, পুলিশ তুলে নেব।— সাব-ইন্সপেক্টর এরপর একজন পুলিশ পারসনেলকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন, দিয়েই ভ্যানে উঠে পড়লেন।

পুলিশ ভ্যানের শব্দ পেয়ে তপতীদেবী আগেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন মন্দিরার ঘরের পশ্চিম দিকের জানালার কাছে। এর পর যা হোলো তা তার চোখে পড়ল। যদিও কয়েক গজের ব্যবধান ছিল তবু পুলিশ যে ভাবে পুটুর সঙ্গে কথা বলছিল তাতে তার বুঝে নিতে অসুবিধা হোলো না পুলিশ সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। বুঝলেন ইন্দ্র আর মন্দিরার বিয়ে বন্ধ করার ক্ষমতা আর কারো নেই। খুশি হোলেন উনি। একটা বড় দুশ্চিন্তার মেঘ যেন সরে গেল তার মন থেকে। ইন্দ্রর সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে হোক এটা তিনি চাইছিলেন না ঠিক কথা কিন্তু ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর তার সিদ্ধান্ত অটল থাকেনি। বুঝেছিলেন এরপর আর ওকে আটকানো ঠিক নয়। আটকানোর পরিণাম ভাল হবে না। এখন ওদের বিয়েটা হোয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওদের আটকানোর চেষ্টাটা ভুল সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া তার স্বামী যে ভাবে ইন্দ্রকে জব্দ করতে চাইছে তা রীতিমত গর্হিত কাজ। সেই কাজকে সমর্থন জানানো কোনো ভাবেই চলে না তাই তপতীদেবী তার স্বামীর গুণ্ডা ভাড়া করে ইন্দ্রকে শায়েস্তা করার ব্যাপারটার জন্য বিরক্ত হোয়ে ছিলেন এবং যথেষ্ট ভয়ও পাচ্ছিলেন। ভয় হচ্ছিল মন্দিরার জন্য। ভয় হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত মেয়েটা না কিছু একটা করে বসে। পুলিশ বস্তিটা ঘিরে থাকল দেখে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হোলেন। এরপর সুভাষবাবু ফিরতেই জানালেন পুলিশ কী ভাবে ইন্দ্রদের ঘিরে রেখেছে। জানিয়ে স্বামীর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে থাকলেন।

তপতীদেবীর বক্তব্য শুনেই মন্দিরার ঘরে এসে পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে দেখে নিতে চাইলেন, যে কথা কর্ণগোচর হোলো তা ঠিক কিনা। যখন দেখলেন যা শুনেছেন তার এক বিন্দুও মিথ্যে নয় তখন মন্দিরার খাটের একপাশে বসে পড়লেন। তার চোখে-মুখে নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠল। বিষণ্ণ কণ্ঠে তপতীদেবীকে বললেন, মন্দিরা কত বড় ভুল করতে চলেছে তা আজ বুঝতে পারছে না তবে একদিন এর জন্য অনুতাপ হবেই এ কথা আমি হলপ্ করে বলতে পারি।

সুভাষবাবুর অবস্থা দেখে তপতীদেবী যে কথাটা বলবেন বলে ভাবছিলেন সেটা বলতে পারলেন না। মানুষটার সব প্রয়াস ব্যর্থ হোলো দেখে তার খুশি হওয়ার কথা কিন্তু হোতে পারলেন না। বরং মানুষটার জন্য এখন তার কষ্টই হোলো। তপতীদেবী জানেন মানুষটা যত কঠোর তত কোমল, যখন কঠোর তখন তার ধারে-কাছে যাবার জো থাকে না, কিন্তু যখন সে কোমল তখন যেন অন্য মানুষ। বোঝার উপায়ই থাকে না এই মানুষটাই এত রাগী। তপতীদেবী সুভাষবাবুর কাছে ঘন হোয়ে বসে বললেন, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আমার একটা কথা রাখবে।

সুভাষবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু তার দৃষ্টি সরে এসে নিবদ্ধ হলো তপতীদেবীর মুখের উপর। সেই দৃষ্টি দেখে সম্মতি জানাচ্ছেন না অসম্মতি জানাচ্ছেন বোঝা গেল না। বোঝা না গেলেও তপতীদেবী ধরে নিলেন সম্মতি জানিয়েছেন তাই তিনি বললেন, তুমি আর এই ব্যাপার নিয়ে ভেব না।

অন্য সময় হোলে সুভাষবাবু এ কথা শুনে কী করতেন বলা শক্ত তবে এখন তিনি কথাটা শুনে প্রতিবাদ জানালেন না।

তপতীদেবী সুভাষবাবুকে কথাটা বলে অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন। এই মানুষটার মতামতের উপর শ্বশুর-শাশুড়ীর যথেষ্ট আস্থা। শুধু আস্থাই নয় ছেলের মতামতের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলার সাহসও নেই তাদের। মানুষটা যদি কখনো মন্দিরা আর ইন্দ্রকে মেনে নেয় তাহোলে শ্বশুর-শাশুড়ীও মেনে নেবেন, আর যদি না মেনে নিতে পারেন কোনোদিন তাহোলে তারাও ওদের কাছে টানতে পারবেন না। তপতীদেবী ভাবছিলেন ওদের বিয়ে হোয়ে যাওয়ার পর চেষ্টা করে দেখবেন যাতে মানুষটা ওদের মেনে নেয়। এই একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকলেন তিনি।

॥ আট ॥

বিয়ের পর ইন্দ্র আর মন্দিরা শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে উঠে এলো। ইন্দ্র বিয়ের আগেই জানতে পেরেছিল তাদের জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে ফেলেছে পুটু। ফ্ল্যাটের ভাড়া টানতে পুটুর যে যথেষ্ট কষ্ট হবে এ কথা ও বুঝতে পারছিল ঠিকই কিন্তু মন্দিরার কথা ভেবে অসম্মতি জানাতে পারেনি। এই ঝুপড়ির মধ্যে মন্দিরাকে রাখা চলে না। ইন্দ্র লক্ষ্য করেছিল একটা দিন থাকতেই যেন ওর দম বন্ধ হোয়ে আসছিল। আর মন্দিরা! সেও বুঝেছিল এই বস্তি-জীবন অসহ্য। দূর থেকে অনেক কিছু ভাবা যায় কিন্তু তা বাস্তবের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মেনে নে'য়া যে কতটা দুঃসাধ্য তা ও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কিছু সময় কাটিয়ে। মাত্র একটা দিন ওকে থাকতে হয়েছিল ঝুপড়িতে এই সময়ে ওর বার বার মনে হয়েছিল বহু বছরের য ন্ত্র

লালিত-পালিত শরীরটা রক্ষা করাই অসম্ভব হোয়ে উঠেছে, যেন বিষক্রিয়া শুরু হোয়ে গেছে শরীরের মধ্যে। দম বন্ধ হোয়ে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল ওখানে কয়েক দিন থাকলে হয় পাগল হোয়ে যাবে না হয় বাঁচবে না। ওখান থেকে সরতে পেরে ও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। বিয়ে হোয়ে যাওয়ার পরই ওরা শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে চলে আসতে পারল। এরকম একটা ফ্ল্যাটে এসে রীতিমত খুশি হোতে পারল মন্দিরা। নর্থ ক্যালকাটায় এত খোলামেলা ফ্ল্যাট পাওয়া সহজ নয়। দক্ষিণ পুরোপরি খোলা না হোলেও ফ্ল্যাটটাতে আলো-বাতাস আছে। এরকম একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া কত হবে তা বলা শক্ত তবে কম যে নয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এত টাকা ভাড়া তার উপর সংসারের খরচ আছে। ইন্দ্র যে ফার্মের সঙ্গে যুক্ত সেখান থেকে কিছু পাচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু তাতে তার পড়ার খরচ চালিয়ে এ খরচের কতটা বহন করতে পারবে তা বলা শক্ত, মনে হয় খুব বেশি কনট্রিবিউট করতে পারবে না। এর অর্থ এই ব্যয় ভার বহন করতে হবে পুটুকে নিজে ঝুপড়িতে থেকে ভাইয়ের জন্য এমন আত্মত্যাগ—ভাবাই যায় না। আজকাল মডেলিং করে বেশ ভাল রোজগার হয় এ কথা মন্দিরা জানে কিন্তু তাই বলে এত টাকা প্রতি মাসে ভাইয়ের হাতে তুলে দে'য়া রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। কিছুক্ষণ পুটুকে নিয়ে ভাবল ও তারপর অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আর কয়েকটা মাস পরেই ইন্দ্র পাশ করে বেরোবে। এরপর ও এই ফ্ল্যাটটাকে মনের মত করে সাজাবে। এরকম একটা ফ্ল্যাট কোনোদিনও ছেড়ে দেবে না বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলল। কী ভাবে এই ফ্ল্যাটটাকে সাজিয়ে তুলবে তা নিয়ে মনের মধ্যে একটা ছবি এঁকে গেল বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে। এরপর যখন মনে হোলো শুধু নিজের সুখের কথাই ভেবে যাচ্ছে, যার জন্য এ সুখের চাবি তার হাতে এলো তার কথা ভাবছে না তখন পুটুর কথা না ভেবে পারল না। ভাবল নোংরা বস্তিতে ওকে আর থাকতে দেবে না ; ইন্দ্রর বাবা-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে একসাথে থাকা সম্ভব হবে না ঠিক কিন্তু তাই বলে স্বার্থপরের মত ওদের জন্য কিছু করবে না এ কথা ভাবতে পারল না ও। সত্যি কথা বলতে কী পুটুকে ও অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। ওর মনের কড়া ধরে বার বার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে বিবেক। ঐ মেয়ের জন্য একটা ছেলে আজ সাফল্যের শিখরে পৌঁছচ্ছে। ওরই জন্য আজ ও ইন্দ্রকে পেয়েছে। ও তার কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয় তার জন্য কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করল ও। ওর জনাই আজ ও ইন্দ্রর বাবা-মা-ভাই-বোনদের কথা ভাবল। হয়ত পুটু না থাকলে তাদের কথা ভাবতে পারত না। শুধু ইন্দ্রর বাবা-মা-ভাই-বোন বলে তারা তার মনে ঠাঁই পেত কিনা সন্দেহ। প্রথমে একপাল ভাই-বোন দেখে ও ভীষণ বিরক্তবোধ করেছিল এবং নির্দোষ ভাই-বোনদের উপর মনে মনে ফেটে পড়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল ইন্দ্রর প্রত্যেকটা ভাই-বোনের গালে সজোরে ক্রমাগত চড় মারতে থাকে। ওর মা-বাবার মুখের দিকে তাকাতেও ঘেন্না হচ্ছিল। পরে পুটুকে জেনেছে। যত জেনেছে ততই অবাক হয়েছে সেইসঙ্গে সমস্ত ক্ষোভ অন্তর্হিত

হয়েছে এই পরিবারটির উপর থেকে। যদিও ইন্দ্রর বাবা-মাকে এখনো ক্ষমা করতে পারছে না। কিন্তু ওর ভাই-বোনদের উপর এখন আর বিন্দুমাত্র রাগ নেই। বুঝেছে এ পৃথিবীতে আসার জন্য ওদের দায়ী করা উচিত নয়, ওদের কোনো দোষ নেই। ওদের জন্য ভাবতে শুরু করল মন্দিরা। আসলে পুটু ওর মনের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছে তাই ও এখন ওদের নিয়ে না ভেবে পারছে না। ওদের ঝুপড়ি থেকে সরিয়ে আনার কথা ভাবছে। পুটুর মত মেয়ে ঐ ঝুপড়িতে পড়ে থাক এটা ও ভাবতেই পারছে না। এতদিন ও শুধু ইন্দ্রর কথা ভেবেছে। ভেবেছে ও কী ভাবে ঐ পরিবেশে থেকে বড় হোয়ে উঠেছে, কী ভাবে এমন রূপ নিয়ে ঐখানে জন্মাল। কখনো কখনো ওর মনে হয়েছে বিধাতার অভিশাপে ওকে ওদের একজন হোয়ে জন্মাতে হয়েছে। এখন পুটুকে নিয়ে ও ভাবছে এবং যত ভাবছে ততই অবাক হোচ্ছে। ভাবাই যায় না কী ডেডিকেটেড্ লাইফ ওর, কী আত্মত্যাগ মেয়েটার। এরকম একটা মেয়ে ওদের একজন হোয়ে জন্মানোটা ওকে রীতিমত বিস্মিত করেছে। এই মুহূর্তে ইন্দ্রর থেকেও ও তার মনের অনেক বেশি জায়গা জুড়ে আছে। ওর জন্যই ওদের ওখান থেকে সরিয়ে আনার কথা ভাবছে। এমনকি শুধু পুটু যদি তাদের সঙ্গে থাকতে চাইত তাহোলে ও খুশি না হোয়ে পারত না কিন্তু ঐ মেয়ে তার বাবা-মা'র উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ পরিবার থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবে না।

ইন্দ্র পড়ার টেবিলের উপর কনুইয়ের উপর তার একটা হাতকে ভাঁজ করে মাথাটা তার উপর সামান্য কাৎ করে রেখে, দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে মন্দিরাকে লক্ষ্য করছিল। প্রায় চার-পাঁচ মিনিট পর যখন মন্দিরা জানালার কাছ থেকে সরে আসতে গেল তখনই পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হোলো। ইন্দ্র প্রশ্ন করল, কোথায় খোয়া গেছিলে মন্দিরা ?

মন্দিরা প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না, কয়েক পা হেঁটে ইন্দ্রর কাছে এসে দাঁড়াল প্রথম তারপর ওর প্রশ্নের জবাব দিল, দিদির কথা ভাবছিলাম।

তোমার দিদি আছে বলে ত' শুনিনি কখনো ?

আমার নয় তোমার দিদির কথা ভাবছিলাম। দিদি তোমার জন্য অনেক করেছে, এখনো করছে, যা করেছে তা অনেক বাবা-মাও তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য করে না। এত কিছু জানার পর আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকা উচিত নয়, কিছু করা আমাদের কর্তব্য। ভাবছি তোমার চাকরি পাওয়ার পর ওকে ঐ পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনার কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিশ্বাস কর ইন্দ্র যত ওর কথা ভাবি ততই অবাক হই, তোমার দিদির মত একজন মেয়ে আজও তাকে ছাড়া আর একজনকেও খুঁজে পাইনি।

এ কথা আমিও ভাবি। আমার ধারণা এ বিশ্বে হয়ত ও একাই ওরকম মনের ঔদার্য্য নিয়ে জন্মেছে। আজ আমি শিক্ষিত হোয়ে অনেক কিছু জেনেছি তাই ওকে এখন পুরোপুরি বুঝতে পারি। আমাকে বড় করে তোলার জন্য ওর যা আত্মত্যাগ

তা দেখা যায় না। শুধু তুমি কেন ওর মত মেয়ে আমিও খুঁজে পাইনি আজও। হয়ত ওর মত কেউ জন্মায়নি। সত্যি ওর জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

মন্দিরা ইন্দ্রর কাছে আরো কিছুটা ঘন হোয়ে এসে বলল, আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কী কথা ?

সত্যিই কী আমাদের কোনোদিন কেউ মেনে নিতে পারবে না ?

মনে হয় পারবে না, খুব আফশোষ হোচ্ছে এখন—না ?

না, তা নয় আসলে ভাবছি এ ত' অবিচার।

আস্তাকুঁড়ের পাতা স্বর্গে যায় না মন্দিরা। সমাজকে দোষ দিয়ে কী হবে, আমি যে জায়গা থেকে এসেছি সে জায়গাটা ত' ভাল যদি কিছু থেকেও থাকে তাহোলে তা চোখে পড়ার মতন নয়। সেই সামান্য ভালর জন্য বিশ্বাস রাখা যায় না। এই কারণে সন্দেহের চোখে না দেখে উপায় নেই।

যোগ্য ব্যক্তি তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এ কোন ধরনের বিচার বুঝে পাই না।

তোমার মনে আজ যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তা আমারও প্রশ্ন। অনেকবার ভেবেছি আর পড়ব না কিন্তু যখনই মনে হয়েছে আমি পথ দেখিয়ে অনেককে নিয়ে যেতে পারব, অনেকে যখন এগোতে শুরু করবে তখন এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। সে সময় যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য স্থানটা থেকে তাকে বঞ্চিত করা সহজ হবে না। সে কথা ভেবেই এগিয়ে যাওয়ার কথা না ভেবে পারিনি।

তুমি কত ভাল ইন্দ্র আর তোমার দিদি আরো ভাল, আরো বড়। আমার মনে হয় বাবা-মা যদি একবার তোমাদের কাছ থেকে দেখত তাহোলে এভাবে মুখ ফিরিয়ে বেশিদিন থাকতে পারত না। একদিন-না একদিন আমাদের কাছে টেনে নিতই।

এত বড় একটা মিথ্যে আশাকে মনে ঠাঁই দিও না। এরকম মিথ্যে আশা যতদিন তোমার মনে জাঁকিয়ে বসে থাকবে ততদিন তুমি শুধু কষ্টই পাবে। আমি বুঝে-ছিলাম একদিন-না একদিন তুমি তোমার আপনজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবে, এ কথা ভেবে আমি তোমাকে কাছে টানতে গিয়েও টানতে পারছিলাম না। উচিত আর অনুচিতের সংঘর্ষ চলেছে অনেকদিন ধরে। তুমি তোমাদের সমাজে ঠাঁই চাইবে আমি জানতাম তবে তা এত তাড়াতাড়ি চাইতে শুরু করবে ভাবিনি।

মন্দিরা ইন্দ্রর মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল, আমার ভালবাসাকে কোনোদিন সন্দেহ কোর না। ভালবাসাকে বিন্দুমাত্র অপমানিত হোতে দেব না কখনই, বিশ্বাস কর ভালবাসার বিনিময়ে স্বর্গও আমার কাছে অতি তুচ্ছ। যদি কখনো তোমার অমর্যাদা হবে না জেনে আমাদের সমাজে ঠাঁই জোটে তাহোলেও কী তুমি তা ফিরিয়ে দেবে ইন্দ্র ?

ইন্দ্র একটা হাত দিয়ে মন্দিরার কোমরটা ধরে কাছে টেনে এনে বলল, ও সব কথা থাক এখন তুমি আমাকে তোমার স্পর্শ দিয়ে ভরিয়ে দাও। আমাকে পুড়িয়ে মার।

মন্দিরার ঠোঁটের মাঝে এক বিচিত্র হাসি দুরন্ত শিশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখ দুটোও উজ্জ্বল হোয়ে উঠল। চোখের তারা স্থির হোয়ে থাকল ইন্দ্রর মুখের উপর। বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে তাকিয়ে থাকার পর বলল, আজ আমি অনেক বেশি নিশ্চিন্ত।

কথাটা কোন দিক থেকে এলো বুঝতে পারল না ইন্দ্র, বুঝতে না পেরে বলল, কেন? এ কথা বললে কেন?

তুমি আমাকে ভালবেসেছ ঠিকই কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি খুব সহজ হোতে কখনই পারনি। তোমাকে দেখে মনে হোত সহজ হোতে গিয়েও হোতে পারছ না, একটা বাধা যেন কিছুতেই অতিক্রম করে আসতে পারছ না। বার বারই আমার মনে হোত তুমি যেন খুব কাছে থেকেও দূরে সরে থাকছ সব সময়।

আজ?

আজ সে ভয়টা আর নেই। আমাকে যেভাবে তুমি চাইছ তাতে আমি অনেক বেশি নিশ্চিন্ত। তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি আমি তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম যে আমার জীবনে আসবে সে রাজা-উজির না দীন-দরিদ্র তা নিয়ে ভাবতে চাই না. তার দে'য়ার মত পরিচয় আছে কী নেই তা নিয়েও ভাবতে চাই না, শুধু যে মুহূর্তে সে আমার জীবনে আসবে তখন থেকেই তাকে নিয়ে ভাবব। পূর্বের পরিচয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন কোনোদিন করব না। যদিও মুখে এ কথা বলিনি ইতিপূর্বে তবু আমি তোমার কোনো কিছু নিয়েই কোনো প্রশ্ন করিনি। যেভাবে আমি তোমার কাছে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছিলাম তাতে তোমার খুব সহজ হোয়ে আসা উচিত ছিল। হোতে পারছিলে না বলে মনে একটা ভয় ছিল যদি কোনোদিনও তুমি পুরোপুরি সহজ না হোতে পার।

তাহোলে আমাকে তুমি নিরাশ করছ না আজ তাই ত'?

মেয়েরা নির্লজ্জ হোলে পুরুষ মানুষের কাছে তার আকর্ষণ থাকে না। মেয়েদের মনের কথা পুরুষমানুষকে বুঝে নিতে হয়।—কথা শেষ করে মন্দিরা নিচের ঠোঁটের একপাশ দাঁত দিয়ে চেপে হাসল।

ওর কথা শেষ হোতেই ইন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে দু' বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করে বলল, বিয়ের যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি তা মনে করতে পার?

সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করাই শক্ত মনে রাখার প্রশ্ন ত' ওঠেই না, কী মন্ত্র উচ্চারণ করেছি?

প্রাণান্তে প্রাণান্ সন্দধামাস্থিভিরস্থীনি মাংসৈমাংসানি ত্বয়েত্বাম।—এর অর্থ জানতে ইচ্ছে করছে না?

বল।

তোমার প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ সম্মিলিত করছি, তোমার অস্থির সঙ্গে

আমার অস্থি, তোমার মাংসের সঙ্গে আমার মাংস, তোমার ত্বকের সঙ্গে আমার ত্বক সম্মিলিত হোক। যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পরস্পরকে আমরা গ্রহণ করেছি তাতে···

মন্দিরা তার একটা হাত ইন্দ্রর মুখের উপর চেপে ধরে বলল, খুব হয়েছে এবার আমাকে কী করতে হবে বল ?

ইন্দ্র ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যে কথা বলল তাতে ওর গালে যেন আবির ছড়াল। মুখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ধেৎ অসভ্য আমি ওসব পারব না।—বলেই ইন্দ্রর দু' বাহুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু সে চেষ্টার পরিণামে ইন্দ্রর আরো বেশি বক্ষলগ্ন হোতে হোলো ওকে। দুটি অধৈর্য ঠোঁট নেমে এলো ওর ঠোঁটের উপর।

॥ নয় ॥

ইন্দ্রর বিয়ের পর পুটু ভেবেছিল ও অনেকটা নিশ্চিন্ত কিন্তু তিনটে বছর যেতে না যেতেই একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেল। চতুর্বেদী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হোয়ে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর পুটু বুঝল ও মানুষটাকে ভালবেসেছিল। দুঃসংবাদটা শুনে ওর মনের ভেতর কী হচ্ছিল তা বোলে বোঝানো যাবে না। বুকের ভেতর থেকে একটা কষ্ট কণ্ঠনালীর কাছে এসে যেন আটকে ছিল দু' তিন দিন। কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারেনি শুধু বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। মহাবীর ঘোষ এসে বার কয়েক প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছে ওর মর্ম-বেদনার কারণ কিন্তু উত্তর না পেয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছে, আমার দ্বারা ত' হোলো না তুই গিয়ে দ্যাখ-না কিছু জানতে পারিস কিনা। —চাঁপা ঠোঁট বেঁকিয়েছে কথাটা শুনে, এরপর গরম লোহার উপর জল পড়লে যেরকম ছ্যাঁক্ করে ওঠে সেরকম কণ্ঠস্বরে জবাব দিয়েছিল, তোমার মেয়েকে তুমিই দ্যাখ, ও মেয়েকে বোঝার খেমতা আমার নেই. ওকে কোনো দিনও বুঝতে পারিনি। কী চায়, কী হয় ওর, কী করে কিছুই বুঝি না।—চাঁপার কথায় যা ঝাঁঝ ছিল তাতে মহাবীর ঘোষ আর কিছু বলতে পারে না। পুটু জানত এরপর বাবা মাকে আর কোনো কিছু বলতে সাহস পাবে না। যখনই মা তেতে ওঠে তখনই বাবা ভেজা ন্যাতার মত হয়ে যায়। ওর জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছে বাবা ডানা ভাঙা কাকের মত তাদের বস্তির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে আর মা ফর্ ফর্ করে সর্বত্র উড়ে বেড়িয়ে চলেছে। ডানা ভাঙা কাকের মত অবস্থা দেখে বাবার জন্য কষ্ট হোত ওর কিন্তু সেই সঙ্গে রাগও কম হোত না। এরকম মিনমিনে স্বভাবের পুরুষমানুষ দেখলে কার না রাগ হয়। বড় হোয়ে ওঠার পর বাপের জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট হোত না, কষ্ট ত' হোতই না বরং বিরক্তই ছিল মানুষটার উপর। সমস্ত দিন যে মানুষকে দেখে

বোঝাই যেত না মানুষটা সত্যি পুরুষমানুষ কিনা সেই মানুষটাই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওর এক একজন ভাই কিম্বা বোনকে টেনে আনছে। এ ধরনের মানুষ দেখলে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। এই কারণেই বাপের উপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। বাপ-মা কাউকেই সহ্য করতে পারে না তবু তাদের একজন অসুস্থ হোয়ে পড়লে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না ও। নিষ্ঠা সহকারে তাদের সেবা-যত্ন করে। সুস্থ করে তোলার প্রয়াস চালায়। তার স্বভাবের এই বৈপরীত্য অন্যকে কতখানি বিস্মিত করে তা জানে না ও তবে নিজের এই ব্যাপারটা নিয়ে এক এক সময় ভাবে, ভাবে যাদের জন্য মনে বিন্দুমাত্র জায়গা বরাদ্দ করতে পারে না তাদের জন্য এত করা কেন। যাদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই তাদের জন্য এতটা করেই বা কী করে! চতুর্বেদী মারা যাওয়ার খবর শুনে ওর মনের যা অবস্থা ছিল তা বলার নয়, তার উপর যখন তার বাপ ওকে প্রশ্ন করতে শুরু করে-ছিল তখন রাগে ফেটে পড়তে চেয়েছিল মানুষটার উপর, কিন্তু ফেটে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছিল নিজেকে। মানুষটার যা শরীরের অবস্থা তাতে ভয় হয়েছিল ওর। দু' পাঁচ কথা শোনাতে গেলে বলা যায় না মানুষটা বিছানা নিতে পারে। ক'দিন আগেই রোগভোগ করে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। ডাক্তার বলে গেছে যা হার্টের অবস্থা তাতে কোনো উত্তেজনা নয়, পরিবারের প্রত্যেককেই নজর রাখতে হবে যাতে মানুষটা কোনো ভাবেই উত্তেজিত না হয়। এ ভয়েই পুটু সেদিন কিছু বলতে পারল না। মায়ের বক্তব্যের পর বাপ যখন মুখ বন্ধ করল ওখন ও কিছুটা নিশ্চিন্ত হোয়ে দু' চোখে বন্যা নামিয়ে মনের কষ্টটাকে লাঘব করার চেষ্টা করতে থাকল। এরপর বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর চতুর্বেদী মারা যাওয়ার শোকটা অনেকখানি ভুলতে পারল। শুধু মাঝে মাঝে ওর মনে হোতে থাকল ও বড় অসহায়। এই বিশ্ব-সংসারে ও বড় একা। ইন্দ্র বস্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দু' মাস যেতে না যেতে যুধিষ্ঠির একদিন বিয়ে করে বউ নিয়ে হাজির। দেখে ওর পিত্তি জ্বলে উঠে ছিল। একে তার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিল তার উপর আরো একটাকে নিয়ে এসে ঢোকাতে চাইছে সংসারের মধ্যে। যতদিন চতুর্বেদী ছিল ততদিন ওর মনে সাহস ছিল কিন্তু এখন ওর ভয় হয়। কথায় বলে অর্থাগমনের পথ খোলা না থাকলে রাজ-ভান্ডারও একদিন শেষ হোয়ে যায়। রাজা তখন দীন-দরিদ্র। সুতরাং ওর যা কিছু সঞ্চিত সম্পদ আছে তা দিয়ে কতদিন চলবে সে কথা ভেবে ওর মনের মধ্যে একটা ভয় ছিলই তার উপর যখন দেখল যুধিষ্ঠির আরো একজনকে নিয়ে এসে হাজির করেছে তখন আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না, যা মুখে এলো তাই বলে ওকে বউ সমেত বাড়ি ছাড়া করল। পরে মনে হোলো কাজটা ঠিক হয়নি বিশেষ করে ঠিক ঐ সময়ে ও ভাবে ছেলেটার উপর আছড়ে পড়াটা রীতিমত গর্হিত কাজই হয়েছে। যা হবার হোয়ে গেছে, যে কাজ ও করে ফেলেছে তাকে শুধরে নে'য়ার উপায় ছিল না কারণ যুধিষ্ঠির তার বউ নিয়ে কোথায় গেছে তা ওর পক্ষে জানা সম্ভব হোলো না। ইন্দ্র আর যুধিষ্ঠির বস্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ও ভয়ঙ্কর

একা হোয়ে গেল। যুধিষ্ঠির ঐভাবে বিতাড়িত হওয়ার পর লালির মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখতে পেল ও। লালি অনেকটা দূরে সরে গেল ওর কাছ থেকে। সেই সময় থেকে সে নিজে থেকে কোনো কথাই বলে না ওর সাথে। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দূরে সরে যায়। ওর সান্নিধ্য যে লালির আর পছন্দ নয় তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পেত। ও বুঝেছিল যুধিষ্ঠিরকে ও ভাবে বাক্যবাণে জর্জরিত করাতে লালি মনে মনে ওর উপর চটে আছে। আজও ওকে ক্ষমা করতে পারেনি। লালির রাগ করার আরো একটা কারণ আছে। চুমকী অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের বউ ওর খুবই অন্তরঙ্গ। যুধিষ্ঠিরকে চুমকী ভালবাসে জানতে পেরে খুশি হয়েছিল। ওর ধারণা ছিল ওরা বিয়ে করলে দিদি খুশি হবে কারণ চুমকী যথার্থই ভাল মেয়ে। ও যা ভেবেছিল তাত হোলই না বরং বিয়ের পর বাড়িতে পা রাখতে না রাখতে ওদের দিদি বিতাড়িত করল বলে ও মনে মনে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হোলো দিদির উপর। পুটু ধরতে পেরেছিল ওর ক্ষোভের কারণটা। অন্যান্য ভাই-বোনরা পূর্বেও কখনো তার ধারে কাছে আসত না এখনো আসে না। সমস্ত কিছু দেখেশুনে এক এক সময় ভাবে মানুষ কত স্বার্থপর। শুধু ভাবেই না কখনো-সখনো নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না নীরবে সবার অলক্ষ্যে চোখের জলে চোয়াল ভেজায়। মাঝে মাঝে এক একদিন ইন্দ্রর কাছে যায় তবে আগের মত খুব ঘন ঘন আজকাল আর যায় না। ইন্দ্র আর মন্দিরা নিজেদের নিয়ে আজকাল ভীষণ ব্যস্ত থাকে। ওরা কিছু একটা চাইছে যার জন্য মনে হয় সব সময় নিজেদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। চোখে-মুখে কিছু একটা না পাওয়ার যন্ত্রণা। দু'জনই যেটা পাচ্ছে না সেটার জন্য অস্বস্তিতে প্রাণ খুলে কথা পর্যন্ত বলতে পারাছ না। পুটু জিজ্ঞেস করেছিল ইন্দ্রকে কিন্তু সদুত্তর পায়নি। এই কারণেই আজকাল ওদের ওখানেও বিশেষ যাওয়া হয় না। এক এক সময় মনে হয় আপনজন বলতে এই বিশ্ব-সংসারে কেউ আর নেই। ইন্দ্রর বিয়ের পূর্বে এ কথা কখনো মনে হয়নি। পরেও অনেকদিন মনে হয়নি। যতদিন চতুর্বেদী ছিল ততদিন মনে হয়নি। মানুষটা চলে যাওয়ার পর ভীষণভাবে ওর মনে হোতে থাকল ও ভীষণ অসহায়। মনের যখন এরকম অবস্থা তখন আরও একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। একদিন ওদের ঝুপড়ির কাছে এসে দাঁড়াল একটা অ্যামবেসেডার। পুটু লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলছিল। গাড়িটাকে থামতে দেখে কথা বন্ধ হোলো ওদের। পুটু গাড়িটা চেনে। এ গাড়িটাতে চাপার সৌভাগ্য হয়েছে বেশ কয়েকবার। চতুর্বেদীর গাড়ি। চেনা গাড়ি বলেই দেখেই চমকে উঠল। বিস্ময়ে চোখ সরাতে পারল না গাড়িটার উপর থেকে। হঠাৎ গাড়িটা তাদের বস্তির কাছে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণটা বুঝতে পারল না। চতুর্বেদী যদিও কখনো তাদের বস্তিতে আসেনি তবু সে জীবিত থাকলে তার কথাই ভাবত ও। গাড়িটার উপর যখন চোখ রেখে অধীর প্রতিক্ষায় আছে কী হোতে পারে জানার জন্য তখন দরজাটা খুলে গেল। গাড়ি থেকে নেমে এলো একটা একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। মেয়েটার চোখে কালো চশমা।

কপালের উপর দিয়ে ঢেউ খেলানো চুলের কিছু অংশ এসে আশ্রয় নিয়েছে চশমার একপাশের কাচে। মেয়েটার পরনে আঁটো জিন্সের ট্রাউজার আর ঢোলা একটা জামা। পায়ে পেনসিল হিলের জুতো। পুটু অনুমান করতে পারছিল মেয়েটা চতুর্বেদীর মেয়ে। ইতিপূর্বে ও মেয়েটার ফোটো দেখেছিল কিন্তু সে ফোটোর সঙ্গে এই মেয়ের মিল খুঁজে বার করা শক্ত। ফোটোতে যাকে ও দেখেছিল তার চেহারা এরকম ছিল না। রোগা চেহারার যে মেয়েটাকে ও দেখেছিল বলতে গেলে তার সাথে কোনো মিলই নেই মেয়েটার। শুধু রোগাই নয় চুলের এমন বাহারও ছিল না এবং আরো অনেক কিছুই ছিল না। সেজন্যই দেখে চিনে নিতে পারেনি ও। ফোটোর মেয়েটাই যে এই মেয়ে তা শুধু অনুমান করতে পারল চতুর্বেদীর গাড়িতে এসেছে বলে। লক্ষ্মী কনুই দিয়ে সামান্য আঘাত করল পুটুর শরীরে তারপর ওর দৃষ্টি তার দিকে ফিরতেই বলল, কী ব্যাপার বলত পুটু মেয়েটা কে রে? —পুটু কথার কোনো উত্তর না দিয়ে যে ভাবে চোখ মেয়েটার উপর রেখে দাঁড়িয়েছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি থেকে নেমে বস্তির একটা ছেলেকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে মেয়েটা কিছু জিজ্ঞেস করল। ছেলেটা আঙুল তুলে ওকে দেখিয়ে কী বলল বোঝা গেল না। এরপরই মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। দেখে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে আসতে শুরু করল। লক্ষ্মী চোখের কোণ দিয়ে পুটুকে দেখে আবার মেয়েটার উপর চোখ এনে বলল, মেয়েটা মনে হোচ্ছে তোর কাছেই আসছে, কীরে চিনিস?—এবারও পুটু কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটার আসতে কষ্ট হচ্ছিল। দিন দুয়েক আগে বৃষ্টি হওয়ায় জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। নরম মাটির উপর দিয়ে মেয়েটা ছুঁচলো জুতো পরে খুব বেশি দূর এগোতো পারবে না বুঝতে পেরে ও নিজেই এগিয়ে আসল তার কাছে। এসে প্রশ্ন করল, আপনি কী কাউকে খুঁজছেন?

মেয়েটা চোখ থেকে ঠুলিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, আপনাকে, আপনার নাম পুটু ত'?

হ্যাঁ।

আমাকে বোধহয় আপনি চেনেন না, যদি না চিনে থাকেন তাহোলে বলি আমার নাম বিজলী চতুর্বেদী।

জানি।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বলুন।

বাবার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক ছিল তা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না, অনেক কথাই কানে আসত কিন্তু তা নিয়ে ভেবে এতদিন কিছু করার ছিল না বলে চুপচাপ ছিলাম। মনের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ ছিল বাবার উপর তাই তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারতাম না। এর কারণ আপনি। বাবাকে ভালই হাত করেছিলেন। জীবিত অবস্থায় বাবা কী কী আপনাকে দিয়েছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই

কিন্তু তার মৃত্যুর পর সলিসিটরের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে অনেক কিছুই আপনাকে দিয়ে গেছে তখন ··। কথাটা অসমাপ্ত রেখে বিজলী চতুর্বেদী আবার কালো চশমাটা পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

থামলেন কেন ?

বাবার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজরাণী হয়েছেন। আপনাদের মত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার গা ঘিন ঘিন করে তবু আজ নিরুপায় বলে কথা না বলে পারছি না। যাক সে কথা যে জন্য আসা সেটাই বলি এবার আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আপনার প্রাপ্য যা কিছু বুঝে নিন।

পুটু অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বিজলীর দিকে তারপর বলল, কোথায় যেতে হবে আমাকে ?

সলিসিটরের কাছে।

এক্ষুনি ?

হ্যাঁ, কারণ আমার যা কিছু এখনি পেতে চাই—আপনি আপনার অংশ বুঝে নিন।

ঠিক আছে যাব তার আগে আমার একটা কথার জবাব দেবেন ?

বিজলী কোনো উত্তর দিল না, না দিলেও যেভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল তাতে বুঝতে অসুবিধা হোলো না তার কথা শোনার জন্য বিজলী অপেক্ষা করে আছে।

শ্যামবাজারের আপনাদের যে বাড়িটা আছে তার নিচের তলায় ইন্দ্র ঘোষ নামে একটা ছেলে তার বউ নিয়ে আছে এ খবরটা কী আপনার জানা আছে ?

আছে, কেন ?

না মানে জানতে চাইছিলাম তার কাছ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাড়া পাচ্ছেন কিনা।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর কাছ থেকে টাকা নে'য়া হোচ্ছে না।

কেন ?

কারণ বাড়িটা আপনাকে দিয়ে গেছেন বাবা। ইন্দ্র ঘোষের কথা হঠাৎ তুললেন কেন বলুন ত' ?

পুটু বিজলীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইন্দ্রর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানাবে কিনা ওকে ভাবতে থাকে মনে মনে।

কী হোলো বললেন না ?

পুটু বুঝল আজ না হয় কাল বিজলী জানবেই সুতরাং যা সত্যি তা জানিয়ে দে'য়াই ভাল, কথাটা মনে হোতেই বলল, ও আমার ভাই।

আপন ?

পুটু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

স্ট্রেইঞ্জ !

কী বললেন ?

না কিছু নয়, আপনি জামা-কাপড় বদলে আসুন।

বিজলীর কাছ থেকে নির্দেশ আসার পর পুটু ঝুপড়ির দিকে পা বাড়ালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোশাক পরিবর্তন করে বিজলীর সঙ্গে গাড়িতে এসে বসল। গাড়িকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে সে নির্দ্দেশ সম্ভবত আগেই ড্রাইভারকে জানানো হয়েছিল কারণ ওরা গাড়িতে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

রাসবিহারীর একটা বাড়ির কাছে এসে গাড়ির যান্ত্রিক শব্দটা থেমে গেল। বিজলী পুটুকে নামার নির্দেশ জানিয়ে নেমে এলো গাড়ি থেকে। পুটু নেমে আসার পর ও যে বাড়িটার কাছে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে, সেই বাড়ির কাছে এসে দরজায় লাগানো কলিং-বেলের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে চাপ দিল। এরপর আঙুলটা কলিংবেলের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে পুটুকে বলল, ইন্দ্র ঘোষ ত' চাটার্ড অ্যাকাউণ্টটেণ্ট। আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার এরকম ভাই থাকতে এ পথে আসলেন কেন ! যাক্ এবার অন্য একটা কথা বলি—আমি ফাঁকি দিয়ে কিছু নিয়ে নিচ্ছি কিনা তা আপনি ওকে কাগজপত্র দেখিয়ে জেনে নিতে পারেন।

পুটু ওর কথা শুনে কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না শুধু দু' ঠোঁট যুক্ত রেখে হাসবার চেষ্টা করল।

সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর দরজা খুলে গেল। একটা ছেলে দরজা খুলে ওদের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালো।

আসুন।—পুটুকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে বিজলী চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

বিজলীকে অনুসরণ করে একটা ঘরে এলো পুটু। আসার পরই ওর চোখ চলে এলো এক স্থূল বপুর ভদ্রলোকের উপর। মানুষটা সম্ভবত বিজলীর সঙ্গে তাকে দেখে অনুমান করে নিল যার আসার কথা এ সেই মেয়ে। পুটুর তাই মনে হোলো।

এর নামই বোধহয় পুটু ঘোষ ?—শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঢাকের শব্দের মত ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। প্রশ্নটা বিজলীর উদ্দেশ্যে।

বিজলী মাথা দুলিয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিল।

বোস তোমরা। - উত্তর পাওয়ার পর নির্দেশ জানালেন ভদ্রলোক।

টেবিলের এক পাশে ভদ্রলোক বসে ছিলেন, অন্য পাশে কয়েকটা চেয়ার খালি ছিল তারই একটাতে বিজলী বসে পড়ল, বসে অন্য একটা চেয়ারের দিকে পুটুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বসার নির্দেশ জানালো।

ওদের বসার অপেক্ষাতেই ছিলেন ভদ্রলোক, বসার পর হাত বাড়িয়ে টেবিলের এক পাশে জড়ো করা এক রাশ ফাইলের মধ্য থেকে একটা ফাইল বার করে আনলেন, এনেই ওটা চোখের সামনে মেলে ধরে জানালেন মিঃ চতুর্বেদী ওদের দু'জনের মধ্যে তার সম্পত্তি কী ভাবে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

পটুর নিষ্পলক চোখ যতক্ষণ ভদ্রলোক কথা বলছিলেন ততক্ষণ তার মুখের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে যায়নি। তার কথা শেষ হওয়ার পর ও বলল, আমাকে কেন ওসব দিতে গেলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। ও সবের কোনো কিছুর উপর আমার অধিকার নেই। আর একটা কথা…। এ পর্যন্ত বলেই ও চোখের কোণ দিয়ে একবার বিজলীর দিকে তাকাল তারপর আবার ভদ্রলোকের মুখের উপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলল, যদিও আমি বস্তির মেয়ে তবু হাত পেতে কিছু নে'য়ার অভ্যেস আমার এখনো হয়নি। যা উনি দিতে চেয়েছেন তা আমার পক্ষে নে'য়া সম্ভব হোচ্ছে না, নিলে মনে হবে অন্যের প্রাপ্য অংশে ভাগ বসিয়েছি, এ কথা যখনই মনে হবে তখন সব থেকে বেশি রাগটা হবে নিজের উপর। বিশ্বাস করুন এই সম্পত্তিতে ভাগ বসালে আমি সুখী হোতে পারব না।

কী করতে চাও তুমি ?

সত্যিকারের যার অধিকার আছে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে চাই।

ফিরিয়ে দেবে !

হ্যাঁ।

বিজলী পটুর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার কথা শুনছিল, ওর কথা শেষ হতেই বলল, আমি যথেষ্ট স্বার্থপর ঠিকই তবু আপনাকে যা বাবা দিয়ে গেছেন তা আমি নিতে পারব না।

আমি পড়াশোনা শিখিনি তাই আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে অনেক কিছু বলতে পারব না তবে যে কথাটা আপনাকে জানাতে পারব সেটা আপনি জানতেন না, এখনো জানেন না।

কী ?

আমি চাইলে আপনার মা হোতে পারতাম, যদি হোতাম তাহোলে আপনি আপনার বাবাকে ক্ষমা করতে পারতেন না।

এখনো যে পেরেছি সেকথা ভাবার কোনো কারণ নেই।

আমার জন্য ?

হ্যাঁ।

সলিসিটার ভদ্রলোক হঠাৎ কোনো একটা প্রয়োজনে ওদের বসতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই পটু বলল, আপনি নিশ্চয়ই আপনার বাবাকে আমার থেকে বেশি চেনেন তবু বলি মানুষটার মত মানুষ খুব বেশি নেই। তার উপর অতটা নির্দয় হবেন না। আমাদের সম্পর্কটা আপনাকে যদি বোঝাতে পারতাম তাহোলে হয়ত মানুষটাকে আপনি যেভাবে দেখছেন সেভাবে দেখতেন না। মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের মধ্যে একটাই সম্পর্ক শুধু থাকতে পারে এ কথা না ভাবলে ভাল করতেন। একটা বস্তির অশিক্ষিত মেয়ের মুখ থেকে এসব কথা শুনতে যে আপনার ভাল লাগছে না জানি তবু না বলে পারলাম না। এবার কাজের কথায় আসা যাক, ঐ সম্পত্তি আমি নিতে পারছি না আপনি নেবেন কী না নেবেন তা

আপনার ব্যাপার।—এ পর্যন্ত বলেই পুটু নীরব হোলো। এরপর সলিসিটার ফিরতেই তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এবার বলুন ত' এই ব্যাপারটা থেকে কী ভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি? আইনে এটা থেকে মুক্ত পেতে হোলে যা করতে হবে আমাকে তা এখনই করিয়ে নিতে পারেন অথবা যেদিন বলবেন সেদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তা করিয়ে নেবেন।

ভদ্রলোক পুটুর কথা শুনে যে যথেষ্টই বিস্মিত হয়েছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সেই বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে থেকেই বললেন, তুমি সত্যিই নিতে চাইছ না?

না।—সংক্ষিপ্ত উত্তর ভেসে এলো পুটুর কণ্ঠ থেকে।

ঠিক আছে এ ব্যাপার নিয়ে পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।—কথাটা যেন সলিসিটার ভদ্রলোক তখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না অন্তত যে ভাবে থেমে থেমে বললেন তাতে তাই মনে হোলো। শুধু কণ্ঠস্বরেই নয় তার চোখেমুখেও যথেষ্ট বিস্ময় জাঁকিয়ে বসে আছে।

সলিসিটারের বক্তব্য শেষ হোলেই ও উঠে দাঁড়াল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। পেছনে পেছনে প্রায় ছুটে বিজলী ওকে ধরবার চেষ্টা করল। প্রথমে পুটুকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দেখে কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে একভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, পরে খেয়াল হোতেই ছুটতে শুরু করল। রাস্তায় এসে ও পুটুকে ধরতে পারল। ওর কাছে এসে বিজলী বলল, আপনি ওভাবে চলে এলেন কেন? চলুন আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

ব্যস্ত হবেন না আমি এখান থেকে বাস ধরে চলে যেতে পারব?

বিজলী হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরে বলল, আমাকে আপনার খুব খারাপ মনে হোচ্ছে—না?

না।

না বললেও জানি হোচ্ছে।

কেন? হবে কেন? আপনার বাবাকে আপনি শ্রদ্ধা করতে পারছেন না সে কথা ভেবে আপনার উপর আমার রাগ হোচ্ছে তাই ভাবছেন ত'?

বিজলী নিরুত্তর।

হয়ত আপনার জায়গায় আমি থাকলেও বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। একটা খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে যার সম্পর্ক তার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকারই কথা।

এখন মনে হোচ্ছে বাবার উপর আমি অবিচার করেছি এতদিন।

এখন মনে হোচ্ছে কেন?

আপনাকে দেখে। আমি ভুল বুঝেছিলাম।

কাকে?

দু'জনকেই।

ভুল বুঝেছিলেন ? হঠাৎ এ কথা মনে হোলো কেন ? তখন যে কথা বললাম তার জন্য কী একথা আপনার মনে হোচ্ছে ? আমার সঙ্গে আপনার বাবার অন্য কোন ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে তা নিয়ে যত ভাববেন তত আপনার মনে অস্থিরতা বাড়বে।

এখন অস্থিরতা কোনো কিছুতেই কমবে বলে মনে হয় না, না ভেবে থাকাও সম্ভব নয় কারণ যার কথা এতদিন জানতাম তার সঙ্গে আজকের সেই মেয়ের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। একটা সন্দেহ ছিল এতদিন সেই সন্দেহ কতটা মিথ্যে সেটা জেনে নিতে চাই আজ।

আপনার সন্দেহ পুরোপুরি মিথ্যে এ কথা আমার মুখ থেকে শুনতে চাইবেন না, আমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই। যে সম্পর্কের কথা আপনি এত-দিন জানতেন সে সম্পর্ক আমাদের মধ্যে ছিল না শুনলে আপনি খুশি হোতেন কিন্তু ··

তাহোলে তখন আপনি যে বললেন আপনাদের মধ্যে···

কোনারক কিম্বা পুরীর মন্দিরে গেছেন ?

হ্যাঁ গেছি, কেন ?

শুনেছি মন্দিরের দেয়ালে পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের যে-সব মূর্তি বানানো আছে তা খুবই খারাপ, সেই মূর্তি দেখে যদি ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে চলে এসে থাকেন তাহোলে বলার কিছু নেই আর যদি ও-সব দেখার পরেও মন্দিরের ভেতর গিয়ে থাকেন তাহোলে বলব ঠিক সেই ভাবে আমাদের সম্পর্কটা বাইরে থেকে না দেখে একটু অন্য ভাবে দেখার চেষ্টা করতে পারেন। ও-ভাবে দেখলে যে সম্পর্কের কথা এতদিন জানতেন তার বাইরে অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ভাবতে পারবেন। আমি অশিক্ষিত বলে যা বলতে চাইছি তা এর থেকে ভাল ভাবে বলার মত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই, আপনি ত' শিক্ষিত সুতরাং যা বলতে চাইছি তা বুঝে নিতে আপনার কষ্ট হবে না। এত কথা বললাম নিজের কথা ভেবে নয় শুধু আপনার বাবার কথা ভেবে। যদি শুধুমাত্র আমার ব্যাপার হোত তাহোলে বলতে পারতাম আমি একটা খারাপ মেয়েমানুষ। আপনি যতটা ভাবছেন তার থেকেও খারাপ।

অসম্ভব।

কেন ?

এরকম একজন খারাপ মেয়েমানুষ কখনই লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছেড়ে দে'য়ার কথা ভাবতে পারে না। কোনো মেয়ে তার বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না জেনে কষ্ট পায় না। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে বাবা বিপত্নীক, ঐ বয়স থেকে কোনো পুরুষমানুষ শুধু তার মেয়েকে নিয়ে থাকুক সেটা তার মেয়ে চাইতে পারে কিন্তু সে চাওয়া ন্যায়সঙ্গত কিনা ভাবেনি সেই মেয়ে তাই যখন আপনার কথা সে জানতে পেরেছে তখন বাবার উপর শ্রদ্ধা রাখতে পারেনি। ঐ বয়সের পুরুষমানুষ ব্রহ্মচর্য

পালন না করে কতটা অন্যায় করেছে তা নিয়ে ভাবিনি তখন, শুধু ভেবেছি বাবা এমন কেন হোলো, কোথাকার এক বেশ্যাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল বলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারতাম না। এখন মনে হোচ্ছে ভয়ংকর একটা ভুলের বশবর্তী হোয়ে তাকে খুব ছোট করে ফেলেছিলাম। আচ্ছা সত্যিই কী বাবা আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ?

আমি আগেই জানিয়েছি মিথ্যে বলার অভ্যেস আমার নেই।

তবে হোলো না কেন ?

আমি চাইনি।

আপনি চাননি! কেন ?

পুটু একটা বাস এগিয়ে আসছে দেখে বলল, বাস আসছে আজ সে কথা থাক অন্য আরেকদিন শুনবেন।

অন্য আরেকদিন নয় আজই আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। আমার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।—বিজলীর কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর ছিল এতক্ষণ এখন অন্য সুরে বলল, এমন সুযোগ পেয়েও কেন গ্রহণ করলেন না সে কথা আমাকে জানাবেন না ?—এরপরই ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি বাসে চলে যাও আমি ওনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।—ওর নির্দেশ পালিত হওয়ার পর বিজলী প্রায় জোর করেই পুটুকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাল।

গাড়িতে উঠে আসার পর পুটু সামান্য ঘুরে কোণাকুনি হোয়ে বসে বলল, আপনি কী জানতে চাইছেন বলুন ত'? আমি অশিক্ষিতা কী বলতে কী বলব তার কী অর্থ দাঁড়াবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভয় মনে সুতরাং কঠিন কোনো প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইবেন না অনুগ্রহ করে।

বিশ্বাস হোচ্ছে না।

কী ?

আপনি অশিক্ষিতা এ কথা বিশ্বাস হোচ্ছে না. সত্যিই আপনি কী অশিক্ষিতা ?

সত্যি।

তাহোলে এত কথা এভাবে বলছেন কী করে ? কোনো অশিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে এভাবে কথা বলা সম্ভব নয়।

বাংলা পড়তে পারি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে আধুনিক লেখকদের অনেক লেখাই আমি পড়েছি তাই হয়ত এভাবে কথা বলতে পারছি। আপনাকে আগেই জানিয়েছি আমার ভাই ইন্দ্র খুবই শিক্ষিত ওর কাছ থেকেও অনেক কিছু জেনেছি।

বিজলী গাড়িটাকে বাঁচিয়ে তুলে বলল, এবার আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিন।

কোন প্রশ্নটার ?

বাবাকে বিয়ে করতে চাননি কেন ?

কারণ আপনার বাবাকে ঠকাতে চাইনি। বিশ্বাস যদি করেন তাহোলে একটা কথা বলতে পারি।

করব।

আপনার বাবার আমার উপর খুব বিশ্বাস ছিল। ভালবাসতেন তিনি আমাকে তবে সে ভালবাসা পুরোপুরি বোঝা আমার মত মূর্খ মেয়েমানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওরকম একটা মানুষকে ঠকাতে পারব না বলে বিয়েতে রাজী হোতে পারিনি।

কীভাবে বাবা ঠকতেন সেটা বুঝিয়ে বলবেন ?

প্রশ্নটা শুনে পুটুর কী হোলো বোঝা গেল না দেখে মনে হোলো প্রশ্নটা যেন তার কানেই ঢোকেনি, বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল বিজলীর মুখের দিকে। দ্বিতীয়বার যখন বিজলী প্রশ্নটা আরো একবার করে বসল তখন ও মুখ খুলল, চণ্ডলের সঙ্গে দীঘায় একসঙ্গে তার থাকার কথাটা জানালো।

শুনে বিজলী চকিতে পুটুর মুখের উপর একবার দৃষ্টি নিয়ে এলো, মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ ঘুরে ওর দৃষ্টি ফিরে গেল পূর্বের জায়গায়। এরপরই ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল।—আপনার হঠাৎ এত টাকার প্রয়োজন হোলো কেন ? কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই বাবার দেখা পেয়ে যেতেন তখন নিশ্চয়ই তিনি অভাব পূরণ করতেন, কী করতেন না ?

করতেন ঠিকই কিন্তু আমার মত মেয়েমানুষরা এভাবে বাড়তি টাকা পাওয়ার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে কেন বলুন ?

স্টপ ইট্, এসব কথা এক-দেড় ঘণ্টা আগে শুনলে বিশ্বাস করতাম কিন্তু এখন সে প্রশ্ন ওঠেই না। প্লিজ সত্যি কথাটা বলুন।

কী হবে জেনে ?

এ প্রশ্নের উত্তর আপনি পরে পাবেন। এবার বলুন বাবার জন্য আপনি অপেক্ষা করতে পারলেন না কেন ?

উপায় ছিল না, টাকাটা আমার অন্য সময় পেলে চলত না।

এত প্রয়োজন হোলো কেন টাকার ?

নাই বা শুনলেন সে কথা।

খুবই ব্যক্তিগত বোধহয়, আমাকে বলা যায় না—না ?

আমার একটা স্বপ্নকে সার্থক করতে চাইছিলাম। ইন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাব বলেই এক সময় আপনার বাবার কাছে আমাকে আসতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন হোত এবং সে টাকা আপনার বাবার কাছ থেকে পেয়েও যেতাম কিন্তু একবার শুধু অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলাম।

আপনার ভাইকে শিক্ষিত করে আপনার কতটুকু লাভ হয়েছে ? কী পেতে চেয়েছিলেন ?

সুখ, আত্মতৃপ্তি না কী যেন বলে তাই। মানুষ একটা কিছু নিয়ে ত' বাঁচে।

শুধু এইটুকু আর কোনো প্রত্যাশা নেই।

না। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি আর কোনো কিছুই পেতে চাই না। সত্যি কথাটা শুনবেন এখন যদি মরণও হয় আমার তাহোলেও খুব বেশি দুঃখ নিয়ে চলে যেতে হবে না।

আর একটা কথা।

বলুন।

বাবা জীবিত ছিলেন যখন তখন খুব কম কিছু দিতে চাননি নিশ্চয়ই তাহোলে এখনো ঐ বস্তিতে পড়ে আছেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কী দিতে হবেই আমাকে?

যদি না দেন তাহোলে ধরে নেব প্রথম সাক্ষাতের সময় আপনাকে যে সব কথা বলেছি তার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন না।

পুটু এরপর আর চুপ করে থাকতে পারে না, বলে, যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি নিতে পারিনি। নিলে নিজেকে অনেক ছোট করে ফেলতাম বলে মনে হোত। আপনার বাবা সিন্দুকের চাবি আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের বিয়ে হলো না, আমি অনেক কিছু পেয়েছি জীবনে কিন্তু তুমি কী পেলে পুটু? স্বামী পেলে না, ঘর পেলে না, সন্তান পেলে না, টাকা-পয়সাও তুমি নিলে না কী নিয়ে বাঁচবে! আমাদের লৌকিক বিয়ে না হোলেও আমি আকাশ-বাতাস আর ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি তুমিই আমার স্ত্রী। সকলের কাছে হয়ত তোমার পরিচয় হবে আমার রক্ষিতা কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন কখনই তুমি তা নও। একদিন আমার মেয়ের কাছ থেকেও তোমাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হবে সে কথা ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছি পুটু।

বিজলী গাড়িটা পুটুদের বস্তির কয়েক গজ দূরে দাঁড় করিয়ে, স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে পুটুর চোখে চোখ রেখে বলল, আপনিও নিশ্চয়ই বাবাকে মনে মনে স্বামীর আসনে বসিয়েছিলেন?

পুটু নিরুত্তর।

ওকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বিজলী আবার কথা বলে উঠল, অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ আপনার পোশাক বলছে আপনি··

চুপ করুন।

এভাবে সত্যকে অস্বীকার করা যায়? যাক আপনি এখানেই নামবেন? না···

এখানেই নামব পাঁচ-দশ পা আমি হেঁটে যেতে পারব।

আমি আবার আসব। বাবা যা আপনাকে দিয়ে গেছেন তা নে'য়ার জন্য শুধু অনুরোধ জানাতে নয়, আপনার কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে চাই আশা করি সে আশা আমার অপূর্ণ রাখবেন না।

আপনার বাবার কথা?

না আপনার কথা।

আমার কথা জেনে কী করবেন ?

বিজ্‌লী গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন আপনাকে দেব না।

পুটু গাড়ি থেকে নেমে এলো। নেমে পড়ার পর বিজ্‌লী ওর কাছে বিদায় নিয়ে এবং একটা হাসি উপহার দিয়ে গাড়িকে সচল করে তুলল। পুটু ভাবছিল ওকে একটা কথা বলবে কিন্তু বলবে বলবে করে কিছু সময় নষ্ট করে ফেলে, যখন বলতে গেল তখন গাড়িটা রাস্তায় গড়াতে শুরু করে দিল। এরপর ও বস্তির দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা যেতে না যেতেই ঝুমরির সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল ওর। ঝুমরি ওকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখেছিল এটা তার চোখ দেখেই ও বুঝতে পারল। চোখের তারায় কৌতূহল এবং ভুরু দুটো অসম্ভব রকম বাঁক নিয়ে আছে। পুটু ওর চোখে কৌতূহল আছে জেনেও যখন কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ কাটাতে চাইল তখন ঝুমরি আর চুপ করে থাকতে পারল না, খপ্ করে ওর হাতটা ধরে বলল, দাঁড়া. কোথায় যাচ্ছিস ? আমার কথার জবাব দিয়ে যা।—প্রশ্ন শুনে পুটু দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেই সঙ্গে বুঝল ঝুমরি এখন তাকে কী প্রশ্ন করবে। তার অনুমান যে অভ্রান্ত তা প্রমাণিত হোলো একটু পরেই, ঝুমরি পুটু কিছু বলার আগেই সেই প্রশ্নটা করে বসল, কার গাড়িতে আসলি ? মেয়েটা কে ?

চতুর্বেদীর মেয়ে।

তোর কাছে কেন ?

তার বাবা কতটা লম্পট ছিল সেটা জানতে আমার কাছে এসেছিল এবং কত জঘন্যতম বেশ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সেটাও জানতে এসেছিল।

তুই কিছু বলিসনি ?

কী বলব ?

তোর মত ভাল মেয়ে ও নিজে কোনোদিন হোতে পারবে !—ঝুমরি হঠাৎ রাগে ফেটে পড়তে চাইল। ঠোঁট দুটো জোড়া করে একপাশে ঠেলে মুখ বাঁকালো, এরপর নিজেই কথার ঝড় তুলল, বললি-না কেন সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে একটা কাজের মত কাজ করেছিস, কোনো কিছু না চেয়ে এমন ভাবে কারো ভাইকে শুধু বড় করে তুলতে নিজেকে কে শেষ করে দিতে পারবে ? ঐ মেয়ে নিজে পারবে ? ওর বন্ধু-বান্ধবরা পেরেছে না পারবে জিজ্ঞেস করলি না কেন ? ওর মত মেয়ে তোর চরণের কাদা হোয়ে থাকারও যোগ্যতা নেই। দাঁড়া কখনো যদি আমি দেখি আচ্ছা করে ঝেড়ে দেব।

পুটু ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল, তুই এত চটছিস কেন ও ত' মিথ্যে কিছু ভাবেনি সত্যি আমি ত' একটা নষ্ট হোয়ে যাওয়া মেয়েমানুষ।

নষ্ট হোয়ে যাওয়া ! তুই যদি নষ্ট হোয়ে গিয়ে থাকিস তাহোলে চতুর্বেদীর মৃত্যুর পর তোর শরীরে থান থাকে কেন ? বিছানায় পড়ে পড়ে বালিশ ভেজাস

কেন ? এসব কার কাছে লুকোবি পুটু ? আজ একটা সত্যি কথা স্বীকার করবি ?

কী ?

চতুর্বেদীকে তুই ভালবাসতিস—না ?

পুটু কথার উত্তর দেয় না। মনে মনে ভাবে ঐ মানুষটাকে ও ভালবাসত কিন্তু এই ভালবাসাটা সঠিক ভাবে বুঝতে পারত না। পারল মানুষটা চলে যাওয়ার পর। মানুষটার মৃত্যু সংবাদটা শুনে ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠেছিল ও, পায়ের নিচের মাটি যেন দুলে উঠেছিল, বুকের ভেতরটা ফাঁকা হোয়ে গেছিল। একটা কষ্ট মনের উপর চেপে বসেছিল। ও হাতের তিন-চার গাছা কাচের চুড়ি দরজার গায়ে আছড়ে ভেঙে ভীষণভাবে কেঁদে উঠেছিল। ওর কান্নার শব্দ শুনে মহাবীর ঘোষ, চাঁপা এবং ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো ছুটে এসেছিল। মহাবীর ঘোষ ছুটে এসে ওর দুটো বাহু সন্ধিস্থল ধরে তার দিকে ওর মুখটা ঘোরাবার চেষ্টা করতে করতে বলেছিল, কী হয়েছে তোর? কী হয়েছে আমাকে বল পুটু। ও শরীরের ঝাঁকুনিতে মহাবীব ঘোষকে প্রায় দু' তিন হাত দূরে ছিটকে ফেলেছিল। তা দেখে ভাই-বোনরা তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পায়নি দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর চাঁপা ! সে ত' সঙ্গে সঙ্গে গজ গজ করতে অন্য ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ছিল। পুটু তখন ভাবতেই পারছিল না তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে কার মনে কী কী প্রশ্নের ভিড় জমছে, কী প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেদিন থেকে ও সাদা কাপড় পরতে শুরু করেছিল তবে তাকে থান বলা চলে না। খুব ফিকে পাড়ের সাদা কাপড় ছিল একটা, কিনেছিল অনেক দিন আগে কিন্তু কেনার পর থেকেই পরাই হয়নি বললে চলে সেই কাপড়টাই বার করে পরল সেদিন। পরে ওরকমই চন্দন-চন্দন রংয়ের ফিকে পাড়ের আর একটা হাল্কা নীল পাড়ের শাড়ি কিনে এনেছিল। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত ঐ শাড়িগুলোই পাল্টে পাল্টে পরছে। এটা সকলের চোখেই পড়ছে তবে তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত খুব বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়নি। যদিও খুব বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়নি এখনো পর্যন্ত তা সত্ত্বেও ও বুঝতে পারছিল তার উপর প্রশ্নের ঢেউ আছড়ে পড়বেই একদিন না একদিন যেমন আজই তার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দু'জন—বিজলী আর ঝুমরি।

ঝুমরি প্রশ্ন করে উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল কিন্তু পুটুর কাছ থেকে উত্তর আসছে না দেখে বলল, কীরে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? থাক তোকে আর কিছু বলতে হবে না যা বোঝার আমি বুঝেছি। ঐ মেয়েটা তোর কাছে আবার কী আসবে ?

আসবে, কেন ?

আসলে আমাকে ডাকতে ভুলবি না, তুই যে বাজারি মেয়ে নোস সেটা ওকে আমি ভাল করে বুঝিয়ে দেব। মেয়েমানুষের শরীর পুরুষমানুষ ছুঁলেই সে বেশ্যা হয় না। তোকে আমার একটা ইচ্ছের কথা বলব ?

বল না।

আমারও এক এক সময় ইচ্ছে হয় কেউ একজন আমাকে ভালবাসুক কিন্তু ইচ্ছে হোলে কী হবে সব পুরুষমানুষই আমার দেহটা শকুনের মত ছিঁড়ে খিতে চায়। আমার এই শরীরে যে একটা মন থাকতে পারে এ কথা যেন তারা জানেই না। ঘর-সংসার যে মেয়ে পায়নি সে মেয়ের জীবনই বেথা। আচ্ছা পুটু তোর এ কথা কখনো মনে হয় ?

ঘর-সংসার সব মেয়েমানুষের কপালে জোটে না।

এটা কী আমার প্রশ্নের উত্তর ! ঘর-সংসার না পেলে মেয়েদের জীদন বেথা কিনা বল ?

আমি এখনো ভেবে দেখিনি তাছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে যখন ভাবার কথা ছিল তখনই ভাবিনি আজ ত' প্রশ্নই ওঠে না

কেন ওঠে না ! চতুর্বেদীব সঙ্গে ত' তোর বিয়ে হয়নি যে বিধবা সেজে থাকতে হবে তোকে। থান ছেড়ে আগেব মত রঙিন কাপড় পর, ছোনো-পাউডার লাগা। যে চলে গেছে তাকে নিয়ে না ভেবে নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ কর। তোর জীবনে একটু-আধটু যা ঘটে গেছে তা এমন কিছুই নয় ও রকম অনেকের জীবনেই ঘটে। দ্যাখ-গে তারা দিব্বি ফুলকুমারী সেজে ছাদনা-তলায় দাঁড়িয়ে মালা বদল করছে। আগের সমস্ত কিছু বেমালুম ভুলে গিয়ে স্বামী-ছেলে-মেযে নিয়ে জমিয়ে সংসার করছে। বাবুদের মধ্যেই কত দেখাতে পারি এরকম। আমাদের মত পচে গলে মারা গেছে তাদের কথা আলাদা, তাদের দুর্গন্ধ সাত মাইল দূর থেকেও মানুষ পায়।

ঝুমরি তোর চোখ খারাপ হয়েছে দেখছি আমি কী থান পরে আছি ! কথাটা বলেই পুটু হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু ও' ঠোঁট বিভক্ত হোয়ে শুধু দাঁতই দেখা গেল তাকে হাসি বলা যায় না।

থান নয় ত' কী ! সাদা শাড়ির নিচে যেটুকু পাড় আছে তা চোখেই পড়ে না তার উপর আবার হাল্কা রং ওটাকে থান বললে দোষের কী আছে ! এতদিন না হয় ইন্দ্রর জন্য বিয়ে করতে পারিসনি এবং যা কিছু করেছিস ওরই জন্য কিন্তু আজ আর তোর অসুবিধা থাকার কারণ ত' দেখতে পাচ্ছি না !

দূর তা কখনো হয়।

কেন হয় না ?

একটা মানুষকে ঠকান ! জেনে শুনে এত বড় অন্যায় করতে পারব না।

চতুর্বেদীকে বিয়ে করলি না কেন ? তাকে বিয়ে করলে ত' এ প্রশ্ন উঠত না, যদি তাকেও বিয়ে করতিস তাহোলে অনেক কিছু পেয়ে যেতিস, টাকা-পয়সা-মান-সম্মান ত' অন্তত পেতিস, বল পেতিস কিনা ?

ও ডান হাত দিয়ে ঝুমরির হাতে বন্দী বাঁ হাতটা মুক্ত করে নিয়ে বলল, চতুর্বেদী তার সম্পত্তির অর্ধেক আমার নামে করে দিয়ে গেছে। বিজুলী সে কথা জানাতেই আমার কাছে এসেছিল।

এ খবর তুই আমাকে এতক্ষণ দিসনি কী পাজী মেয়ে রে বাবা।

ঐ সম্পত্তি আমার পক্ষে নে'য়া সম্ভব নয় তাই বলিনি।

নিচ্ছিস না!

ও প্রশ্নটা শুনে হাসল কিন্তু ঝুমরির কথার জবাব দিল না। জবাব না দিয়ে সোজা ঝুপড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ঝুমরি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হোয়ে পুটু ওর দৃষ্টির সীমানা থেকে অন্তর্ধান হওয়া পর্যন্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

॥ দশ ॥

মন্দিরা ভেবেছিল কোনদিন না কোনোদিন তাদের সমাজে আবার ফিরে আসতে পারবে। বাবা-মা দাদা-বৌদি হয়ত একদিন তাদের মেনে নেবে কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর বুঝল তা কোনোদিনও সম্ভব হবে না। একমাত্র বৌদি হয়ত তাদের মেনে নিতে পারছে কিন্তু তার মতামতের মূল্য বাবা-মা এবং দাদার কাছে নেই বললেই চলে। শুধু বাবা-মা-দাদাই নয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। সন্ধ্যার সঙ্গে দু'-একবার পথে দেখা হয়েছে, একমাত্র ও পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে চায় না ওকে আবার আগের মত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেও পারছে না। এ জন্য ও নিজেই যথেষ্ট লজ্জিত। ওর বাড়ির মানুষ-জনের কড়া নির্দেশ ও যেন মন্দিরার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে। বাড়ির নির্দেশ অমান্য করে মন্দিরার বিয়ের পর তার সঙ্গে দেখা করতে শ্যামবাজারে একবার এসেছিল। সে সংবাদ তার বাড়ির মানুষের কাছে গোপন থাকেনি। কী ভাবে ওরা জেনেছিল তা আজও সন্ধ্যা জানে না। মন্দিরাদের বাড়িতে আসার পরিণাম কতটা বিষময় হয়েছিল তা কহতব্য নয়। সে কথা মন্দিরা না জানলেও অনুমান করতে পেরেছিল পরবর্তী সময়ে ওর সঙ্গে তার দেখা হওয়ায়। ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল তাদের আর উঠে আসার সম্ভাবনা নেই তবু ক্ষীণ একটা আশা অন্তসলিলার মত মনের ভেতর প্রবাহিত হচ্ছিল এতদিন কিন্তু এখন ও বুঝল তার আর তাদের সমাজে ফিরে যাওয়া হবে না কখনই।

ওর অবস্থা দেখে ইন্দ্রর মনেও একটা কষ্ট বাসা বেঁধে আছে। মন্দিরা যদিও জানিয়েছিল শুধু তাকে নিয়ে ও সুখে থাকতে পারবে কিন্তু বাস্তবে কাজটা কত কঠিন তা ইন্দ্রর জানা হোয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বুঝেছে যেহেতু মন্দিরা ওর কাছে কথাটা জানিয়েছিল বিয়ের পূর্বেই সেহেতু এখন তার ভেতরে ভেতরে জ্বলা ছাড়া কোনো বিকল্প উপায় নেই, আর এই কারণেই ইন্দ্রর কষ্টটা আরো বেশি। বার বার নিজেকেই অপরাধী মনে হয় এর জন্য। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় মন্দিরার জীবনে ও

না এলে এরকমভাবে ওকে জ্বলতে হোত না। আজকাল ও স্পষ্ট দেখতে পায় একটা কষ্টের ছায়া ওকে গ্রাস করে রেখেছে। ব্যাপারটা নিয়ে ও কম ভাবেনি, ভেবে কূলকিনারা পায়নি এতদিন কিন্তু গতকাল থেকে অন্য একটা কথা ভাবছে। ভাবছে ওকে যদি তার পূর্বের জায়গায় পাঠানো যায় তবে যেভাবে যায় সেভাবে যেতে ও রাজী হবে না কারণ ওর ভালবাসার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই তবু একবার চেষ্টা করে দেখবে। ওর কষ্টটা ইন্দ্রকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এরকম একটা কষ্টকে সঙ্গী করে মন্দিরা বেঁচে থাকুক এটা ও মেনে নিতে পারছে না। ঐ প্রচেষ্টা সফল হবে না ধরে নিয়েই আরো একটা পথ বেছে রেখেছে। ওকে তাদের সমাজে পাঠাতে না পারলেও কষ্টের থেকে উদ্ধার করার আরো একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পেরেছে ইন্দ্র। কাজটা সহজ নয় তবু তার জন্য প্রয়াস চালানো যেতে পারে। ভাগ্যের সহায়তা পেলে হয়ত যা ও ভাবছে তা হোয়েও যেতে পারে। যে কাজের মধ্য দিয়ে মন্দিরার কষ্ট লাঘবের কথা ভাবছে সে কাজে সফলতা যদি আসে তাহোলে যারা আজ ওকে দূরে ঠেলে রেখেছে তারাই তার কাছে এগিয়ে আসবে। ও কথাটা মন্দিরাকে জানালো। বিত্তবানদের তালিকায় যদি ওদের নামটা ঢোকাতে পারে তাহোলে মন্দিরার মনের ভেতরের কষ্টের ছায়াটা সরে যাবেই। বিত্তবানদের সমাজের দ্বার সদাসর্বদা উন্মুক্ত, প্রত্যেকের জন্যই খোলা। এ সমাজে ঢোকার ছাড়পত্র শুধু বিত্ত। কীভাবে টাকা এলো তা নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই। শুধু তাই নয় কে কোথা থেকে এসেছে সে কথা পর্যন্ত জানার আগ্রহ নেই ; একমাত্র আগ্রহ কার কত টাকা আছে। মানুষের বিচার শুধু টাকায়। কোন মসনদে কার স্থান হবে তা নির্ধারিত হবে টাকায়। বেশির ভাগ মানুষের কাছে টাকা একটা দুর্বলতা। টাকার কাছে মাথা না নুইয়ে পারে না। এমনকি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সংরক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সমাজও টাকার কাছে মাথা নত করে বসে আছে। কে কোথা থেকে উঠে এসেছে তা নিয়েও তারা ভাবে না।

মন্দিরা ইন্দ্রর কথা শুনেছে নীরবে, শুনে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি, ওর চোখ স্থির হোয়ে ছিল ইন্দ্রর চোখের উপর। ঐ ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে থাকল কী বলবে, যখন বুঝল আর চুপ করে থাকা উচিত নয় তখন বলল, আমি খুব কষ্টে আছি ভেবে কষ্ট পাচ্ছ ?

মিথ্যে উত্তর যদি শুনতে না চাও তাহোলে আমাকে বলতেই হবে এতদিন পর্যন্ত তোমার কষ্টের কথা প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, ভেবেছি ঠিকই কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজে পাইনি।

আজ পেয়েছ ?

হ্যাঁ।

এভাবে সমস্যার সমাধান করবে ? এটাই কী একমাত্র পথ ?

প্রথমে অন্য একটা কথা ভেবেছিলাম কিন্তু পরে মনে হোলো তাতে তুমি রাজী হবে না।

কী ভেবেছিলে ?

সে কথা এখন থাক।

না, থাকবে না।

ভেবেছিলাম তোমাকে বলি মন্দিরা তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমাকে ছেড়ে দিলেই আবার তুমি বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজনকে ফিরে পেয়ে যাবে। আমি সরে গেলেই তারা আর তোমাকে ফিরিয়ে নিতে আপত্তি করবে না বলে আমার ধারণা।

তুমি এ কথা ভাবতে পারলে! কীভাবে পারলে ইন্দ্র ?

তোমাকে হারানোর কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সহজ হোত না কিন্তু প্রতিদিন যে কষ্ট তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তা সহ্য করা আরো বেশি কষ্টকর।

তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না ইন্দ্র। প্লিজ ইন্দ্র আমার ভালবাসাকে সন্দেহ কোর না।

কিন্তু তোমার কষ্ট ?

আর থাকবে না।

মনের উপর জোর চলে না মন্দিরা।

মন্দিরা ওর কথার জবাব দেয় না নীরবে জানালার চৌক ফ্রেমের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখে রাস্তার উপর।

ইন্দ্র খাটের একপাশে এতক্ষণ বসে কথা বলছিল এবার উঠে এলো মন্দিরার কাছে। ওর কাঁধের উপর একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এই ক' মাসের মধ্যে আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়ে ফেলেছি, চল মন্দিরা এই টাকাটা দিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করি।

আমার কষ্ট লাঘবের এটাই কী একমাত্র উপায় ?

শুধু তোমার কেন আমারও।

তোমার আবার কিসের কষ্ট ?

আমার মনের ভেতরেও একটা ইচ্ছে ছিল একথা তোমাকে কখনো জানাইনি ভেবেছিলাম লেখাপড়া যখন কম করিনি তখন তোমাদের সমাজে ঠাঁই একদিন জুটে যেতে পারে কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তা কোনোদিনও হবে না। যখনই কেউ আমার সত্যিকারের পরিচয়টা জেনে ফেলে তখনই দেখি তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়। আমি যে সমাজের মানুষ সেই সমাজ থেকে মধ্যবিত্ত সমাজে উঠে আসা যায় না অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার কী জান মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে নেমে যাওয়া যায় এবং উঠেও আসা যায় অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সমাজ বাদে অন্য দুই সমাজের দ্বার সবার জন্যই খোলা।

তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ শুধুমাত্র আমার কষ্টের কথা ভেবে কোনো ঝুঁকি নিও না।

ইন্দ্রর দু'ঠোঁটের মাঝে হাসি ভেসে উঠল। সেই হাসি দু'চোখেও ছড়ালো। দু'বাহুর আকর্ষণে মন্দিরাকে কাছে টানল, তারপর দুটো তৃষ্ণার্ত ঠোঁট নেমে আসল

ওর ঠোঁটের উপর। মৃদু সমীরণের স্পর্শে ফুলের পাপড়ি যেভাবে তির-তির করে কেঁপে ওঠে সেভাবে মন্দিরার শরীরটা কাঁপতে থাকল ইন্দ্রর দু'বাহুর মধ্যে। ইন্দ্র ওর ঠোঁটের উপর থেকে তার অধর সরিয়ে নিয়ে, গলার স্বরকে খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, তুমি আর আমি কী ভিন্ন মন্দিরা! তোমার ভাললাগা না লাগা এবং কষ্ট আজ আর শুধু তোমার একার নয়, আমারও। আমি জানি আমার সুখ-দুঃখ এবং ভাললাগা না লাগাকে তুমিও আলাদা করে দেখ না তাই আজ আমরা অভিন্ন।

কী করবে? কী করতে চাইছ তুমি?

ভাবছি জমি-বাড়ির ব্যবসা করব অর্থাৎ অনুন্নত জমি কিনে তার উন্নতি সাধন করে বিক্রি করব। এছাড়া ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করব।

ল্যান্ড ডেভলাপার এবং প্রোমোটার হবে?

হ্যাঁ।

মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় এ কাজ কী করা সম্ভব?

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ভদ্রলোক ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউর স্টাফ। ও এই ব্যবসায় আসতে চাইছে কিন্তু একা কিছু করতে পারছে না দুটি কারণে, প্রথম কারণ একা করতে সাহস পাচ্ছেন না, দ্বিতীয় কারণ পর্যাপ্ত অর্থের অভাব। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করতে পারলে ভয়ও কমবে আর মূলধনও বেশি হবে। ওর খোঁজে জোকার কাছে কয়েক বিঘা জমি আছে, যদিও নিচু জমি তবু পাকা সড়কের ধারে বলে খারাপ বলা যায় না। মাটি ফেলে উঁচু করে নিয়ে প্লট করে বিক্রি করতে পারলে লক্ষ্মীর আঁচলটা আমরা ধরে ফেলতে পারব। সব থেকে বড় কথা ঐ মানুষটা মনেপ্রাণে চাইছে তার সঙ্গে আমি কাজটা করি।

এসব করতে গিয়ে যদি এত কষ্টের টাকা খোয়াতে হয় তাহোলে কী কষ্টটা আমাদের আরো বাড়বে না?

তোমার কথা বলতে পারব না কিন্তু আমার বাড়বে না কারণ তখন অন্তত একটা সান্ত্বনা থাকবে একটা কিছু করার চেষ্টা করেছি।

আমার কথা কেন বলতে পারবে না ইন্দ্র তুমিই ত' বললে তুমি আর আমি অভিন্ন, তোমার কষ্ট না বাড়লে আমারও বাড়বে না। শুধু একটা কথা বল এভাবে কত টাকা তুমি আয় করতে পারবে! এভাবে কী তুমি যতটা বড়লোক হতে চাইছ ততটা হোতে পারবে?

ভাগ্যের সহায়তা পেলে পারব। নাও যদি পারি তাহোলেও খুব বেশি দুঃখ থাকবে না জানব মানুষের কাজ চেষ্টা করা—করেছি, পরিণতি ত' আমার হাতের মুঠোয় নয় যে তা নিয়ে ভেবে হয় কাজ করব না হয় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব।

ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখ।

মন্দিরার সম্মতি পাওয়ার পর ইন্দ্র সত্যি উঠে-পড়ে কাজে লেগে পড়ল। স্নান-

খাওয়া ভুলে অনেক দৌড়-ঝাঁপ করে জোকার জমিটা সেই ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড রেভিনিউর কর্মচারীটির সঙ্গে কিনে ফেলল। জমি কিনতেই দু'জনের হাতই খালি সুতরাং এরপর কিভাবে এগোনো যায় তা নিয়ে শুরু হোলো ভাবনা-চিন্তা। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নে'য়া হোলো আরো একজন অংশীদারকে আনতে হবে তাদের সংস্থায়। মহেশ তলোয়ার এলো। মানুষটাকে জোগাড় করে আনল সমীর কর অর্থাৎ ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড রেভিনিউর কর্মচারীটি। মহেশ তলোয়ার সম্বন্ধে যা যা জানার ছিল তা ইন্দ্র জানতে পেরেছিল সমীরের কাছ থেকে। তলোয়ার কাজের মানুষ। শুধু কাজের মানুষই নয় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের জোরও আছে। একশ ভাগ শেয়ার তিন ভাগে ভাগ করা হোলো তবে সমান হারে নয়, ইন্দ্র আর সমীরের অংশ থাকল সমান আর তলোয়ার পেল কুড়ি শতাংশ। কয়েক দিন যেতে না যেতেই ইন্দ্র বুঝল মহেশ তলোয়ার খুবই কাজের মানুষ। সমীর জানিয়েছিল আগেই। মানুষটা অসম্ভব পরিশ্রমী এবং দারুণ কাজের মানুষ। যদিও সমীর জানিয়েছিল তা সত্ত্বেও ইন্দ্র বুঝতে পারেনি মানুষটা এতটা কাজের। শুধু সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি খুব বেশি পড়েনি ওর উপর। বিদ্যের দৌড় স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত। এর জন্য নিজের উপর একটা ক্ষোভ আছে। ইন্দ্রর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ই নিজের দুর্বলতাটা জানিয়ে রেখেছিল ওকে। বলেছিল, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ দেখবেন কিছু ভুল-টুল বলে ফেললে অপরাধ নেবেন না যেন। মুখ্যু হোলেও আপনার মতন চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট আর সমীরের মত বিচক্ষণ মানুষকে যখন পেয়েছি তখন দেখবেন মহেশ তলোয়ার কী করতে পারে।

তিনজন মিলে কাজ শুরু করল। সংস্থার নাম রাখা হোল এস-এম-ই ইন্টার-প্রাইজ। তিনজনই মেতে উঠল কাজ নিয়ে। দম ফেলবার ফুরসৎ নেই শুধু কাজ আর কাজ। কিছুদিনের মধ্যে জোকার কাজ শেষ। জোকার কাজ শেষ করেই নতুন কাজে হাত দিল এস-এম-ই ইন্টারপ্রাইজ। বছর কয়েকের মধ্যেই এস-এম-ই ইন্টারপ্রাইজ ফুলে-ফেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ারের কিছু পরিবর্তন করে নে'য়া হয়েছে। তিনজনের শেয়ার এখন সমান। তিনজনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এস-এম-ই-র নিজস্ব সুসজ্জিত অফিস হয়েছে সদর স্ট্রীটে। কর্মচারীর সংখ্যা এক এক করে এখন চল্লিশে দাঁড়িয়েছে।

মন্দিরা অবাক হোয়ে ইন্দ্রকে দেখে আর সেই সঙ্গে ভাবে এই মানুষকে আটকে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। ভাবে এই মানুষটা বিধাতার অভিশাপে অবাঞ্ছিত আবর্জনার মধ্যে জন্মেছে নাকি আশীর্বাদে এমন এক জায়গায় উঠে আসছে যেখানে আসা সহজ কথা নয়। আজ মন্দিরার অঙ্গে উঠেছে দামী দামী গয়না, তাদের নতুন বাড়ি উঠছে সল্টলেকে এবং ইতিমধ্যে কেনা হয়েছে ক্রিমসন কালারের মারুতী। সল্টলেকের বাড়ি যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে কাজ শেষ হোতে বেশ সময় লাগবে, বুঝতে পেরে ওরা শ্যামবাজারের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। এটা এস-এম-ই ইন্টারপ্রাইজের নিজস্ব ফ্ল্যাট। ছ' হাজার টাকা

ভাড়া ফ্ল্যাটটার। মহেশ আর সমীর ভাড়ার কথা শুনেই ক্ষেপে উঠেছিল। সমীর বলেছিল, তুমি ভাড়া দেবে আর তা আমরা হাত পেতে নেব! অসম্ভব। তলোয়ার বলেছিল, মরে গেলেও ও টাকা আমরা নিতে পারব না। যাই বলুক ওরা কোম্পানিকে ইন্দ্র গুণে গুণে ছ' হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে দিয়ে চলেছে। ইন্দ্রর কড়া নির্দেশ বন্ধুত্ব যতই থাক ব্যবসার জায়গায় ওরা তিনজন শুধু অংশীদার, প্রত্যেকের লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের কোনো স্থান নেই, অর্থই অনর্থকে ডেকে আনে। এসব কথা এবং ব্যবসার অগ্রগতির সম্বন্ধে কিছু কথা ইন্দ্রর কাছ থেকে মন্দিরা জানতে পারে। অনেক কথা জানতে পারলেও সব কথা জানানো হয় না তাকে। জানানো না হোলেও তা নিয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না মন্দিরা। আসলে ব্যবসা যেভাবে ডালাপালা বিস্তার করে মহীরূহ হোয়ে উঠছে তাতে ব্যবসার জটিলতায় মাথা গলানো তার কর্ম নয়। এখন ও অনেক বেশি নিশ্চিন্ত। মনের মধ্যে এক সময় ভয় ছিল ইন্দ্রকে নিয়ে, যেভাবে পরিশ্রম করেছে বড় হবার জন্য সেভাবে ও যদি না পায় যা চাইছে তাহোলে ওর জীবনে ছেয়ে যাবে অন্ধকার। এ ভয় কেটে গেছিল কিছুদিনের মধ্যে। এতেও নিশ্চিন্ত হোতে পারছিল না আরো একটা ভয় ছিল ওর। তিনজন অংশীদার নিয়ে ব্যবসা টিকে থাকবে কিনা তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা ছিল। সে ভয়ও আর নেই এখন। তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্ব যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আর কোনো ভয় অবশিষ্ট নেই ওর মনে। এখন কেউ কাউকে আর আপনি বলে সম্বোধন করে না তুমিতে এসে ঠেকেছে।

তিনজনের মধ্যে সমীর কর সর্বকনিষ্ঠ। তাদের মত ওর জীবনেও ঘটেছে অবিচার। সেই অবিচারের জন্য মনের মধ্যে প্রতিশোধের অংকুর ধীরে ধীরে বড় হোয়ে উঠেছে। শুধু অর্থের জন্য একজন ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। প্রেম-ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে অন্যের কণ্ঠলগ্না হয়েছিল শুধুমাত্র টাকার জন্য। এরই জন্য অর্থকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে, অর্থের নির্ঝরে স্নান করতে চেয়েছে। মন্দিরার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এবং আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছবার পর ওর জীবনের ক্ষতর সন্ধান পায় ও। অপমানের দাবানল কী ভাবে ওর মনের ভেতর সর্বক্ষণ জ্বলছে তা জানার পর মন্দিরা বুঝেছিল তাদের মত সর্বস্ব পণ করে কেন ও টাকার জন্য ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে নিজেকে। পাঁচটা বছর চাকরি করে যা পেয়েছিল তা থেকে নিজের জীবনধারণের জন্য যৎসামান্য খরচ করে বাকিটা সঞ্চয় করে যাচ্ছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। এরপর ইন্দ্রর সঙ্গে ওর পরিচয় হোতেই দু'জন পরস্পরের মনের ইচ্ছে একজন অন্যজনের কাছে মেলে ধরল। সমীর আর ইন্দ্র কালক্ষেপ না করে তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে নেমে পড়ল কাজে। ব্যবসা যখন বড় হোয়ে উঠল তখন সমীর ইন্দ্রদের পারিবারিক বন্ধু হোয়ে উঠল। কৃষ্ণার কথা জানল মন্দিরা। কৃষ্ণাকে সমীর দেখাতে চায় ভালবাসার থেকে অর্থ বড় নয়, অর্থ চেষ্টা করলে পাওয়া যায় কিন্তু ভালবাসা শত চেষ্টাতেও পাওয়া যায় না। ভালবাসার সঙ্গে অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণা একদিন শুধুমাত্র অর্থের জন্য

ওর ভালবাসাকে অপমানিত করেছে। ওরই এক বন্ধুর দিকে ও ঝুঁকে পড়েছিল বিত্তের জন্য। অপমানের জ্বালায় উত্তর বাংলা থেকে কলকাতায় চলে এসেছিল সমীর সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। বলতে গেলে সে সময় ওর পথে পথে রাতদিন কাটছে। অনেকদিন শুধু কর্পোরেশনের কলের জলে পেট ভরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়েছে। অনেক চেষ্টার পর ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউর চাকরিটা জোটে।

সমীর একটা উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জন করতে চেয়েছিল কিন্তু সেজন্য এত কষ্ট স্বীকার করে পরিশ্রম করে টাকা তৈরি করার নেশায় মেতেছিল সেকথাই যত দিন যাচ্ছিল ততই ভুলছিল। কৃষ্ণার কথা এখন আর বলতে গেলে মনেই পড়ে না। বরং যদিও বা কখনো ওর কথা মনে পড়ে যায় তখন ও তাকে ধন্যবাদই জানায়। সেদিন কৃষ্ণা ও ভাবে সরে না গেলে ও আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে জায়গায় কোনোদিনও আসতে পারত না। বড়লোক হওয়ার বাসনা কোনো কালেও ছিল না ওর। ওরকম একটা কিছু না ঘটে গেলে ও হয়ত কোনো ছেদো চাকরি যোগাড় করে নিয়ে কোনো এঁদো গলিতে পড়ে থাকত। দশটা-পাঁচটা চাকরি করে, বাস ঠেঙিয়ে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে বাড়ি ফিরত আর মাসটা কখন শেষ হবে তা নিয়ে ভেবে ভেবে এবং সংসারের বোঝা টেনে টেনে চুল পাকিয়ে ফেলত। এরকম একটা ছবি ওর কাছে এখন বিভীষিকা। এরই জন্য আজ ও যেন ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ কৃষ্ণার কাছে। শুধু সমীরের জীবনই নয় ইন্দ্র এবং মহেশ তলোয়ারের জীবনে এলো অনেক পরিবর্তন। তিনজনই অনেক কিছু ভুলল। অতীতের অনেক কিছুই আর ওদের মনে পড়ে না। তখন অর্থের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে ইন্দ্র মাঝে মাঝে সুরা একটু-আধটু গলায় ঢালতে শুরু করেছে। সমীরের হাতেও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ওয়াইন ভেসেল। আর তলোয়ার! মদ বিহীন জীবনই বৃথা এমনই তার মনোভাব। সোজা কথায় তিনজনই আজ অন্য মানুষ। ক্লাব, পার্টি, মদ আর অর্থ উপার্জনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের মধ্যে ব্যস্ত রেখেই আনন্দ পায়। দু' তিন বছর যেতে না যেতেই আঙুল ফুলে কলাগাছ। এস-এম-ই'র ব্যবসা ভারতবর্ষময় ছড়ালো। অর্থের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে তিনজন যে জায়গায় এসে পৌঁছল সে জায়গায় আসার কথা ভাবা ত' যায়ই না এমনকি এরকম স্বপ্নও মানুষ সচরাচর দেখে না।

দু' তিন বছরের মধ্যে মন্দিরার জীবনেও কম পরিবর্তন আসেনি। এখন ও ওর ফেলে আসা দিনের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। বাবা-মা-দাদা-বৌদি এবং আত্মীয়-স্বজনের কথা মনেই পড়ে না। এখন ও অন্য জগতের মানুষ। ওর বর্তমান বান্ধবীদের নাম মিসেস বোস, মিসেস আগরওয়াল, মিসেস আলুওয়ালিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ বড় বড় ইন্ডাস্ট্রীয়ালিস্টদের স্ত্রী কিম্বা আত্মীয়রা ওর বন্ধু-বান্ধব। সত্যি কথা বলতে কী ওর পক্ষে এখন আর আগের মত যার তার সঙ্গে মেলামেশা করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ সময় ওর মনেই থাকে না ও এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিল। ওর একটা অতীত আছে এ কথা ওর মন থেকে যেন নিশ্চিহ্ন হোয়ে

গেছে। ও বুঝেছে ইন্দ্রকে বিয়ে করে ও যে জায়গায় নেমেছিল অথবা বিয়ের পূর্বে যে জায়গায় ছিল তার কোনোটাতেই আর এক মুহূর্তের জন্য ফিরে যেতে পারবে না।

গতকাল বিকেলে মন্দিরা বেরিয়েছিল বিউটি পার্লারে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই আকাশে মেঘ দেখেছিল। বৃষ্টি যে বিউটি পার্লারে পৌঁছবার আগেই নামবে সে বিষয়ে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না কিন্তু তাতে ওর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ ও গাড়িতে যাবে সুতরাং ভিজে যাবার সম্ভাবনা নেই। না ভিজতে হোলেও অন্য এক অসুবিধা হোতে পারে সে কথা ও ভাবেনি। বৃষ্টি নামার পর এবং পনের মিনিট গাড়ি চলার পর কলেজ স্ট্রীট আর মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলের কাছে এসে যানজটে গাড়িটা আটকে পড়ল। কলকাতা শহরটার হৃদপিণ্ড খুঁড়ে যে কর্মকাণ্ড চলেছে তাতে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, তার উপর যখন বৃষ্টি নামে তখন যা হয় তা যারা চার চাকার উপর থাকেন তারা খুব ভাল ভাবেই জানেন। এ কথাটা না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিল এখন বুঝল কী ভুল করে বসেছে। প্রায় মিনিট দশেক ঐ ভাবে আটকে থাকার পর ও ধৈর্য হারাল। ভাবল ড্রাইভারকে দিয়ে ট্রাফিক পুলিশটাকে ডাকিয়ে এনে ধমকাবে। যখন একথা ভাবছে তখন গাড়িটা দুলে উঠল, দুলে উঠতেই মত পরিবর্তন করে বাঁ পাশের কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চোখ নিয়ে এলো, চোখ ফিরিয়েই ওর মা আর বৌদিকে দেখতে পেল বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওরাও তাকে দেখেছে। ও দেখল ওর মা'র ঠোঁট নড়ছে, শুনতে না পেলেও বুঝল ওকে ডাকছে। ঠোঁট নড়া দেখেই অনুমান করে নিতে পারল। এয়ারকণ্ডিশন কার তাই কাচ নামানোর উপায় নেই সেই কারণে ও দরজা খুলে ওদের ডাকল।

তপতীদেবী আর সুদেষ্ণাদেবী গাড়ির ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল। এগিয়ে আসার সময় ভাবছিল যা ওরা দেখতে পাচ্ছে তা ঠিক দেখছে কিনা। নিজের চোখের উপরও যেন বিশ্বাস রাখতে পারছিল না, ভাবতেই পারছিল না কীভাবে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধান পেল মন্দিরারা। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানের পর এত বৈভব ওদের হোলো কীভাবে তা নিয়ে দু'জনই ভাবতে থাকল। ওরা ভাবতে ভাবতে এসে দাঁড়ালো মন্দিরার গাড়ির কাছে।

মন্দিরা গাড়ির দরজা খুলে ওদের উঠে আসার আমন্ত্রণ জানাল। উঠে আসার পর ওই প্রথম কথা পাড়ল, বলল, এদিকে কোথায় এসেছিলে তোমরা ?

তোর বড় মাসির বাড়ি থেকে ফিরছি—যা বৃষ্টি মিনিট কুড়িরও বেশি বাস-স্টপেই দাঁড়িয়ে আছি। সে যাক তোর এত সব হোলো কী করে ?—সুদেষ্ণাদেবী প্রশ্ন করলেন। তার চোখে তখনো বিস্ময় আর কৌতূহল জাঁকিয়ে বসে আছে।

গাড়ি-বাড়ির কথা বলছ ? ভুল বললাম বাড়ি ত' তোমরা দেখইনি জানবে কী করে! সল্টলেকে বাড়ি হয়েছে আমাদের। তোমরা ত' আর আমাদের দোর

মাড়াবে না যে আসতে বলব।—মন্দিরা একটা খোঁচা দে'য়ার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ যেটা ও ভেবেছিল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে সেটা আবার ফিরে এসে জড়ো হোলো বুকের মধ্যে। সেই ক্ষোভের মধ্য থেকেই খোঁচা দে'য়ার বাসনা হোলো।

কী করে হোলো বললি না ?—সুদেষ্ণাদেবী খোঁচাটা হজম করলেন, না বুঝতে পারলেন না তা বোঝা গেল না।

এস-এম-ই ইণ্টারপ্রাইজের নাম শুনেছ ?

সুদেষ্ণাদেবী শোনেননি তাই মাথা নেড়ে জানালেন সে কথা। তিনি না শুনলেও তপতীদেবী শুনেছেন তাই তিনি বললেন, শুনেছি আমি, কেন বলত ? ইন্দ্র কী ঐ কোম্পানিতে এখন ? কোনো বড় পোস্টে আছে মনে হয় ?

মন্দিরা তপতীদেবীর কথা শুনে মিটিমিটি হাসতে থাকল। মনের ভেতর ওর এখন সুখের সূর্য। রোদের মত সুখ ওর মনকে ভরিয়ে ফেলছে ক্রমশই। মনে হোলো এই বৈভব যাদের দেখাতে পারলে ও সব থেকে বেশি সুখী হোত তারাই আজ তার গাড়িতে।

হাসছ ?

তোমার কথা শুনে। যত বড়ই চাকরি হোক-না কেন তাতে কী এত কিছু হয়! এই এয়ার কণ্ডিশনড্ ইম্পোর্টেড কার, সল্টলেকে মার্বেল পাথরের বিরাট বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা কী চাকরি করে হয় !

তোদের এখন এতো টাকা !—শুনে সুদেষ্ণাদেবীর চোখ কপালে ওঠে আর কি। এরপরই প্রশ্ন করলেন, কী করে হোলো ?

ব্যবসা করে। এস-এম-ই ইণ্টারপ্রাইজ তিনজনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ইন্দ্র তাদেরই একজন।

বলিস কী তোরা আজ এত বড়লোক !—কথাটা বলে যে দৃষ্টিতে সুদেষ্ণাদেবী ওর দিকে তাকালেন তা ইতিপূর্বে তার চোখে কোনোদিন কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না।

ও কথা থাক মা তোমরা ভাল আছ ত'? বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আমার জন্য বাড়ির দরজা বন্ধ সুতরাং বাড়িতে গিয়ে যে বাবাকে দেখে আসব সে উপায় ত' আর নেই তাই তোমার মুখ থেকেই শুনি তার সংবাদ।—মন্দিরা ক্ষোভের তূণ থেকে দ্বিতীয় বাণটা বার করে ছুঁড়ে দিল।

দূর্ কবে কী হোয়ে গেছে তা এখনো মনে করে বসে আছিস! আমরা ত' কবে ওসব ভুলে গেছি। প্রথম প্রথম ওরকম একটু-আধটু হয়ই পরে ওসব কেউ মনেও রাখে না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে আমরা ইন্দ্রকে চিনতে ভুল করেছিলাম। সে লজ্জা কী এখন আমাদের কাছে কম! একদিন ওকে নিয়ে আয়-না বাড়িতে।

এতদিন ত' বাড়িতে ঢোকার অনুমতি ছিল না এবার যখন অনুমতি মিলল তখন ওকে বলে দেখব।

সুদেষ্ণাদেবী কথাটা পাশ কাটাতে চাইলেন বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, তুই এখন বেশ দেখতে হয়েছিস, হবিই বা না কেন যত্নে আছিস—দাস-দাসি মনে হয় বাড়ি ভর্তি, তোকে ত' এখন কিছুই করতে হয় না—না ?

মন্দিরা সুদেষ্ণাদেবীর কথার উত্তর না দিয়ে হাসল। অর্থবহ হাসি, বলতে গেলে ঐ ভাবেই তার প্রশ্নের জবাব দিল। এরপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল গাড়িকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্রকে নিয়ে কবে আসছ বল ?—এবারের প্রশ্নটা তপতীদেবীর।

ওর কথা বলতে পারছি না তবে আমি সময় করে একদিন যাব।

ওর কথা বলতে পারছ না কেন ? আমাদের ব্যবহারের জন্য ও আসতে চাইবে না ?

না, সে কথা ভেবে বলিনি আসলে ওর এখন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। দিনরাত কাজের মধ্যে ডুবে থাকছে।

টাকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে ? এখন ত' তোমাদের অনেক টাকা আর টাকা দিয়ে কী হবে ?

মন্দিরা তপতীদেবীর কথা শুনে হেসে ফেলল, বলল, কী বলছ বৌদি টাকার পেছনে ছুটবে না! এই টাকায় আমরা অনেক কষ্ট তাড়াতে পেরেছি, সুখ কিনতে পেরেছি, এখন আমাদের মনে হয় মানুষের একটা আবডেনটিটি টাকা। ইন্দ্র বলে, শিক্ষিত হওয়ার পর ভেবেছিলাম আমার পূর্বের পরিচয় নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলবে না কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা যে ঠিক নয় তার প্রমাণ পেয়েছ অথচ আজ আমার অতীত নিযে কোনো প্রশ্ন জাগে না কারো মনে সুতরাং টাকাই সব। ভোগের জন্য টাকা আমি আগেও চাইনি আজও চাই না কিন্তু টাকা আমাকে যা দিয়েছে তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী থাকতে পারে! এরই জন্য যতদিন বাঁচব শুধু টাকার পেছনে ছুটব। মোর অ্যান্ড মোর মানি। ইন্দ্রর ধ্যানজ্ঞান শুধু টাকা।

জ্যামের জন্য গাড়ি এগোচ্ছে না দেখে ড্রাইভার গাড়িটা ব্যাক করে বাঁ পাশের গলিতে ঢোকালো। ঢুকিয়ে খুব যে সুবিধা হোলো তা নয় যানজট গলিটাতে না থাকলেও মানুষের ভিড় ঠেলে গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হচ্ছিল।

মন্দিরা ধৈর্য হারিয়ে মুষ্টিবদ্ধ একটা হাতকে সজোরে সামনের সীটের পিঠ রাখার জায়গার উপর আছড়ে ফেলে বলল, এভাবে এগোলে দিন শেষ হোয়ে যাবে রতন কিছু কর। ও লর্ড হাউ লং উই উইল হ্যাভ টু ইলাপস্ ফর এ্যক্সট্রিকেটিং আওয়ারসেলভস্ ফ্রম দ্যা ক্রাস্ক!

তপতীদেবী অবাক হোয়ে মন্দিরাকে দেখছিলেন আর সেইসঙ্গে ভাবছিলেন কত বদলে গেছে ও। যে মন্দিরাকে এখন দেখতে পাচ্ছেন তাকে যেন ইতিপূর্বে দেখেছেন বলে মনেই হোচ্ছে না। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চালচলনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। চেহারারও কম পরিবর্তন হয়নি, আগের থেকে গায়ের রং অনেক পরিস্কার

হয়েছে। ওর যৌবন এখন বড় বেশি উগ্র, ঠোঁট দুটো লিফস্টিকের জন্য চকচক করছে, দেখে মনে হয় কোনো পুরুষের সোহাগে সিক্ত ঠোঁটদ্বয়। নাকে একটা হীরের নাকছাবি, চোখের পল্লবে হাল্কা নীল আইসেড্, লেকার করা ফোলানো চুল কিছুটা কপালের উপর আশ্রয় নিয়ে আছে। মুখে এখন বিরক্তির ছাপ তা না হোলে বলা যেত এমন মুখ দেখে যে কোনো পুরুষমানুষের মনের ভেতরে ঝড় উঠতে পারে। অবশ্য মুখ দেখে নয় আরো কিছু দেখে। পুরোপুরি মন্দিরাকে দেখে। যে ভাবে ও সেজে আছে তাতে মধ্যবিত্ত সমাজের যে কোনো মানুষের চোখ হোঁচট খাবে। বিশেষ করে যখন ওর লো-কাট ব্লাউজের দিকে চোখ চলে আসে তখন রীতিমত অস্বস্তি হয়। বুকের উপত্যকায় যে ভাবে দৃষ্টিকে টেনে আনার প্রয়াস চালানো হয়েছে তাতে তপতীদেবীর বুক ত' কাঁপছিলই এমন কি সুদেষ্ণাদেবীর দৃষ্টিও যে আহত হচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরই জন্য যে সুদেষ্ণাদেবীর চোখ মন্দিরার শরীর থেকে বার বার সরে যাচ্ছিল তা তপতীদেবী বুঝতে পারছিলেন। অস্বস্তি হচ্ছিল তার তবু তিনি যে ভাবে মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোতে চাইছেন তাতে তপতীদেবী রীতিমত অবাক হচ্ছেন। বুঝতে পারছিলেন টাকার কাছে মানুষ কত দুর্বল, টাকা একটা বিরাট শক্তি, এটা আরো একবার প্রমাণিত হোলো। মেয়েটা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে একদিনও তার নাম উচ্চারিত হয়নি। মন্দিরার দাদা-মা-বাবা ওকে সম্পূর্ণ ভুলে আছে। মন্দিরা নামের একটা মেয়ে যে ছিল তাদের পরিবারে সে কথাও যেন কারো মনে নেই। দেখে মনে হয় ঐ নামের কোনো মেয়ে যেন জন্মাইনি এই পরিবারে। শুধু একদিন শাশুড়ি তুলেছিল ওর কথা কিন্তু তুলতে না তুলতেই তার স্বামী এমন ভাবে ধমকে উঠেছিল যে শাশুড়ির অসমাপ্ত কথা অসমাপ্তই থেকে গেছিল। সেই থেকে আর তার নাম মুখে আনেননি। অথচ আজ শাশুড়ি যে ভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হোচ্ছে এতদিন মেয়ের কথা ভেবে ভেবে অস্থির। একমাত্র তপতীদেবী ওকে ভুলে থাকতে পারেননি, বার বার ওর কথা তার মনে হয়েছে। মাঝে মাঝেই ওকে নিয়ে ভেবেছেন। মনে প্রাণে চেয়েছেন বাড়ির সবাই ওকে মেনে নিক। শুধু ভেবেছেনই নন মনের ভেতর একটা সুপ্ত ইচ্ছেও ছিল, বাড়ির সবাই ওদের কোনোদিন না কোনোদিন মেনে নেবে এরকম একটা ইচ্ছে পোষণ করতেন তিনি। আজ শাশুড়ি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোতে চাইছেন দেখে খুশি হোলেন। মন্দিরা যে জায়গায় পৌঁছে গেছে তাতে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নেবে অর্থাৎ ওর কাছের মানুষ কে কতটা তা প্রমাণ করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হোয়ে যাবে। আজ তপতীদেবী ওকে এ অবস্থায় দেখে খুশি হয়েছেন যদিও ওর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে তিনি আহত কম হননি। তার পরিচিত মন্দিরার মধ্যে যে পরিবর্তন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাতে কষ্ট হচ্ছিল তার। বুকের কাপড় সরে গেলে যে মেয়ে লজ্জায় রাঙা হোয়ে উঠত সেই মেয়ে আজ যে ভাবে অর্ধনগ্ন অবস্থায় নির্বিকার চিত্তে তাদের সঙ্গে কথা বলছে তাতে চিনতেই কষ্ট হয় যে সেই মন্দিরা আর আজকের মন্দিরা একই মেয়ে।

গাড়ি যখন এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে সার্কুলার রোডে আসল তখন তপতীদেবী বললেন, মন্দিরা এখানেই আমাদের নামিয়ে দাও শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে চলে যাব।

কী বলছ বৌদি তোমাদের মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব! যে কাজের জন্য বেরিয়েছিলাম সে যখন হোলোই না এখন বাড়িতে ফেরার তাড়া নেই আমার তোমাদের পেঁাছে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না।

সুদেষ্ণাদেবী বললেন, মন্দিরা ঠিকই ত' বলছে বৌমা এতদিন পর দেখা বাবা-দাদার সঙ্গে দেখা না করে মাঝপথ থেকে ফিরে যাবে! ওরা ওকে দেখলে খুশি হবেন।—এরপর মন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইন্দ্র সঙ্গে থাকলে ভাল হোত, একদিন একটু সময় বার করতে পারবে না? দেখ-না বলে-টলে, ওকে সঙ্গে নিয়ে আয় না একদিন। কীরে আনবি ত'?

বলতে পারছি না, চেষ্টা করে দেখব।—কথার উত্তর দিয়ে মন্দিরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে কপালের উপর থেকে চুল সরালো। সরিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল লেক গার্ডেন্সের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে।

কথা বলতে বলতে লেক গার্ডেন্স চলে এলো ওরা, বাড়ির কাছে এসেও মন্দিরা গাড়ি থেকে নামল না, মা-বৌদিকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলো সল্ট লেকে। একবার ভেবেছিল নামবে কিন্তু পরে মনে হোলো ইন্দ্রকে না জানিয়ে না নামাই ভাল কারণ ইন্দ্র ইতিপূর্বেই জানিয়ে রেখেছিল যদি কখনো পথে-ঘাটে মন্দিরার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হোয়ে যায় তাহোলে যেন ও উপযাচক হোয়ে কোনো কথা না বলতে যায় এবং কখনো যেন ওর বাড়ি যাবার ইচ্ছে না হয়। অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে আর নতুন করে যেন অপমানিত হোতে না চায় ও। কথাটা মিথ্যে নয় সত্যি যে অপমান ও সহ্য করেছে তা কহতব্য নয়। দগদগে ঘায়ের মত সেই অপমানের কষ্ট ওর মনের কী হাল করেছিল তা ভাবাই যায় না। অর্থের প্রাচুর্যে সেই ক্ষত আস্তে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ভুলতে পেরেছিল সেই সব দিনের কথা। নতুন এক স্বর্গ ওর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অন্য এক জগতে পা রাখতে পেরেছে ও। এরই জন্য ইন্দ্রর কোনো নির্দেশ অমান্য করার কথা ভাবতে পারে না। মা'র এবং বৌদির শত অনুরোধেও ও গাড়ি থেকে নামতে পারল না ইন্দ্রর নির্দেশের কথা ভেবে।

ফিরে এসে মা আর বৌদির সঙ্গে পথে দেখা হোয়ে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে তা ইন্দ্রকে জানাবে ভাবল কিন্তু ফেরার পর থেকে ইন্দ্রর সঙ্গে কথা বলার সুযোগই জুটল না, ও ব্যবসার ব্যাপারে এতই ব্যস্ত ছিল যে ওকে কিছু বলা হোয়ে উঠল না। আজ ব্রেকফাস্ট করার সময় জানতে পারল। ইন্দ্র শুনল কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলল না এমনকি শুনে ওর কোনো ভাবান্তর হোলো কিনা তাও মন্দিরা বুঝতে পারল না। ব্রেকফাস্ট হোয়ে যাওয়ার পর খবরের কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিল ইন্দ্র। ও কিছু বলে কিনা তার জন্য মন্দিরা অপেক্ষা করে থাকল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখল ইন্দ্রর হাতের কাগজ টেবিলে নেমে এলো, এরপর ওর চোখ উঠে এলো তার মুখের উপর ? মন্দিরা বুঝল ইন্দ্র এবার কিছু বলবে তাকে। তার অনুমান যে অভ্রান্ত তা প্রমাণিত হোলো দু' এক মুহূর্ত অতিক্রান্ত হোতে না হোতেই, ইন্দ্র বলল, তোমাদের বাড়ির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলেননি তোমার মা ?

কৈ না! কী হয়েছে ?—প্রশ্ন করার সময় উদ্বেগ আব উৎকণ্ঠায় মন্দিরার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। ইন্দ্র যেভাবে কথাটা বলেছে তাতেই বোঝা গেছে একটা অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে।

সত্যি তোমাকে কিছু বলেননি ?

নাহ্।

তোমার দাদার আগের চাকরিটা নেই। এখন অন্য এক জায়গায় কাজ করছে, মাইনে যা পায় তা বলার মত নয়। এর মধ্যে তোমার বাবার চাকরির মেয়াদও শেষ হোয়ে গেছে সুতবাং তোমাদের বাড়ির অবস্থা এখন আর আগের মত নেই। দে আর নাউ আউট অফ্ দ্যা ফ্রাইং প্যান ইন টু দ্য ফায়ার।

এত খবর তুমি জানলে কী করে ?

তোমার দাদা যে অফিসে এখন কাজ করছে সে অফিসে বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। ওখানে তোমার দাদাকে দেখার পর মিঃ ঘোষ অর্থাৎ ঐ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করে কিছু কথা জানতে পারি, পরে অন্য ভাবে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারি।

তুমি এ কথা আগে বলনি ত' আমাকে ?

দিন চারেক কী পাঁচেক আগে জেনেছিলাম কিন্তু বলিনি তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। সত্যি বলতে কী আমরা যখন কিছু করতেই পারব না তখন তাদের দুর্দশার কথা শুনে তুমি কষ্ট পাও এটা আমি চাইছিলাম না। ইন ফ্যাক্ট আই ওয়াজ নট ওয়ান্টিং টু মেইক এ ডেন্ট ইন ইয়োর মাইন্ড।

ওদের ঐ অবস্থা জেনেও কেন সাহায্য করতে যাব না ?

এখন ওদের সাহায্য করতে যাওয়ার একটা অন্য অর্থ দাঁড়ায়, ওরা দাঁড় করাবে। নতুন করে গাল বাড়িয়ে দিও না।

একটা সত্যি কথা বলত ওদের জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি এবার ওরা কষ্টে থাক এটা তুমি চাইছ না ত' ?

তুমি আমাকে এত ছোট ভাবলে কী করে! আমি শুধু তোমার অপমানের কথাটাই ভেবেছি। তোমাকে আবার যেন নতুন করে অপমানিত হোতে না হয় তার জন্যই বারণ করছিলাম।

আমি অপমানিত হওয়ার ভয়ে তাদের অবস্থার কথা জেনেও চুপ করে বসে থাকব এটা হয় না।

এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলব না তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, যা ভাল বুঝবে

করবে। লিভ অল দোউজ—আজ মিঃ শ্রীবাস্তবের বাড়িতে একটা পার্টি অরগানাইজ করা হোচ্ছে, উই উইল বি দেয়ার অ্যাট সেভেন ও-ক্লক সার্প।

হোয়াট ফর? ইস দেয়ার এনি স্পেশাল…

নট-অ্যাট-অল, ঠিক কী উদ্দেশ্যে পার্টি দিচ্ছে তা এখনো জানা যায়নি, ইট ইস আণ্ডার দ্য কভার অফ সারপ্রাইজ। মি সিম্‌স মিঃ শ্রীবাস্তব ইজ উইস্টফুল টু কাম-ইন-ফর সামথিং ফ্রম দিস পার্টি। যাক তোমাকে আমি সন্ধ্যার সময় কোথায় পাচ্ছি?

মন্দিরা মনে মনে ভাবল কখন কোথায় থাকবে তারপর বলল, ছ'টার পরে ক্যালকাটা কালচারাল সোসাইটিতে থাকব।

ঠিক আছে আই উইল কালেক্ট ইউ ফ্রম দেয়ার।—ইন্দ্র কথা বলতে বলতেই কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল, দেখেই প্রায় লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার একটা জরুরী কাজ আছে, ডোণ্ট মাইন্ড মন্দিরা আই অ্যাম বিইং কমপেল্ড টু লিভ ইউ অ্যালোন দিস মর্নিং। যদি দেরি হোয়ে যায় লাঞ্চ করে নিও।—বক্তব্য শেষ করেই ও তাড়াহুড়ি পা চালিয়ে লনটা পেরুতে শুরু করল।

ইন্দ্র বেরিয়ে যাওয়ার পর মন্দিরা ঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। মিনিট পনের পরে কাগজটা ভাঁজ করে যথাস্থানে রেখে উঠে পড়ল। এরপর পোশাক পরিবর্তন করে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলল। এ সময় ওকে ফিগারেক্সে যেতে হবে। প্রত্যেকদিন শরীর রক্ষার জন্য ওখানে যেতেই হয়। প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী চলতে হয়, এমনকি কী কী খেতে পারবে আর পারবে না তারও তালিকা আছে। সপ্তাহে একদিন চেক-আপের জন্য ডাক্তার আসে। শুধু যে ওকেই দেখতে আসে তা নয় ইন্দ্রকেও দেখে। তারও শরীর রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তালিকা অনুসরণ করে চলতে হয়। ভোরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ম্যাসেজের জন্য মিস সোফেনা চলে আসে। আধ ঘণ্টা ইন্দ্রর শরীরের উপর তার নরম আঙুলের খেলা চলে। এক তরুণীর করস্পর্শে পুরুষের মনে কী হয় তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবে না মন্দিরা। আজ থেকে কয়েকটা বছর আগে হোলে না ভেবে পারত না, হয়ত অগ্নিকাণ্ডই বাঁধিয়ে বসত কিন্তু এখন সে প্রশ্ন উঠেই না কারণ ও জানে ইন্দ্র এখন অন্য মানুষ। কোনো এক প্রফেশনাল ম্যাসে-জারের স্পর্শে যে বিন্দুমাত্র তার মনে কিম্বা শরীরে অস্থিরতা আনবে না তা ও ভাল ভাবেই জানে। সত্যি কথা বলতে কী ওসব নিয়ে এখন ভাবা ত' দূরের কথা মাথাতেই আসে না ওর। আসলে ও নিজের অজান্তেই একটু একটু করে অনেক পরিবর্তিত হোয়ে গেছে। প্রত্যেক দিন মিস সোফেনা চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র বাথরুমে ঢোকে আর এই সময়ের মধ্যেই মন্দিরা অ্যাটেন্ডেণ্টকে জানায় ব্রেকফাস্ট লনে নিয়ে যেতে। এরপর ইন্দ্র বাথরুম থেকে বেরোবার পর দু'জনে একসঙ্গে লনে বসে ব্রেকফাস্ট করে। ব্রেকফাস্ট করেই পেপারের উপর চোখ বুলিয়েই ইন্দ্র কোনো কোনোদিন উঠে পড়ে আবার কোনো কোনোদিন একটু দেরি করেই বেরোয়। যেদিন

ইন্দ্র দেরি করে বেরোয় সেদিন মন্দিরা ওকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে ফিগারেক্সে চলে আসে। আজও একই উদ্দেশ্যে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে আলমারির কম্বিনেশন-লকের নাম্বার ঘোরাতে শুরু করল, আর তখনই মোনা এসে খবর দিল ওর খোঁজে দু'জন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। মন্দিরা মোনাকে তাদের বসাবার নির্দেশ জানিয়ে আলমারি থেকে জামা-কাপড় বার করে ওটা বন্ধ করল। পোশাক পরিবর্তন করে ড্রইংরুমে এসে যাদের দেখল তাদের এই সাত-সকালে দেখতে পাবে বলে ভাবেনি। সাতসকালে বলে নয় তারা যে আসতে পারে একথা বিশ্বাস করাই যেন শক্ত। মা-বাবা-দাদাকে দেখে ও ব্যস্ত হোয়ে উঠল। হাতে খুব বেশি সময় ছিল না তবু ওরই মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলল, মোনাকে ডেকে নির্দেশ দিল মা বাবা-দাদাকে কীভাবে আপ্যায়িত করতে হবে। এরপর তাদের ও না ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল।

॥ এগারো ॥

যুধিষ্ঠির চলে যাওয়ার পর ঝণ্টু, মিঠু, বুলান এবং অন্যান্য ছেলেরা অনেক বেশি বেপরোয়া হোয়ে উঠল। তাদের অত্যাচারে বস্তিবাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মেয়েরা সন্ধ্যের পর একা কোথাও যেতে পাবে না। দিন-দুপুরেও ওরা মেয়েদের বিরক্ত করে। যুধিষ্ঠির যখন ছিল তখন যে ওরা কিছুই করত না একথা ভাবার কারণ নেই, করত কিন্তু এতটা করত না। অন্যান্যদের সঙ্গে যাই করুক অন্তত পুটু আর লালি নিরাপদে চলাফেরা করতে পারত। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কারো ছিল না। ও যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর ঝণ্টু-মিঠুরা বুঝল ও আর এখানে ফিরে আসবে না। নিশ্চিন্ত হোয়ে ওরা লালির উদ্দেশ্যে কিছু অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে ওকে বিরক্ত করতে শুরু করল। বস্তিতে থাকতে হোলে ওদের এ ধরনের অশালীন মন্তব্য শুনতেই হবে এটা লালি জানে তাই মুখ বুজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে। কোনো কোনোদিন ভাবে দু'কথা শুনিয়ে দেবে ওদের কিন্তু সাহসে কুলোয় না। একদিন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছিল কিন্তু ঘটেনি ওর বুদ্ধির জন্য। শেষ মুহূর্তে ওর মস্তিষ্ক ঠিক মত কাজ না করলে সেদিন লালি কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারত না। ও একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল। যেখানেই থাক যে সময় ও ফিরছিল সে সময় কোনোদিনও ফেরে না। যখনই বেরোক না কেন ছ'টা সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসে। সেদিন ফিরতে একটু দেরি হোয়ে গেল। আটটা থেকে ন'টার মধ্যে কোনো এক সময়ে ফিরছিল। মিঠু আর কালু ক্লাব-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছিল। ওদের দেখেই লালির ভয়ে মুখ শুকনো। ওরা ওকে দেখতে পেয়ে কথা বন্ধ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে

দেখে ওর হাত-পা কাঁপতে থাকল। ওদের চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝেছিল মতলব খারাপ, এরপর যখন দেখল ওরা তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন বুঝল তার আজ আর নিস্তার নেই। হিংস্র জানোয়ার শিকার করার পূর্বে ঠিক এরকমভাবেই এগিয়ে আসে। ভয়ে যদিও লালির হাত-পা কাঁপছিল তবুও যেভাবে এগোচ্ছিল সেভাবে এগোতে থাকল সেইসঙ্গে ভেবে চলল কিভাবে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হঠাৎ ও ছুটতে শুরু করল কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না, কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা শক্ত হাত ওর কবজিটার উপর চেপে বসল। চিৎকার করে উঠল ও। কালু সঙ্গে সঙ্গে লালির মুখটা চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল ক্লাব-ঘরের দিকে। লালি জানে একবার ওরা তাকে ক্লাব-ঘরে ঢোকাতে পারলে ওর আর রক্ষে নেই। ক'দিন আগে পদ্মকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তিনজন মিলে। তারা ওকে অক্ষত রাখেনি। তিনজনের পাশবিক অত্যাচারে মেয়েটার যা অবস্থা তা কহতব্য নয়। সেই থেকে মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তিনটে জানোয়ারের অত্যাচার একটা পনের বছরের বাচ্চা মেয়ে সহ্য করে কী করে! ঐ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ কম হয়নি। সুলুক সাঁতরা বলেছিল, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এভাবে চলতে পারে না। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকেই একই কথা জানিয়েছিল কিন্তু ঐ পর্যন্তই কেউ কিছু করতে পারেনি। বস্তিতে যখনই এরকম ঘটনা ঘটে যায় তখনই দু'চারদিন খুব হৈ চৈ হয়। মেয়েরা একটু সতর্ক হোয়ে চলাফেরা করে কয়েকটা দিন। তারপর আবার সব হৈ চৈ থেমে গিয়ে পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে। সব স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। ব্যাপারটা এমন কিছু নয় এরকম একটু-আধটু বস্তিতে থাকতে গেলে হোতেই পারে এরকমই ভাবনা-চিন্তা শুরু হোয়ে যায় বস্তী-বাসীদের মধ্যে। আসলে তাদের পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই বলে তারা বস্তির একটা বড় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পাবে না। বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতারা তাদের কথায় কর্ণপাত করেই না, বরং সেই অশুভ শক্তিকে কাজে লাগাতে চায় বলে তাদের পক্ষ টেনে কথা বলে। পরস্পরের প্রয়োজনে একে অপরের পাশে দাঁড়াবে এরকম একটা অলিখিত চুক্তি যেন আছে অশুভ শক্তি আর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে। সুতরাং রাজনৈতিক নেতাদের স্বারস্থ হোয়ে কোনো লাভ নেই এটা বস্তিবাসীরা জেনে গেছে। ওরা পুলিশের কাছেও যেতে পারে না অনেক কারণে। প্রথম কারণ পুলিশদের মধ্যে কতজন ওদের মানুষ বলে ভাবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যদিও কোনো পুলিশ অফিসার কিছু করতে চায় ওদের জন্য তখনই রাজনৈতিক মহল থেকে চাপ আসে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে না যাবার জন্য, ফলে হাত-পা গুটিয়ে ফেলতে হয় তাদের। দ্বিতীয় কারণ কিছু দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসার ওদের কাছ থেকে উৎকোচ পাবে না জেনে কানে কথা তোলে না। এছাড়া সেই গুন্ডা-বদমাইসদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মাসোহারা পেয়ে থাকে তারা। আরো অনেক কারণ আছে যার-জন্য বস্তিবাসীরা পুলিশের কাছে ফরিয়াদ নিয়ে যেতে চায় না। বছরখানেক আগে

এক বিবাহিত মহিলাকে দু'তিনজন লেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল। ঐ ঘটনা নিয়ে মেয়েটির স্বামী এবং আরো কয়েকজন থানায় গেছিল অপরাধীদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় এই আশা নিয়ে। যাবার পর মনে হয়েছিল না গেলেই ভাল হোত। সুবিচারের আশায় থানায় গিয়ে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা অবর্ণনীয়, বিশেষ করে সেই মেয়েটি মর্মে মর্মে বুঝেছিল যার কাছে সে বিচারের আশায় এসেছিল সে মানুষটা কত জঘন্য। পুলিশ অফিসারটি ওর কাছে জানতে চেয়েছিল কীভাবে ওরা তাকে ধর্ষণ করেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন সব কথা জানতে চেয়েছিল যে তা কোনো মেয়েই কখনো মুখে ব্যক্ত করতে পারে না। যে প্রশ্ন পুলিশ অফিসারটি করছিল তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। মানুষটার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মহিলাটি থানা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। পরপর এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বস্তিবাসীরা বুঝেছিল তাদের কিছু করণীয় নেই। যাদের অর্থ নেই, পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই তাদের কী-ই বা করার থাকতে পারে। এরই জন্য ওরা বলতে বাধ্য হয় বস্তিতে থাকতে গেলে ওরকম একটু-আধটু হয়েই থাকে। লালি ভাল মতনই জানে যদি আজ ওকে ইজ্জৎ দিয়ে আসতে হয় তাহোলে তাকেও শুনতে হবে একই কথা। হয়ত কেউ কেউ তাকেই দোষারোপ করবে, হয়ত বলবে, তোরই বা এত রাত করে ফেরার কী দরকার ছিল! এ ধরনের কত যে মন্তব্য শুনতে হবে তার ঠিক নেই। লালির জানা তাই ও অন্য কোনো কথা না ভেবে মুক্তির উপায় ভাবতে থাকল। যুধিষ্ঠির যখন ছিল তখন ও কোনোদিন এ ধরনের বিপদের কথা ভাবেনি। ও জানত পুটু আর তার দিকে সোজা হোয়ে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পর্যন্ত কারো নেই। এর থেকে অনেক বেশি রাতে ও নিশ্চিন্ত মনে বস্তিতে ফিরেছে। পুটু ত' প্রায়ই রাত করে ফিরত কিন্তু কেউ কখনো কোনো মন্তব্য করার সাহস পায়নি। আজ যুধিষ্ঠির নেই বলে যারা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না তারাই তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ক্লাব-ঘরে। হঠাৎ ও দেখল লেকের দিক থেকে একটা ছেলে আসছে। ওকে দেখেই ও মনে মনে বাঁচার একটা উপায় উদ্ভাবন করল। যেদিক থেকে ছেলেটা আসছিল সেদিকটায় খুব বেশি আলো নেই, ফলে ছেলেটাকে ভাল মতন চেনাই যায় না। লালিও চিনতে পারল না। কী করতে হবে ওকে তা এক মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল ও। এত বিপদের মধ্যেও ওর মাথা ঠিক কাজ করল। যেভাবে ও বাঁচার কথা ভেবেছে সেভাবে ছাড়া এখন আর বাঁচার দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। ছেলেটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ও চিৎকার করে উঠল, ছোড়দা আমাকে বাঁচা, আমি লালি। মিঠু আর কালু একসঙ্গে লালির দৃষ্টি অনুসরণ করে ছেলেটাকে দেখল, দেখে যুধিষ্ঠির মনে করে লালিকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালালো।

কাঞ্চন সিনেমা দেখে ফিরছিল হঠাৎ বামা কণ্ঠের আর্তনাদ কানে যেতেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে লালির মুখের উপর নিয়ে আসল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে তোমার হঠাৎ এভাবে চিৎকার করে উঠলে

কেন? দুটো ছেলেকে দেখলাম দৌড়ে পালিয়ে যেতে ওরা কী তোমাকে বিরক্ত করছিল?

লালি তখনো বুঝতে পারছিল না বিপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে কিনা, তখনো ওর মনের ভেতর থেকে ভয়ের ছায়া মিলিয়ে যায়নি। এই কারণেই ও কাঞ্চনের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না, বিহ্বল হোয়ে তাকিয়ে থাকল ওর মুখের উপর চোখ এনে। ওর হাত-পা-বুক কাঁপছিল। বুকের ওঠা-নামা কমে আসার পর ও কাঞ্চনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল। আস্তে আস্তে যা যা হোয়েছে জানালো ওকে।

শুনে কাঞ্চন ভাবতে থাকল তার এখন কী করণীয়। এ অবস্থায় মেয়েটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া যে উচিত হবে না এটা বুঝতে পেরে বলল, এত রাত করে একা ফেরা উচিত হয়নি তোমার, চল কিছুটা এগিয়ে দি তোমাকে। কোথায় যাবে?

ঐ দিকে।—লালি আঙুল তুলে কোন দিকে যেতে হবে দেখালো।

দাঁড়িয়ে থেকো না এগোও।

লালির বুকের ওঠা-নামা কিছুটা কমেছে ঠিকই কিন্তু বুকের ভেতরের কাঁপুনি তখনো কমেনি তাই ও কাঞ্চনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারল না, ভয় হোলো ওরা যদি ভুলটা বুঝতে পেরে আবার আসে তখন বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না। প্রত্যাখ্যান না করতে পারলেও একজন অপরিচিত ছেলের সঙ্গে এক কথায় যাওয়া চলে না তাই ও বলল, আপনি আমার জন্য আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন?

কাঞ্চনের বুঝতে অসুবিধা হোলো না যে ঘটনা ঘটে গেছে তারপর কোনো মেয়েই কোনো পুরুষমানুষকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না তাই ও বলল, বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে তোমার যাওয়ার অসুবিধাটা কোথায়। এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর চট করে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, না গেলেও তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না। আমার সঙ্গেও যাওয়া চলে না আবার একা যাওয়াও চলে না এরকম যখন অবস্থা তখন একটু ঝুঁকি নিয়ে আমার সঙ্গে চলই না।

লালি এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না হাঁটতে শুরু করে।

কাঞ্চন কয়েক পা ওর সঙ্গে নীরবে হেঁটে আসার পর বলে, তোমার নামটা যদি জানতে চাই তুমি কিছু কী মনে করবে? না জানানোর ইচ্ছে থাকলে জানিও না।

লালি।—লালি যেভাবে পথ চলছিল সেভাবে চলতে চলতেই নামটা বলল।

লালি কী?

ঘোষ।

আমার নাম কাঞ্চন রায়। যদি আবার কখনো আমাদের দেখা হোয়ে যায় তাহোলে আমরা পরস্পরের নাম ধরে যাতে কথা বলতে পারি তার জন্য তোমার নামটা জেনে নিলাম এবং সেই সঙ্গে নিজের নামটাও জানিয়ে রাখলাম।—কথা শেষ করে কাঞ্চন লালির মুখের উপর দৃষ্টি এনে হাসল।

যদি দেখা হয়!—লালিও হাসবার চেষ্টা করল।

জানি না তুমি কী ভাবছ হয়ত একথাও ভাবতে পার, কোনো অজুহাতে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে পারি।

না-না সেরকম কিছু ভাবছি না। আপনি কী ভাবছেন আজকের ঘটনার জন্য কোনো ছেলেকেই আর বিশ্বাস করতে পারব না ?

লালির কথা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে আর কথা হোলো না। নীরবে বেশ কিছুটা পথ একসঙ্গে হেঁটে আসার পর লালিই আবার কথা বলে উঠল, বলল, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না এবার আমি নিজেই যেতে পারব।

আমি জানি কেন এ কথা বললে।

কেন ?

তুমি ভাবছ আমি তোমাকে পৌঁছে দে'য়ার নাম করে তোমার বাড়িটা চিনে আসতে চাইছি।

না। আপনি যা ভাবছেন আমি তা কখ্খনো ভাবিনি, আমি বস্তিতে থাকি তাই লেখাপড়া জানি না এভাবে ঘুরিয়ে-পেচিয়ে কথা বলবেন না।

ঘুরিয়ে-পেচিয়ে আবার কী বললাম ! বিদ্যের দৌড় আমারও বেশি নয় দু'বারের চেষ্টায় স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেছি। একটা পেট চালাবার মতন একটা ছোট্ট দোকান আছে আমার, বস্তিতে না থাকলেও রাজমহলে থাকি না। দোকানের এক কোণে পড়ে থাকি। ওখানে মাথা গোঁজার জায়গা না পেলে এদিকেই একটা ঝুপড়ি-টুপরি বানিয়ে থাকতে হোত, পেট চালিয়ে ঘর ভাড়া করার মত রোজগার করি না এখনো। পেট চালিয়ে যা বাঁচে তাতে ঘর ভাড়া না করা গেলেও আমার একটা শখ মেটাতে পারি। বই কেনার আমার ভীষণ শখ। কেনা অবশ্যই পড়ার জন্য তবে শুধু কিনে ত' আর মন ভরানো যায় না তাই লাইব্রেরি থেকে এনেও পড়ি। বকবক করছি বলে তুমি বিরক্তবোধ করছ—না ?

না।

সত্যি বলছ ত' ?

লালি কথার জবাব না দিয়ে হাসল।

তোমার কথা শুনে বোঝার উপায় নেই যে তুমি বস্তিতে থাক।

আমার কথায় কী আছে ?

তোমার উচ্চারণ খুব ভাল বস্তিবাসীদের মতন নয়।

হোতে পারে কারণ··· এ পর্যন্ত বলেই লালি হঠাৎ চুপ করে গেল।

কী হোলো চুপ করে গেলে কেন ? আমার সঙ্গে আলাপ বেশিক্ষণের নয় বলে বোধহয় বলতে পারছ না !

ভুল উচ্চারণ করলে দাদা শুধরে দিত তাই আমাদের ভাই-বোনদের কথার উচ্চারণের সঙ্গে বস্তির অন্যান্য বাসিন্দাদের উচ্চারণ মেলে না।

তোমার দাদার উচ্চারণ ঠিক হোলো কী করে ?

দাদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

কথাটা শুনে কাঞ্চন চমকে উঠল। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ও যেন চোখের পাতা নামাতেই ভুলে গেল। এক সময় ধাতস্থ হোয়ে বলল, তিনি এখন কোথায় ?

বিয়ে করার পর সল্টলেকে উঠে গেছে। নিজের বাড়িতে থাকে।

নিজের বাড়িতে ?

শুনেছি ও এখন অনেক বড়লোক।

শুনেছ মানে ?

লালি কাঞ্চনের কথার জবাব দিতে পারে না. উত্তর না দিয়ে মাথা নত করে হাঁটতে থাকে। অপরিচিত একটা ছেলের কাছে সব খুলে বলা যায় না তাই নিরুত্তর থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেল না। চাকরি পাওয়ার পর ইন্দ্র কিছু টাকা মাসে মাসে দিতে চেয়েছিল তাদের কিন্তু পুটু ওকে দিতে দেয়নি। ইন্দ্রকে বলেছে, তোর টাকা নিলে বাবাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, নেশা করে যা হাল করে রেখেছে শরীরের তার উপর ঐ টাকা পেলে ত' কথাই থাকবে না।—পুটু ইন্দ্রর টাকা নিতে চায়নি জেনে মহাবীর ঘোষ রেগে যা নয় তাই মেয়েকে বলেছে। পুটুও মুখ বন্ধ করে রাখেনি, বলেছে, ছেলের টাকা নিবি ! কী করেছিস ছেলের জন্য শুনি ? জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোন্ কর্তব্যটা পালন করেছিস যে আজ হাত পেতে ওর টাকা নিতে চাইছিস ! —ওর কথা শুনে মহাবীর ঘোষ মারতে শুধু বাকি রেখেছে। আর চাঁপা ! সে কপাল চাপড়ে অতীতে যে ভুল করেছে তার জন্য আফশোষ করে বলেছে, এরকম মেয়ে জন্মাবার পর গলায় নুন দিয়ে মেরে ফেলিনি কেন সে কথাই ভাবছি এখন। কোনো মেয়ে বাবাকে এ ভাবে বলতে পারে এ কথা বাপের জন্মে শুনিনি।—পুটু চুপ করে থাকার মেয়ে নয় সেও সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠেছে, শুনিসনি ! এবার শোন।—এ ভাবেই বেশ কিছুদিন মহাবীর ঘোষ আর চাঁপার সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে থেকেছে। পরে মেয়ের সঙ্গে বাপ-মা দু'জনেই কথা বন্ধ করে থেকেছে কয়েক দিন, তারপর আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। মহাবীর ঘোষ আর চাঁপা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে। মিটিয়ে না ফেলে উপায় ছিল না তাদের কারণ সংসার তখনো পুটুর টাকাতেই চলছে। এ সব কথা বাইরের লোকের কাছে মেলে ধরা যায় না তাই লালি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অন্য প্রসঙ্গে সরে এলো, বলল, আপনি আমার উপকার করলেন, না করলে কী যে হোত ভাবাই যায় না। এর জন্য আগেই ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল কিন্তু মনের যা অবস্থা ছিল তাতে সে কথা মনেই আসে নি এতক্ষণ।

দুর্ তা কেন তুমি ত' নিজের বুদ্ধির জোরেই রক্ষা পেয়ে গেলে। ঐ ছেলে দুটোকে কী তুমি চিনতে পেরেছ ? ওরা মনে হয় এ অঞ্চলেরই ছেলে।

লালি ঘাড় নেড়ে জানালো ওদের ও চেনে তারপর ওদের নাম প্রকাশ করে বলল, ভাগ্যিস আপনাকে ওরা চিনতে পারেনি পারলে ওরা আপনার উপর চড়াও হোত।

কথা বলতে বলতে ওরা লালিদের ঝুপড়ির কাছে চলে এলো। ঝুপড়ির কাছে

এসে লালি বলল, এটাই আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই যদি কখনো এদিকে আসেন তাহোলে চলে আসবেন।

যদি আসি তুমি কিছু ভেবে বসবে না ত' ?

কী ভাবব ?

আমি তোমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইছি এটা তুমি ভাবতে পার।

সে কথা ভাবলে ত' আপনাকে আসতেই বলতাম না।

ঠিক আছে যদি আসি তাহোলে নিশ্চয়ই আসব। তুমিও যদি কখনো লেক-গার্ডেন্স থেকে বেরিয়ে বাস-স্টপের দিকে যাও তাহোলে আমার সঙ্গে দেখা কোর। বাস-স্টপের কাছে যে ক'টা দোকান আছে তার উপর চোখ বুলোলেই আমার দেখা পেয়ে যাবে, নাও যদি পাও, চলে এসো না যে কোনো দোকানে আমার নাম বললেই দেখিয়ে দেবে।—কাঞ্চন কথা শেষ করে লালির কাছে বিদায় নিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সে পথ ধরে ফিরে চলল গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে।

লালি ভেবেছিল যা যা ঘটেছে ঘরে ফিরে পুটুকে জানাবে কিন্তু ঘরে পা রাখার পর জানাতে পারেনি, ভরসা হয়নি। যে ঘটনা ঘটেছে সে কথা জানাতে গেলে সে যে রাত করে ক্লাবের পাশ দিয়ে ফিরছিল সে কথা গোপন থাকবে না। এটা ঘরে ফিরে আসার পর খেয়াল হোলো। পুটু অনেকবার ওকে বারণ করেছে সন্ধ্যের পর ক্লাবের পাশ দিয়ে না আসার জন্য। ফিরে এসেই ও চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ল। কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফিরছিল বলে যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল তা নিয়ে বিশেষ ভাবেনি তখন কিন্তু এখন সে ঘটনার একটা চিত্র ভেসে উঠল মনের মধ্যে। এবং যে ঘটনা না ঘটলেও ঘটে যেত সেরকম একটা ছবিও ভেসে উঠল। সেই ছবি মানস-চক্ষে দেখেই ও কেঁপে উঠল।

লালি ফিরে এসে শুয়ে পড়ার পর থেকেই পুটু ওকে লক্ষ্য করছিল। ও ফিরে এসে জামা-কাপড় পরিবর্তন না করে শুয়ে পড়ল দেখে পুটু আগেই যথেষ্ট অবাক হয়েছিল, এরপর যখন ও দেখল লালি শুয়ে থাকতে থাকতেই মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে তখন ও আর চুপ করে থাকতে পারল না, প্রশ্ন করল, কী হয়েছে তোর ?

কিছু হয়নি।—পুটুর কথার উত্তর দিতে গিয়ে আরো ভালভাবে বুঝিয়ে দিল যা ও বলল তা ঠিক নয়। কথা বলার সময় ওর গলার স্বর কেঁপে উঠল।

একটা কিছু যে হয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকল না পুটুর। ও ধমকে উঠল, কিছু হয়নি বললেই হোলো আমি বেশ বুঝতে পারছি একটা কিছু হয়েছে, বল কী হয়েছে ?

পুটুর প্রশ্ন শুনে ও সহজে যা হয়েছে তা বলতে চায়নি। ক্রমাগত পুটুর কাছ থেকে প্রশ্নের ঢেউ ওর উপর আছড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল সব কিছু জানাতে। জানাবার পর যা হবে ভেবেছিল তাই হোলো, তিরস্কারের বন্যায় ও কিছুক্ষণ ডুবে থাকল।

দিন কয়েক পরে লালি ঠিক করল বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে যাবে। ক'দিন ধরেই

যাবে বলে ভাবছিল। ভীষণ একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল। কাঞ্চন বেশ কয়েক-বার মনের কড়া ধরে নেড়ে দিয়ে গেছে তাই ও ঠিক করল বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ওর খোঁজ করবে। যেদিন ও যাবে ঠিক করল সেদিন বিকেলে একটু অন্যভাবে সাজল। অন্যভাবে বলতে একটু বেশি সেজে বেরোলো। বস্তি থেকে সোজা বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে এলো। কাঞ্চনের নির্দেশ অনুযায়ী বাস-স্ট্যাণ্ডের লাগোয়া কয়েকটা দোকানের উপর চোখ রাখতেই কাঞ্চনের দোকানটা দেখতে পেল। ছোট একটা স্টেশনারী দোকান দুটো বড় দোকানের চাপে যেন চেপ্টে আছে। কারো নজর না পড়ার মতনই দোকান। লালি দেখল বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঞ্চন কিছু কিছু জিনিস এক পাশ থেকে সরিয়ে অন্য পাশে রাখছে। রাস্তার দিকে ফিরে থাকলে লালির সঙ্গে ওর চোখাচোখি হোয়ে যেত। লালি দোকানের কাছে এসেই একটু রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারল না, বলল, দোকানে খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে আর আপনি কিনা দোকান সাজাতে বসেছেন।

লালির কণ্ঠস্বর শুনেই কাঞ্চন ঘুরল, ঘুরে লালিকে দেখে বলল, তুমি! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?

এই এলাম। এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে আপনাকে দেখে ভাবলাম এসেছিই যখন, তখন দেখা করেই যাই আপনার সঙ্গে।—লালি যে তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে সে কথা বলতে পারল না

যে কাজে এসেছিলে সে কাজ হোয়ে গেছে?

হ্যাঁ। কেন?

তুমি যখন এলেই তখন তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা না বলে বিদায় করব তোমাকে তা কী হয়।

দোকানে দাঁড়িয়ে খদ্দের ছাড়বেন না আমার সঙ্গে কথা বলবেন?

কাঞ্চন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রোলিং-সাটার নামিয়ে দিয়ে বলল, এখন নিশ্চয়ই খদ্দের ছাড়ার আর প্রশ্ন উঠবে না?

আমি এসে দেখছি আপনার ক্ষতি করে ফেললাম।

দোকানের যা হাল তাতে এক-আধ ঘণ্টা বন্ধ থাকলে কিছুই এসে যায় না। তুমি এসেছ বলে নয় অনেক দিন এক-আধ বেলা দোকান আমি খুলিই না।

এখন ত' আমার জন্যই বন্ধ করলেন দোকান!

বেশ করেছি এবার বলত তুমি কী এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে?

কী করবেন?

তুমি যদি রাজী থাক তাহোলে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এভাবে কথা না বলে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কোথাও না শুধু হেঁটে কিছুটা যাব আবার কথা বলতে বলতে ফিরে আসব।

খুব বেশিক্ষণ কিন্তু দেরি করতে পারব না।

সেদিনের ঘটনার পর আর দেরি করাতে পারি কখনো।

লালি আর কাঞ্চন এরপর কথা বলতে বলতে যাদবপুর ফাঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করল। সেদিনের পর আরো কয়েকদিন লালি কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করল, আরো ক'দিন একই ভাবে কথা বলতে বলতে হাঁটল। যতই দিন যাচ্ছিল ততই লালি বুঝতে পারছিল কাঞ্চনের আকর্ষণ ওর কাছে তীব্র থেকে তীব্রতর হোচ্ছে। কাঞ্চনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে ওর মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কোন্ পুরুষমানুষের গলায় ও মালা দেবে তা নিয়েই ছিল ওর দুশ্চিন্তা। ও বস্তির মেয়ে সুতরাং তাকে যে জীবনসঙ্গিনী করতে চাইবে সে এ বস্তিরই একজন হবে এটা ও জানত, এটাই ছিল ওর দুর্ভাবনা! বস্তির মেয়ে হোলেও ওর জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। চাল-চলন-কথাবার্তায় যে পরিবর্তন এসেছে তাতে বস্তির কোনো মানুষের গলায় মালা দে'য়ার কথা ভাবা যায় না তাই মনের মধ্যে যথেষ্ট ছটপটানি ছিল। কাঞ্চনের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর ও কিছুটা নিশ্চিন্ত হোতে পেরেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হোলেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত তখনো হোতে পারেনি। অনুমান করতে পারছিল কাঞ্চনও তার দিকে ঝুঁকেছে কিন্তু পরস্পরের কাছে প্রেম নিবেদনের পালা তখনো অসম্পূর্ণ অর্থাৎ মুখ ফুটে কেউ মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত লালি ঠিক করে ফেলল এভাবে আর নয় এবার তার কথা সোজাসুজি কাঞ্চনকে জানাবে। ঠিক করেই ও বস্তি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পুটুকে আগেই কাঞ্চনের কথা জানিয়েছিল এবং এবারও বেরোবার আগে তার উদ্দেশ্যের কথা ওকে জানিযে বেরোল। পুটু ওকে বেরোবার পূর্বে নিজে হাতে সাজিয়ে দিল। পুরুষমানুষকে ধরে রাখতে হোলে এবং কাছে টানতে হোলে মেয়েমানুষকে একটু সাজসজ্জা করতেই হয়। এটা পুটুর অভিমত। এই অভিমত লালিকে জানিয়ে ওকে সাজিয়ে দিয়েছিল পুটু। লালি বাড়ির বাইরে পা রাখার আগে আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছিল! এমন অপূর্ব দেখাচ্ছিল যে নিজেকেই নিজে যেন চিনতে পারছিল না। ও যখন কাঞ্চনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন কাঞ্চনের চোখ নিস্পলক।

কী দেখছেন ওভাবে?—কাঞ্চনের অবস্থা দেখে বুঝল ওর অনুমান অভ্রান্ত, মনের মধ্যে আর কোনো সংশয় থাকল না।

দেখছি না ভাবছি।

কী?

এমন রূপসীর গলায় যে মালা পরাবে সে কী অসম্ভব ভাগ্যবান।

খুব হয়েছে এবার চলুন ত' কোথাও গিয়ে বসি। লেকে যাবেন?

বেশ চল।—কথাটা বলেই কাঞ্চন একটা অটো-রিক্সাকে দাঁড় করালো। এরপর লালিকে উঠে পড়ার নির্দেশ জানিয়ে নিজে উঠে এলো অটো-রিক্সায়।

লালি উঠে আসার পর বলল, লেক এখান থেকে এমন কিছু দূরে নয় যে সেখানে

যাবার জন্য আপনাকে অটো নিতে হোলো। দিব্বি হেঁটে এটুকু পথ আমরা চলে যেতে পারতাম।

আজ তোমাকে যে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে সে অতি বড় পাষণ্ড। ভবিষ্যতে যে মানুষটা তোমার গলায় মালা দেবে সে যদি জানতে পারে কোথাকার কোন কাঞ্চন নামের ছেলে তার স্ত্রীকে হাঁটিয়ে নিয়ে আধ মাইল পথ গেছে তাহোলে···

লালি কাঞ্চন যাতে কথাটা শেষ না করতে পারে তার জন্য সজোরে ওর হাতে চিমটি কাটল। একটা কাতরোক্তি বেরোলো কাঞ্চনের কণ্ঠ থেকে। লালি ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, কী হোচ্ছে কী আরো একজন লোক আমাদের সামনে বসে আছে একথা মনে থাকছে না কেন!

এরপর কাঞ্চন একটু সতর্ক হোয়ে কথা বলতে শুরু করল। অটো-রিক্সা ছেড়ে দিয়ে লেকে এসে ঘাসের উপর বসার পর কাঞ্চন বলল, আজ বাড়ি গিয়েই নখ কাটবে, কী করেছ দেখ?—কথাটা বলেই কাঞ্চন হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে যে জায়গাটায় লালি চিমটি কেটেছিল সে জায়গাটা দেখাল।

বাজে কথা বললেন কেন তখন?

যা সত্যি তাই ত' বলেছি।

লালি কাঞ্চনের বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। মাথা নত করে বসে একটা দুটো করে ঘাস ছিঁড়তে থাকল। ঐভাবে বসে থাকার কারণ, যে কথাটা বলবে বলে ভাবছিল সেটা কী ভাবে পাড়বে তা নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ তারপর বলল, আমি অন্য পুরুষের গলায় মালা দেব বলেই যদি ভেবে থাকেন তাহোলে আমার সঙ্গে এত ঘুরে বেড়ানো কেন? কেনই বা আজ এখানে আসা?

কাঞ্চন অনেকদিন ধরেই ভাবছিল লালি হয়ত তাকে ভালবাসে কিন্তু ভাল যে বাসেই সে ব্যাপারে নিশ্চিৎ হোতে পারছিল না। নিজের মনের কথা বলার মতন সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারছিল না তাই আজ লালির কথা শুনে ও কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু বলতে না পেরে একটা হাত দিয়ে লালির একটা হাত ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর ঐ স্পর্শের মধ্য দিয়ে যেন তার অন্তরের কথা প্রকাশ করতে চাইল।

লালির আর বুঝতে অসুবিধা হোলো না কাঞ্চনের হৃদয়ের কথা। বুঝতে পেরে বলল, তুমি না পুরুষমানুষ একটা ছোট্ট কথা বলার সাহস নেই কেন! মেয়েমানুষ হোয়েও শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই কথাটা বলতে হোলো।

সাহসের কথা নয় বলতে পারিনি অন্য কারণে।

কী কারণে শুনি।

ঐ ত' এক চিলতে দোকান ওতে একটা মানুষেরই ভাল মতন চলে না···

ভালবাসার সঙ্গে টাকার সম্পক্ক আছে?

সম্পক্ক নয় সম্পর্ক, টাকা ছাড়া দু'জন একসঙ্গে ঘর বাঁধব কী করে?

চেষ্টা কর, যতদিন না আয় বাড়ছে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকব।

ভালবেসেছি তোমাকে অন্য লোকের গলায় ত' মালা দিতে পারব না সুতরাং যতদিন না কিছু করতে পারছ ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবেই।

যদি কোনোদিন কিছু না করতে পারি ?

তাহোলে আমাকে কুমারী হোয়েই থাকতে হবে আজীবন।

একথা শোনার পর কাঞ্চন বলল, এবার আমাকে উঠে পড়ে লাগতেই হবে। হাজার বিশেক টাকা যদি কোনো রকম যোগাড় করতে পারি তাহোলে ঐ দোকানের আয়ই আমি চারগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারব।

সেদিন লালি আর কাঞ্চন একটু রাত করে লেক থেকে ফিরল। কাঞ্চন ওকে ওর ঝুপড়ির কাছে পেঁাছে দিয়ে তবেই তার আস্তানায় ফিরল।

পুটু একটা বই হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে বসেছিল। লালি ঝুপড়িতে ঢুকতেই বইটা বন্ধ করে বলল, এদিকে আয় তোর সঙ্গে কথা আছে।

লালি জানে কী বলবে পুটু তবুও প্রশ্ন করল, কী বলবি ?—প্রশ্ন করেই কয়েক পা হেঁটে এসে দাঁড়াল ওর কাছে।

বোস বলছি।

লালি চাটাইয়ের উপর বসে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল পুটুর দিকে। ও জানে পুটুর কী ইচ্ছে। কাঞ্চন ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে কিনা এটাই ওর জিজ্ঞাস্য, ইতিপূর্বে কাঞ্চন সম্বন্ধে যা জানার জেনেছে। জানার পর খুশি হয়েছে যে তা পুটুর মুখ-চোখ দেখে লালি বুঝেছে। এরপর থেকে অপেক্ষা করে থেকেছে কাঞ্চন বিয়ের প্রস্তাব কবে দেয় তার জন্য। লালি আগেই জানত আজ ফেরার পর পুটু ওকে প্রশ্ন করবে। আজকের কথা জেনে পুটু খুশি হোতে পারবে না তা ও ভাল ভাবেই জানে।

কাঞ্চন কিছু বলেছে ?

লালি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কাঞ্চন ওকে এখন বিয়ে করতে পারবে না এটা জানাতে ওর অসুবিধা হোচ্ছিল তাই কিছুক্ষণ চুপ করেছিল, চুপ করে থেকে প্রশ্নটা পাশ কাটানো যাবে না বুঝে দু' এক মিনিট পরে বলল, ও এখন কিছু করতে পারছে না, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।—এরপর জানালো কেন ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

পুটু শোনার পর বলল, হাজার বিশেক টাকা পেলে ও তোকে বিয়ে করতে পারবে ? ঠিক আছে তোকে কিছু বলতে হবে না ওকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসিস।

এরপর আরো কিছু কথা হোলো পুটু আর লালির মধ্যে এবং সমস্ত কথাই কাঞ্চনকে ঘিরে। সেদিনের পর দু' দিনের ব্যবধানের পর কাঞ্চনকে লালি নিয়ে এলো তাদের বস্তিতে। পুটুর সঙ্গে ওর কথা হোলো। কথা বলে পুটু বুঝল ওর সঙ্গে বিয়ে হোলে লালি সুখে থাকবে। ছেলেটা ভাল। আগেই ও ভেবে রেখেছিল যদি কথা বলে ওর ধারণা হয় ছেলেটা ভাল তাহোলে বিশ হাজার টাকা দেবে ওকে।

বিয়ের যৌতুক হিসাবে টাকাটা দেবে এটা ভেবে রেখেছিল ঠিকই কিন্তু অত টাকা পুটুর কাছে ছিল না। ঠিক করল টাকাটা ইন্দ্রর কাছ থেকে চাইবে। ওর কাছ থেকে টাকা আনার কথা মনে হোতেই পুটুর খেয়াল হোলো অনেকদিন ওদের ওখানে যাওয়া হয়নি। চতুর্বেদীর মৃত্যুর পর পুটু ঘর ছেড়ে বিশেষ বেরোয় না। দিনরাত গল্পের বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে। কখনো কখনো ইন্দ্রদের বাড়িতে যাবে বলে ভাবে কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয় না। এই উপলক্ষে যাওয়াও হবে আর সেই সঙ্গে টাকাটা ওর কাছে চেয়ে আসবে। কাঞ্চন যেদিন এলো তার পরের দিনই ও সল্টলেকে এলো। যখন এলো ও তখন ইন্দ্র লনে বসে পেপার পড়ছিল ওকে দেখে পেপারটা ভাঁজ করে টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, এত সকালে কী ব্যাপার রে দিদি? কোনো কী···

না-না তুই যা ভাবছিস তা নয় কারো কিছু হয়নি। এই সাতসকালে আমাকে দেখে তুই ভয় পেয়েছিস—না?

পাব না। অনেকদিন পর সকাল হোতে না হোতে এলে একটু দুর্ভাবনা ত' হবারই কথা।

তা ঠিক আসলে এসেছি একটা প্রয়োজনেই।

কী প্রয়োজন?

বলব তার আগে তোদের সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিতে দে, মন্দিরা কী করছে?

ওকে তুই এখন কোথায় পাচ্ছিস? ও এ সময় বাড়িতে থাকে না, শরীর ঠিক রাখার জন্য ফিগারেক্সে যায়।

ফিরবে কখন?

এই ত' গেল ফিরতে ফিরতে ঘন্টাখানেক কম করে। সবাই ভাল আছিস ত' তোরা?—কথা বলতে বলতে ইন্দ্র আবার পেপারটা তুলে নিল টেবিল থেকে।

ভালই আছি তবে মাঝে মাঝে বাবার শরীরটা যা একটু-আধটু খারাপ হয়।

এবার বল।

পুটু লালি আর কাঞ্চনের কথাটা জানালো। টাকার কথাটাও জানালো। ও কাঞ্চন সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে কথা ইন্দ্র শুনতে চাইল না, বলল, ও সব শুনে আমি আর কী করব টাকাটা পেলে যদি ও বিয়ে করে তাহোলে ওকে ওটা দিয়ে দিলেই ত' হয়।—এবপরই ইন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোস আগে তোকে টাকাটা দিয়ে নি তারপর অন্য কথা।—বলে লনের চাইনিজ ঘাসের উদ্ধত মাথাগুলোকে বিনীত হোতে বাধ্য করতে করতে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ইন্দ্র চলে যাওয়ার পর পুটুর মনে হোলো ও অনেক বদলে গেছে। আগের ইন্দ্রর সঙ্গে আজকের ইন্দ্রর ও কোনো মিল খুঁজে পেল না, যেন অন্য আরেক মানুষকে ও দেখতে পেল। ভীষণ অচেনা মনে হোলো ওকে। যদিও সবাই জানে

আছে কিনা জানতে চেয়েছিল তবু তার মধ্যে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। দীর্ঘদিন ও নিজে কোনোদিন বস্তির দিকে পা বাড়ায়নি এমনকি পুটু আসার পরও যেভাবে সকলের কথা জানতে চেয়েছে তাতে পুটুর ঐ কথাই মনে হয়েছে। একটা মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যবধানেরর পর এত পরিবর্তন আসতে পারে এটা পুটুর ধ্যান-ধারণার বাইরে। স্থানুর মত বসে ইন্দ্রকে নিয়ে ভেবে চলল ও। ওর বার বারই মনে হোতে থাকল অতীতের ইন্দ্র আর বর্তমানের ইন্দ্রর মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে ; বাড়াটা অস্বাভাবিক নয় কারণ ওর আজ অনেক টাকা কিন্তু তাই বলে আগের জীবনের সব কিছু ভুলে বসবে এটা ভাবা যায় না। টাকার দু'পাশ যেন দুই ইন্দ্র যারা আর কোনোদিনও পরস্পরের চেহারাটা দেখতে পাবে না।

একটু পরেই ইন্দ্র ফিরে আসল। এসে একটা চেক পুটুর হাতে দিয়ে বলল, তোর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই আজ, একটা জরুরী অ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট আছে, কিছু মনে করিস না। আর একটা কথা—

কথাটা বলতে গিয়েও ইন্দ্র কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারল না দেখে পুটু বলল, কী কথা বলতে গিয়ে বলতে পারছিস না ?

না থাক।

থাকবে কেন বল না কী বলবি ?

অন্য আরেকদিন বলব আজ থাক।

না থাকবে না যা বলার বল আমি কিছু মনে করব না।

তোরা আর ঐ নরকে পড়ে থাকিস না অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করে উঠে যা। তোদের জন্য আজ পর্যন্ত আমরা কিছু করিনি তাই ভাবছি হাজার পঞ্চাশ-ষাট তোর নামে ফিক্সড্ করে দেব ব্যাঙ্কে আর বাড়ির ভাড়া বাবদ যেটা লাগবে সেটার জন্য ব্যাঙ্ককে ইন্সট্রাকশন দিয়ে দেব যাতে নিয়মিত ভাড়া ব্যাঙ্ক থেকে সোজা ল্যান্ড-লর্ডের কাছে চলে যায়।

পুটুর মনে হোলো ইন্দ্র যা বলল তার বাইরে আরো কিছু বলার আছে কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। বুঝতে পেরে বলল, এ কথাটাই শুধু তুই জানাতে চাইছিলি না আরো কিছু তোর বলার ছিল ? আমার মনে হয় তুই আরো কিছু বলতে চাইছিস।

হ্যাঁ, মানে আমরা দু'জনই খুব ব্যস্ত থাকি আজকাল তাই তুই এখানে এলে তোর সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলতে পারব না, কিছু যদি মনে না করিস তাহোলে একটা কথা বলব ?

কী ?

তোরা বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাওয়ার পর সে বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে ফোনে জানিয়ে দিস, আমিই মাঝে মাঝে সময় করে ওখানে যাব।—কথাটা বলেই ইন্দ্র ঘড়ি দেখল, দেখেই বলল, আর বসতে পারছি না এবার না বেরোলেই নয়।—বলে আর দাঁড়াল না তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে লনটা পেরুতে শুরু করল।

হঠাৎ পুটুর মনে হোলো ও বোধির হোয়ে গেছে, মনে হোলো কানের ভেতর যেন কেউ গলিত সীসা ঢেলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে মনে হোলো সমস্ত পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। পায়ের নিচের মাটি ছিটকে যেন সরে গেল। কী যে হোয়ে গেল তা যেন ও বুঝতে পারছে না শুধু মনে হোতে থাকল একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে ওর চোখের সামনে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আরো অনেক কিছুই মনে হোতে থাকল। মনে হোলো জমাট কোনো অন্ধকারের ভেতর ও তলিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ পর ও সম্বিৎ ফিরে পেল মোনার কণ্ঠস্বর শুনে।

আপনি কী কিছুক্ষণ বসবেন দিদি? বৌদি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।

না।—ছোট্ট একটা কথাকে যেন টেনে হিঁচড়ে পুটু নিয়ে এলো জিভের ডগায়, এরপর হাতের চেকটা মোনার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, তোমার দাদাবাবুকে এটা দিয়ে দিও।—বলে আর দাঁড়াল না, ঝড়ের মত বাড়িটার গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে এলো। উদ্দেশ্যহীনভাবে যে পথ সামনে পেল সে পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে সে কথা পর্যন্ত ভাবতে পারছে না। মনের ভেতর শুধু বিরাট এক শূন্যতা। শরীরের সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত; ঝরা পাতার মতন ভাসতে ভাসতে ও ভি-আই-পি রোডে চলে এলো। প্রশস্ত সড়ক ধরে এগিয়ে চলল। কোথায় যেতে হবে সে কথা একবারও মনে করতে পারল না। ও যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে যে কেউ দেখলে ভাববে একটা মৃত শরীরকে কেউ যেন ধরে নিয়ে চলেছে। পুটুর মনে হোলো তার মৃত্যু হোয়ে গেছে আর নিজের মৃতদেহটাকেই ও টেনে নিয়ে চলেছে। হাত-পা অসার, শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হোয়ে আছে।

বিজলী উল্টোডাঙা থেকে ফিরছিল ভি-আই-পি রোড ধরে হঠাৎ ওর চোখ চলে এলো পুটুর উপর। অনেকটা দূর থেকেই ওকে সে দেখতে পেল। দেখে ও রীতিমত অবাক। ওর ধারণা হোলো পুটু ভয়ঙ্কর অসুস্থ, সুস্থ মানুষ হোলে হাঁটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকত না, ভয়ঙ্কর অসুস্থ না হোলে ও ঐভাবে হাঁটত না। অবাক হবার সব থেকে বড় কারণ শুধু ওর অসুস্থতাই নয় অসুস্থ শরীর নিয়ে এত ভোরে এতদূর আসা। বিজলী গাড়িকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়ে ওর কাছে এনে দাঁড় করাল। এরপর গাড়ি থেকে নেমে পুটুর কাছে এসে বলল, আপনি! এই শরীর নিয়ে এখানে তাও এই সকালে, কী ব্যাপার?

পুটু কী বলবে ভেবে পায় না, বিজলীর প্রশ্ন যেন ঠিক শুনতে পায়নি এমন-ভাবে তাকিয়ে থাকে। সেই চোখের দৃষ্টিতে শোক, দুঃখ, অভিমান না অন্য কিছু বোঝার উপায় নেই।

বিজলী উত্তর না পেয়ে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গাড়িতে বসায়, সেই সঙ্গে বলতে থাকে, যতই প্রয়োজন থাক-না কেন এ অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরোনো আপনার

উচিত হয়নি। খুলে বলুন ত' এত সকালে এই শরীর নিয়ে এত দূর কেন ছুটে আসতে হোলো।

পুটু ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, তবে দু' চোখ ঝাপসা হোয়ে এলো। চোখের পাপড়ি তির-তির করে কাঁপতে থাকল।

বিজলী ওর অবস্থা দেখে বলল, কী হোয়েছে আপনার আমাকে বলবেন না?

আপনি কোন দিকে যাবেন?—এবার আর পুটু নীরব থাকল না, নীরব না থাকলেও বিজলীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলল।

যেখানেই যাই না কেন আপনাকে আমি আপনার বাসায় পৌঁছে না দিয়ে কোথাও যাচ্ছি না।

কিন্তু আমি ত' এখন ওখানে যাব না।

যাবেন না! এ শরীর নিয়ে কোথায় যাবেন?

পুটু আবার বোবা হোয়ে গেল। নীরবতা অবলম্বন করে কাচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকল সামনের রাস্তার দিকে। নিষ্পলক ওর চোখ, থমথমে আকাশের মত মুখ। দেখে মনে হয় অসংখ্য বিচিত্র রজনীর ক্লান্তি ওর শরীরে।

বিজলী স্টিয়ারিংয়ের উপর হাত রেখেই চোখ মাঝে মাঝে রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছিল পুটুর মুখের উপর। কিছুক্ষণ ঐভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল, যখন বুঝল উত্তর আসার সম্ভাবনা নেই তখন বলল, কী হোলো বললেন না কোথায় যাবেন?

যদি অসুবিধা না থাকে আমাকে লেকের কাছে নামিয়ে দেবেন।

লেকের কাছে! ওখানে কেন যেতে চাইছেন আমি জানতে চাইব না শুধু বলব এ শরীর নিয়ে নাই বা গেলেন আজ।

না গিয়ে উপায় নেই।

কেন? যদিও আপনাকে একটু আগেই বলেছিলাম জানতে চাইব না কিন্তু না জেনেও পারছি না। আজ আপনি বাসায় ফিরে যেতে রাজী থাকলে কোনো কিছুই জানাতে হবে না।

কেনর উত্তর আমি আজ দিতে পারব না, দে'য়ার উপায় নেই।

বিজলী এরপর কী বলবে ভেবে পেল না, আর কোনো প্রশ্ন করেও লাভ হবে না বুঝতে পেরে ওর নির্দেশ মত গাড়িটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল লেকের দিকেই।

॥ বারো ॥

লেকের কাছে আসার পর পুটুর নির্দেশ মত নির্ধারিত জায়গায় গাড়িটাকে দাঁড় করালো বিজলী। গাড়ি থামতেই পুটু কিছু না বলেই গাড়ির দরজা খুলে নেমে

হন হন করে হাঁটতে থাকল লোকের ভেতর দিয়ে। ওর আচরণে এত বিস্মিত হোলো বিজ্‌লী যে গাড়ির ভেতরে বসে ওর উপর থেকে চোখ সরাতে পারল না। পুটুর আচরণ স্বাভাবিক ছিল না, আরো অস্বাভাবিক লাগল যখন ও কিছুটা ঐভাবে হন হন করে আসার পরই ছুটতে শুরু করল। বিজ্‌লী আর গাড়ির ভেতর বসে থাকতে পারল না, নেমে এলো গাড়ি থেকে, নেমেই ছুটতে শুরু করল পুটুকে ধরার জন্য। ইতিমধ্যেই বিজ্‌লীর মনে ভয় ধরতে শুরু করেছে। একটা ভয়ংকর সন্দেহ যেন ওর হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। একটু এগোতেই ও শুনতে পেল একটা যান্ত্রিক শব্দ। বুঝতে অসুবিধা হোলো না ট্রেন আসছে। সেই ট্রেনের শব্দ শুনেই যে পুটু ওভাবে ছুটতে শুরু করেছিল এবং এখনো ছুটে চলেছে তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। বিজ্‌লী আরো জোরে ছুটতে শুরু করল পুটুকে ধরার জন্য কিন্তু পুটু তখন ওর নাগালের বাইরে। নিরুপায় হোয়ে চিৎকার করে ওকে থামাতে চাইল, লাভ কিছু হোলো না। এরপর অনুরোধ জানালো কিন্তু শত অনুরোধেও ওকে থামানো সম্ভব হোলো না। অবশেষে বিজ্‌লী বলতে থাকল, তুমি যেও না মা দ্বিতীয়বার আমি মাকে হারাতে পারব না।—এ কথা সম্ভবত পুটুর কানে পৌঁছল না, তখনো ও উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে ট্রেনলাইনের দিকে। বিজ্‌লী দু' হাতে নিজের চোখ দুটোকে ঢেকে চিৎকার করে আরো একবার বলে উঠল, আমাকে একা রেখে চলে যেও না মা।—কিন্তু সে কথা পুটুর কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না।

শেষ